অন্তর্ভারতীয় পুস্তক-মালা

কথা পাঞ্জাব

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

অন্তর্ভারতীয় পুস্তক-মালা

কথা পাঞ্জাব

সম্পাদক
ডঃ হরভজন সিং
অনুবাদক
প্রবোধ কুমার মজুমদার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নিউ দিল্লী

মার্চ ১৯৩১

March 1931

Original Title : KATHA PUNJAB *(Punjabi)*

সচিব, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী-১৬ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪ দ্বারা মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

বিশাল দেশ এই ভারত। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এক হওয়া সত্ত্বেও একতার সূত্রগুলিকে আরো দৃঢ় করে তোলা প্রয়োজন, যাতে এটি একটি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

আমাদের ভারত বহুভাষী। আমাদের দেশে ভাষার সংখ্যা যত বেশী পৃথিবীর আর কোনো দেশে বোধ হয় তত নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিবেশী প্রদেশের ভাষা বা ভাষাগুলি সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য খুবই কম। সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক সম্পদের বিষয়ে জ্ঞান তো আরো সীমিত। ইংরাজী ফ্রেঞ্চ, জর্মন ইত্যাদি য়ুরোপীয় ভাষার সাহিত্য এবং সমাজ বিষয়ে আমরা যতটুকু খোঁজখবর রাখি, এদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সেটুকুও জানিনা।

দেশের ভাবাত্মক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য দেশবাসীকে বিভিন্ন ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিতান্ত জরুরী। আর এরই মাধ্যমে সেই সব দেশের জীবনযাত্রা আচার-ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক চিন্তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় ঘটবে।

এ এক অদ্ভুত বিরোধাভাস চোখে পড়ে; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বহু রাষ্ট্র, প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন, তাদের ভাষাও পৃথক পৃথক, তবু সেখানকার মানুষ একে অন্যের সাহিত্য ও চিন্তাধারার যত সূক্ষ্ম বিশদ জ্ঞান রাখেন, আমরা নিজেদের ভাষাগুলির ততখানিও জানি না। য়ুরোপে যে কোনো ভাষার এমন কোনো শ্রেষ্ঠ জাতের বই নেই যা প্রকাশের অনতিবিলম্বে অন্য সবকটি ভাষায় অনূদিত হয়না। অথচ আমরা দেখছি ভারত এক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশী ভাষায় কী ঘটছে তা জানার আগ্রহ আমাদের নেই। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে কিন্তু খুবই মন্থর গতিতে।

এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখেই ভারত সরকার প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সমকালীন সাহিত্যের নির্বাচিত বই অন্য সব ভারতীয়

ভাষায় ভাষান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সব বই বাছাই করা হবে যা সাধারণ পাঠক পড়তে ভালোবাসে যেমন, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী ইত্যাদি। এই গ্রন্থমালার বই বাছাই করার সময় লক্ষ্য রাখা হবে বইগুলি উত্তম ও জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমাজের জীবনযাত্রা, তাদের ধ্যানধারণা আর আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে।

আশা করা যায় এই পরিকল্পনা আমাদের বহুভাষী সমাজের বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক চেনাজানা, বোঝাপড়া ও ভাবাত্মক ঐক্যসৃষ্টিতে বেশ কিছুটা সাহায্য করবে।

বিভিন্ন ভাষার অগ্রগণ্য রচনাগুলির নির্বাচন ও তার অনুবাদ অনায়াস সাধ্য কাজ নয়। আমরা আমাদের পরামর্শদাতা সমিতি ও অনুবাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাঁদের পথনির্দেশ ও সহযোগিতা ব্যতীত এই ধরণের পরিকল্পনাকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যে রূপায়ণ করা সম্ভব হতনা।

বালকৃষ্ণ কেসকর

সূচীপত্র

পাঞ্জাবী গল্প

পাঞ্জাবী সাহিত্যের সূচনালগ্নেই পাঞ্জাবী গল্পের উদয় হয়েছে। পাঞ্জাবী সাহিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সত্বেও, এই সাহিত্য-প্রবাহের গতি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সাহিত্যেরই অনুরূপ। যে সময়ে হিন্দী ভাষায় রাসো সাহিত্য রচিত হচ্ছিল ও মারাঠি ভাষায় পওয়াড়ো সাহিত্য জন্ম নেয়—সেই যুগেই পাঞ্জাবী ভাষায় 'ওয়ারেঁা'-র উদয়। 'ওয়ারেঁা'গুলি পাঞ্জাবের বীরগাথা, কাব্যরূপে বর্ণিত। 'ওয়ারেঁা'-র নায়ক হতেন সাধারণতঃ জননেতা, এগুলি জনসাধারণের সমুখে গেয়ে শোনানো হত। পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীর স্বাধিকার ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আক্রমণকারীদের আনাগোনা থাকত অব্যাহত।

পাঞ্জাবের গ্রামগুলিকে নিজেদেরই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হত। যখনই বিদেশী সেনা সদলবলে আক্রমণ চালাতো, লোকেদের লড়তে হয়েছে আপন ধনপ্রাণ ও সম্মান রক্ষার জন্য, আর আক্রমণ শিথিল হয়ে গেলে স্বীয় যোদ্ধা বীরদের 'ওয়ারেঁা' গাওয়া হত। এই 'ওয়ারেঁা'গুলোই পাঞ্জাবী শৌর্যকে উত্তপ্ত ও উদ্যত করে রাখত—আসন্ন যে কোনো সংকটে তাদের তৈরী রেখে। এই যুদ্ধ কাহিনীগুলির নায়ক পাঞ্জাবের মাটিতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে, সাধারণ মানুষের অতি চেনা, কাছের লোক। তাতে কাপুরুষতা ও অতিরঞ্জনের স্থান নেই। যেহেতু এই 'ওয়ারেঁা' জন-সাধারণের সমুখে গেয়ে শোনানো হত, তাই এতে মিথ্যে প্রশংসা করা যেতনা। কোনো যুদ্ধে পরাজিত নায়কের 'ওয়ারেঁা' রচনা করা সম্ভব ছিলনা। জন-নায়ক, জন-গায়ক, জন-শ্রোতা—পাঞ্জাবী কাহিনীর প্রারম্ভিক এই রূপই পাঞ্জাবী সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চিরতরে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

এই 'ওয়ারেঁা' আজকাল আর পাওয়া যায় না। এদের নিশ্চিত সংকেত গুরুগ্রন্থে সংরক্ষিত। গুরুগ্রন্থ পাঞ্জাবী ভাষার সবচেয়ে

প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি অক্ষরও বদলে দেবার অনুমতি কারো নেই। এইজন্যে এই গ্রন্থে সুরক্ষিত সংকেতগুলো আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণীর মতোই প্রিয়। মলিক মুরীদ, চন্দ্রহড়া সোহিয়া, রায় কমাল, টুণ্ডা অঁসরাজ, লল্লা বহলীমাঁ, জোধা ধারা পূরবাণী, রায় মহমা হসনী, মুসা ইত্যাদি অনেকগুলো নামের সঙ্গে জড়িত 'ওয়ারেঁা' বা বীরদের কাহিনীর সংকেত আমরা গুরুগ্রন্থে পাই।

কিন্তু এই গল্পগুলো ছন্দলয় মিলিয়ে পদ্যে লেখা হয়েছিল। গল্প সে যুগে ছিল কবিতার অঙ্গ; তার নিজস্ব কোনো রূপ ছিলনা। স্বতন্ত্র কথারূপের উদ্ভব গুরু নানকের কালে। গুরু নানক পাঞ্জাবের জলমাটির বিরাট পুরুষ, তার বহুমুখী প্রতিভা পাঞ্জাবী জীবনের অজস্র দিককে প্রভাবিত করেছে। পাঞ্জাবকে পঞ্চনদীর দেশ বলা হয়। গুরু নানককে যদি পাঞ্জাবের ষষ্ঠ নদ রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহলে তা খুবই সমীচীন হবে; যেভাবে পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী পাঞ্জাবের মাটিকে সিঞ্চিত করে রেখেছে তেমনি গুরু নানক পাঞ্জাবের জন-মানসকে সিঞ্চিত করেছেন। "পঞ্জাব ন হিন্দু ন মুসলমান, পঞ্জাব জিন্দা গুরু দে নাম তে" (পাঞ্জাব না হিন্দু না মুসলমান, পাঞ্জাব গুরুর নামেই বেঁচে আছে)। পাঞ্জাবী সাহিত্যের উদয় গুরু নানকের সঙ্গে সম্পর্কিত, আবার তাঁর নামকে ঘিরেই পাঞ্জাবী গদ্য-গল্পও বিকশিত হয়েছে। এই গল্পকে বলা হয় সাখী। এই সাখীগুলির নায়ক পাঞ্জাবের জন নায়ক গুরু নানক। যদিও এই সাখীগুলিকে আজ আমরা ধর্মীয় কাহিনী বলতে পারি কিন্তু এতে আধুনিক গদ্য গল্পের বীজ নিহিত। গুরু নানকের ধর্ম-ভাবধারা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত। সাখী রচয়িতাদের ধর্ম-ভাবধারাও সাম্প্রদায়িকতা রহিত। গুরু নানক ভারতের চারিটি দিকেই ভ্রমণ করেছিলেন, ভারতের বাইরের দেশগুলিতেও। ঐ সাখীগুলো নানা ধরণের জীবজন্তু, দেশ-অঞ্চল নানা ঋতু ও মানুষ সম্পর্কিত। এতে রাজা ও তাদের মোসাহেব আছে, গরীব ছুতোরও; ধর্ম-

কর্মে লিপ্ত সুফী এবং সন্ত-ফকির যেমন আছেন, তেমনি রয়েছে সব রকমের ধর্মভাব থেকে অসম্পৃক্ত খুনে, চোর, ঠগী, রাহাজানিতে দক্ষ ও রাক্ষসেরাও। গুরু নানকের সঙ্গে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি গল্প জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটায় এবং জীবনের কোনো না কোনো মৌলিক ডাইমেনশনের উপর আলোকপাত করে। এতে আছে বহুমুখীবৈচিত্র ও গভীরতা। শৈলীর দিক থেকে দেখতে গেলে এই সাখীগুলি আজকের লঘু কাহিনীর খুবই কাছাকাছি। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক তথ্য হল, সাখী সাহিত্য গল্পকে নিছক উপদেশমূলক কথা-বৃত্তি থেকে মুক্ত করেছে। এই সাখীগুলো ধর্মকথার মতো দীর্ঘও নয় আর দেবী-দেবতাদের অলৌকিক প্রসঙ্গে শ্রোতাদের চকিত করে না। লোক-কথার মতো বিশুদ্ধ মনোরঞ্জন ও এদের উদ্দেশ্য নয়। এগুলির রূপ সংক্ষিপ্ত এবং এগুলি উদ্দেশ্য-মূলক। মানবিক অভিজ্ঞতার মতোই সংক্ষিপ্ত ও সার্থক।

এই জন্ম-সাখীগুলো দু-আড়াইশো বছর ধরে লেখা হয়েছে। এগুলি পাঞ্জাবী পাঠক ও শ্রোতাদের ভিতর এক নতুন ধরণের সাহিত্যিক অভিরুচির ভিত্তি স্থাপন করে। এই গদ্য-রূপের প্রভাব পাঞ্জাবী পদ্যেও পড়ে এবং ছন্দোবদ্ধ ভাষা-শৈলীতে লঘু-গল্পের রচনা হতে থাকে। ভাই গুরুদাস এই গীত-শৈলীতে তেইশটি লঘু গল্প লেখেন। এদের কোনো একটিকে গদ্যে রূপান্তরিত করলে তাতে আধুনিক লঘু গল্পের গুণ দেখা যাবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে গল্পগুলির আধার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয় বরং প্রচলিত জনশ্রুতি। কিন্তু এই রচনাগুলি পড়লে কথা ও ছোটগল্পের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

মধ্য যুগে পাঞ্জাবী গল্পের দুটি ধারা—পাঞ্জাবী কিস্‌সা ও দশম গ্রন্থের ত্রিয়া চরিত্র বা চরিত্রোপাখ্যান এই রচনা পড়লে মনে হয় যেন মধ্য যুগেই পাঞ্জাবী সাহিত্য আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ব্যক্তিত্বের উদয়, আধুনিকতার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানুষ ছিল জীব, ব্যক্তি নয়। একটি

জীবকে অন্য জীবের থেকে আলাদা করে চেনা কঠিন, কেননা প্রত্যেক জীবের একটি সার্বজনীন 'পোজ' ছিল আর সেই 'পোজ'কে বজায় রাখতে রাখতে তাদের সমস্ত জীবন চলে যেত। এই জীবেরা কথা-কাহিনীর স্ট্যাটিক (স্থির) চরিত্র এবং তাদের ভিতর বিকাশের সম্ভাবনা ছিলই না বলা চলে। উত্তম ও বীর চরিত্ররা জটিলতা-বিহীন, সমতল (ফ্ল্যাট) ও স্থির (স্ট্যাটিক)। না আছে নিজস্ব ইচ্ছা-শক্তি বিষয়ে তাঁদের সচেতনতার পরিচয়, না তাঁরা আপন অপূর্ব ও বিলক্ষণ বৈশিষ্ঠ্যকে প্রকাশের আকাঙ্খা রাখেন। দীন-দুনিয়া বা ধর্ম ও জাগতিকতার সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা ছিল মানুষ এবং এই সম্বন্ধগুলিতে রদবদলের সম্ভাবনা বিশেষ ছিলনা। সাংসারিক সম্পর্কে মানুষ ছিল প্রজা বা রায়ত আর ধর্মীয় সম্পর্কে সে ছিল খোদার বান্দা বা দাসানুদাস। প্রকৃতপক্ষে 'দাসত্ব'ই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমগ্র সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। পাঞ্জাবী কিস্‌সা ও ত্রিয়া-চরিত্র এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি। মনে হয়, যেন দাসেরা সহজেই ঋজু ঘাড়ে নিজের মাথা উঁচু করে বলছে, "ব্যস! আজ অবধি যা হওয়ার হয়েছে। এরপর এ ধরণের গোলামী আর চলবেনা।" পাঞ্জাবের কিস্‌সাগুলিতে মধ্যযুগের মূল্য বোধগুলির ভাঙন দেখা যায়। মেয়েরা বাবা-মায়ের গোলামী অস্বীকার করে। আন্তর্দেশীয় ও আন্তধর্মীয় প্রেমের (সস্‌সী-পুন্নু ও সোহনী-মহীওয়াল) উদয় হয়। নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যেও ভালোবাসা স্বীকৃতি পায় (মির্জা সাহিবা)। মেয়েদের মধ্যেও বিদ্রোহের সাহস জেগে ওঠে। স্পষ্টই বোঝা যায় প্রাণী ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছিল আর মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ঘোষণা করছিল। ত্রিয়া চরিত্রে (স্ত্রী-চরিত্র) নারীর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যেন প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুগ যুগ ধরে দাসত্বের প্রতীক নারী। একদিকে গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো জন-নায়ক নিপীড়িত প্রজাদের বাদশাহ ও সুলতানদের গোলামী থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে সাহিত্যে মুক্তির ভাবাদর্শ জেগে উঠেছে। সাহিত্য সংগ্রাম ও

জীবন-সংগ্রাম পাশাপাশি এগিয়ে চলেছিল। প্রণয় কাহিনীর হীর, সোহনী, সস্‌সী ও চরিত্রোপাখ্যানের নারীরা দাসত্বের ভাবধারায় গড়া মানব-সম্বন্ধগুলি চ্যালেঞ্জ করেছে। এই চ্যালেঞ্জকে গল্পের মাধ্যমে যত সহজে রূপায়িত করা যেত, আর [illegible] রীতির মাধ্যমে তা সম্ভব ছিল না। [illegible] বিদ্রোহী ভাবাদর্শের জন্যই পাঞ্জাবী জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে। পাঞ্জাবী বিদ্রোহ পুরোনো মূল্য[illegible] সঙ্গে সঙ্গে নতুন মূল্যবোধও স্থাপিত করেছে। ত্রিয়া-চরিত্রে পুরোনো মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শ ধ্বংস হয় এবং এই কাহিনীগুলিতে নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও আছে। আধুনিক যুগের আবির্ভাবের আগেই পাঞ্জাবী সহিত্যিকরা জর্জর জীবনাদর্শকে ধ্বংস করে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উত্তরাধিকারলাভ করেছিলেন। এই গল্পগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মানবিক ভাবনা ও জীবন-বোধ। পাঞ্জাবে অবতার-ভাবধারা বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। পরিণাম-স্বরূপ সংকটের সময় মানুষ ঈশ্বরকে অবশ্যই স্মরণ করে কিন্তু আবাহন করে নামিয়ে আনতে পারেনা পৃথিবীতে। নিজের সংকট দূর করার জন্য মানুষকেই সচেতন প্রয়াস করতে হয়। অবতার-পুরুষের গল্পের সমাপ্তি ঘটে নিশ্চিতরূপে জয়ের মধ্যে। কিন্তু মানুষের গল্প, জয় অথবা পরাজয়, দু'টোর যে কোনোটাতেই শেষ হতে পারে। ফলে গল্পে আসে বৈচিত্র ও গভীরতা। মানুষের প্রতি অটুট আস্থা থাকার দরুণ পাঞ্জাবী গল্পকে মধ্যযুগেই আধুনিক-প্রবণতা-সম্পন্ন মনে হয়।

বীরসিং-কে আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রবর্তক বলে ধরা হয়। বীরসিংই পাঞ্জাবী ভাষায় সর্বপ্রথম উপন্যাস লেখেন। প্রকৃতপক্ষে এ উপন্যাসরাজি বড় গল্পই। এই গল্পগুলি পাঞ্জাবী স্ব-ভাব ও উত্তরাধিকারের প্রতি একনিষ্ঠ। 'সুন্দরী' ও 'সতবন্ত কাউর' গভীর ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত রচনা। তবু এগুলিতে গল্প ব্যক্তিকে অবলম্বন করে এগিয়েছে এবং নিজের পা বাস্তবের মাটি থেকে উঠতে

দেয়নি। গভীর সংকট ও নির্বাধ বিদ্রোহ এই গল্পগুলির শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছে। পাঞ্জাবীতে আধুনিক এবং ছোট গল্পের আবির্ভাব নানকসিং থেকে ধরা উচিত। নানকসিং-এর কালে মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটেছে। মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট তার চরিত্রের স্থিতি-স্থাপকতায়। কোনো প্রত্যয়ই তার পক্ষে অন্তিম বা নিশ্চিত নয়। —নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই। নানক-সিং শহর-মুখী। নাগরিক জীবনের মতো তাঁর গল্পেও আছে বৈচিত্র ও অনিশ্চয়তা। এগুলি স্থির মানক-সম্পর্ক ও স্থানু অভ্যাসের গল্প নয়, প্রতিক্ষণে সম্ভাব্য নতুন মানবিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। এতে পুরোনো বিদ্রোহ বা ভাবালু প্রেম নেই। এই রচনাগুলির মুখ সংকট, ধর্ম বা শারীরিক প্রয়োজন মাত্রের দিকে ফেরানো নয়। কোনো গভীর জীবনদর্শন নানকসিং-এর নেই। তাঁর সাফল্য তাঁর সহজ মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তাধারায়। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি পাঞ্জাবী সাহিত্য-দর্শনকে নানা বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করেছেন। এই সংগ্রহে সংকলিত 'তাশের নেশা' নিছক মধ্যবিত্ত জীবন-পদ্ধতি নিয়ে লেখা গল্প। এই জীবন-পদ্ধতিই নানকসিং-এর শিল্পের আরম্ভ ও শেষ। পাঞ্জাবী আধুনিকতার শুরু এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই।

নানকসিং-এর পর পাঞ্জাবী গল্পের ক্ষেত্রে গুরুবখ্‌শ্‌সিং-এর নাম অগ্রগণ্য। গুরুবখ্‌শ্‌সিং পাঞ্জাবী গল্পকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন এবং কোথাও বা পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি গল্পকে জীবন-দর্শনের সঙ্গে একাত্ম করে তাকে নতুন মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর মধ্যবিত্তের ভাবধারা নানকসিং-এর মত স্বভাবজাত নয়। তাঁর পা ভাবালু আদর্শের মাটিতে, সহজ বাস্তবে নয়। মধ্যবিত্তের জীবন-আদর্শ ও বাস্তবের মাঝখানে টানাপোড়েনের জীবন। গল্প এক টানাপোড়েন থেকে শুরু হয়ে অন্য এক টানাপোড়েনে পৌঁছে শেষ হয়। নানকসিং-এর গল্পের টানাপোড়েন প্রাত্যহিক বাস্তবের দিকে মুখ ফেরানো—গুরুবখ্‌শ্‌সিং-এর অগ্র টান ভাবালু আদর্শের

দিকে। মধ্যবিত্ত মানুষ যে বাসনাগুলি ভোগ করতে সংকোচ বোধ করে, গুরুবখ্‌শ্‌সিং সেই বাসনাগুলির আদর্শাত্মক ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যার যাত্রা 'সহজ প্রীতি' থেকে 'বস্তুবাদ' পর্যন্ত। কিন্তু তিনি প্রেমের দৈহিক দিককে গ্রহণ করেননি, বস্তুবাদের অনাত্ম দৃষ্টিকেও নয়। তাঁর গল্প ব্যক্তির স্থিতির চেয়ে তার ভাবাদর্শের সঙ্গে অধিক জড়িত। নানকসিং ও গুরুবখ্‌শ্‌সিং —এঁদের দু'জনের মিলিত প্রয়াস পাঞ্জাবী গল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কাহিনী, তথ্য ও সত্য, অস্তিত্ব ও ভাবনা, সহজ ও সচেত দৃশ্য ও দৃষ্টি অবধি প্রসারিত হয়ে গেছে মনে হয়।

সেখোঁ ও দুগ্‌গল পাঞ্জাবী গল্পকে দিয়েছেন প্রৌঢ়ি। নিজে ভাবালু না হয়েও ভাবালুতা ভরা গল্প লিখতে সেখোঁ অদ্বিতীয়। 'পেমী দে ন্যানে' 'মুড় বিধবা' তাঁর অপ্রতিম গল্প। সেখোঁ মার্কস্‌বাদী বিদ্বানরূপে প্রসিদ্ধ। পাঞ্জাবী আলোচনা-সাহিত্যে বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিকোণের দৃঢ় বনিয়াদ স্থাপনে সেখোঁর অবদান যথেষ্ট। কিন্তু গল্প বলার সময় তাঁর বুদ্ধিবাদিতা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনা। তবে অপ্রত্যক্ষ ও আশ্লিষ্টভাবে গল্পের আবহাওয়ায় মিশে থাকে যার দরুণ গল্প যৌক্তিক পরিপক্কতার ভিত্তি পায়, তার সাবলীল প্রবাহও থাকে অব্যাহত।

করতার সিং দুগ্‌গল পাঞ্জাবী ভাষার এক শীর্ষস্থানীয় গল্পকার। তিনি উপন্যাস এবং নাটকও লিখেছেন। কবিতাতে হাত দিয়েছেন আবার কখনো কলমের স্বাদ-বদলের জন্য আলোচনা-জগতেও ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তাঁকে গল্পলেখক হিসেবেই স্মরণ করা হয়। পাঞ্জাবী ভাষায় গল্প লেখার ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন সাধনা কেবল দুগ্‌গলই করেছেন। বিগত তিরিশ বছরের পাঞ্জাবী ধ্যান-ধারণার ইতিহাস দুগ্‌গলের গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে, কেননা দুগ্‌গলের সর্বপ্রথম দায়বদ্ধতা গল্পের প্রতি, কোনো আন্দোলন বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি নয়। সাতচল্লিশ সালের আগের গোলাম দেশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাতচল্লিশ সালের বিভীষিকা,

ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক ভাবাদর্শগত একতা ও সম্পর্ক-হীনতা—সাহিত্যিক প্রগতিশীলতা, ভারত-পাক যুদ্ধ—এই সবের ভাবনাত্মক প্রতিক্রিয়া দুগ্‌গলের গল্পে পাওয়া যাবে। তাঁর গল্পে গম্ভীর বিষয়গুলির অভিব্যক্তি সহজবোধ্য ও সার্থক হয়েছে। সমগ্র জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য তাঁর গল্পে একমুখীনতা বা অতি-রঞ্জিত যৌনবৃত্তির চিহ্ন নেই। তিনি মনোসমীক্ষণ ও মার্কস্‌বাদ—দুই দিক থেকেই লাভবান। বহুবার তিনি এমন কথা বলেন যা সাধারণ আচরণের সঙ্গে মেলেনা। সাহস ও সংযম এ দু'য়ের সুন্দর সামঞ্জস্য দুগ্‌গলের গল্পে পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে দুগ্‌গলের গল্পকে আজকের পৃথিবীর প্রতি একজন পরিপূর্ণ মানুষের প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয়।

সাতচল্লিশ সালের দেশ-বিভাজন পাঞ্জাবীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই দেশ ভাগ পাঞ্জাবী হৃদয়কে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে নাড়া দিয়েছে। কয়েকজন গল্প লেখক (মুসাফির, দুগ্‌গল, বির্ক, সরনা, সত্যার্থী, বখ্‌শী) নিজেরাই পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ছিন্নমূল হয়ে এদিকে এসেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েও এই লেখকদের রচনায় অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য বর্তমান। এই গল্পগুলিতে ঐতিহাসিক তিক্ততা একেবারেই দেখা যায়না। এই গল্পগুলি একটি বিশেষ মুহূর্তের গল্প তবু এতে সমগ্র পাঞ্জাবী চরিত্র সুসমঞ্জস-ভাবে চিত্রিত। এই সংকলনের চারটি গল্প 'খসমঁখানে' 'আগাছা' 'টাঙ্গির মরশুম' ও 'মোতী' দেশ-ভাগের সঙ্গে জড়িত—কিন্তু সবকটি গল্পই সময়, স্থান ও ঘটনার পক্ষপাত থেকে মুক্ত। এই গল্পগুলিতে তিক্ততার প্রলেপ গাঢ় নয় আর যেটুকু তিক্ততা আছে তা নিজের কাছে-থাকা চরিত্রের প্রতি। এই বিপর্যয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব এক পক্ষের ঘাড়ে চাপানোর প্রবৃত্তি এই গল্পগুলিতে দেখা যায়না। এটাই সুস্থ পাঞ্জাবীয়ানার প্রমাণ। এরই দরুণ পাঞ্জাবী গল্প পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সমগ্র মানবতার সহিত আত্মীয়তায় আবদ্ধ মনে হয়।

তাশের নেশা

"রহিম"—

বাড়ী ঢুকেই সাব ইন্সপেক্টর শেখ আবছুল হামিদ চাকরকে হাঁক দিলেন, "বশিরকে একবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দেতো—" বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে কোট ও বেল্ট খুলে আলনায় টাঙিয়ে, টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন। অজস্র জিনিস ছড়িয়ে আছে টেবিলের উপর। একধারে সরু মোটা আইনের কেতাব আর নানান বেআইনি বই। কাগজ-পত্তরে ঠাসা ফাইল। মাঝখানে কলমদান, ঠিক তার পাশেই আজকের ডাক, পাঁচ ছ'টা খাম, কয়েকটা পোষ্ট কার্ড আর ছু'তিনখানা খবরের কাগজ।

শেখ সাহেব চেয়ারে বসে দূরের চশমা খুলে টেবিলে খালি জায়গাটুকুতে রেখে দিলেন। কাছের চশমা চোখে দিয়ে ডাকের চিঠিপত্র দেখতে লাগলেন।

সবে হয়তো গোটা ছু'য়েক খাম খুলেছিলেন, দেখলেন, তাঁর পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেটা ভেতরে ঢুকছে।

ছেলেটাকে দেখলে বেশ চটপটে ও ছুরন্ত মনে হয় কিন্তু বাপের ঘরে ঢুকলেই তার স্বভাব পালটে যায়, চোখ ছুটো ঝুঁকে থাকে মেঝের দিকে—এমন দেখায় যেন তার ধড়ে প্রাণ নেই আর।

"সামনের চেয়ারে বস," একটা লম্বা চিঠি পড়তে পড়তে শেখ সাহেব বাঘের মত গর্জন ক'রে হুকুম দিলেন।

ছেলেটা ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে সামনে বসে পড়ে।

"আমার দিকে তাকাও"—চিঠি থেকে মুখ তুলে শেখ সাহেব হুংকার ছাড়লেন, "শুনেছি, আজ তুমি তাশ খেলেছ?"

"না বাবা"—ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বলে।

শেখ সাহেব এবার নিজের স্বভাববিরুদ্ধ গলায় বলে, ওঠেন, "ভয় পেয়োনা। সত্যি সত্যি কি হয়েছে: বলো, আমি তোমাকে

কিছু বলবনা। আমি নিজে দেখেছি তোমাকে, আবদুল্লার ছেলের সঙ্গে তাদের উঠোনে বসে তাশ খেলছিলে, নয় কি ?"

ছেলেটা মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

"শাবাস," শেখ সাহেব নরম গলায় বলেন, আমি খুব খুশী যে শেষ পর্যন্ত তুমি সত্যি কথা বলেছ। বশির, আমি সত্যি সত্যি তোমাকে খেলতে দেখিনি, একজনের কাছে শুনেছি। তোমাকে দিয়ে কবুল করাবার এ একটা কায়দা। আমরা অপরাধীকে দিয়ে এমনি কথা বলিয়ে নিই। যাক্ আজ তোমাকে কয়েকটি দরকারী কথা বলতে চাই, শোনো।"

"মন দিয়ে শোনো" বলে তিনি বশিরের দিকে তাকালেন। সে বাবার চশমা নিয়ে তার ডাঁটি দু'টো বেঁকাচ্ছিল।

তার হাত থেকে চশমা কেড়ে নিয়ে, পাশের ফাইল থেকে ওয়ারেণ্টের বক্তব্য মনে মনে পড়তে পড়তে শেখ সাহেব বলতে লাগলেন :

"তোমার জানা উচিত, এই অপকর্ম অনেকগুলো পাপের সূচনা মাত্র। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ—তাশ খেলার পাপ লুকোবার জন্য তোমাকে মিথ্যে কথাও বলতে হল। তার মানে একটার জায়গায় তুমি দু'টো পাপ করলে।"

ওয়ারেণ্টটা ফাইলে নথিভুক্ত ক'রে শেখ সাহেব ছেলের দিকে তাকালেন। বশির তখন পিনকুশন থেকে পিন বের ক'রে টেবিল ক্লথে ফোটাচ্ছিল।

"আমি যা বলছি সেদিকে কান দাও!" শেখ সাহেব তার হাত থেকে পিন কেড়ে নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলেন, "তাশও এক ধরণের জুয়ো—বুঝলে ? জুয়ো। এর থেকেই বাড়তে বাড়তে মানুষকে জুয়োর নেশায় পেয়ে বসে! আর এই বদ অভ্যেস শুধু নিজের মধ্যেই আটকে থাকেনা, একজনের থেকে অন্যে, তার থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন খরমুজের পাশে থাকলে খরমুজ রঙ বদলায়।"

কলমদান থেকে আঙুলে কালি লাগিয়ে বশির একটা শাদা কাগজে হিজিবিজি আঁকছিল। খরমুজের নাম শুনেই আঙুলটা টেবিলের তলার কাঠে মুছে এমনভাবে বাপের দিকে তাকায় যেন সত্যি কেউ খরমুজ হাতে নিয়ে বসে আছে।

"বশির!" ছেলের সামনে থেকে কলমদান সরিয়ে রেখে শেখ সাহেব বলেন, "মন দিয়ে আমার কথাটা শোনো"...এইটুকুই বলতে পেরেছেন ইতিমধ্যেই টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। শেখ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে রিসিভার তুললেন। "হ্যালো! কোত্থেকে *বলছেন?...বাবু পুরুষোত্তম দাস?...আদাব!...বলুন, কী হুকুম, লটারির টিকিট?....আজ সন্ধ্যেবেলাই ভরে পাঠিয়ে দেবো। পাঁচটা* টিকিটের কত দাম, *পঞ্চাশ....? কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো নামে* পুরস্কার উঠেছে কি?...বলা তো যায়না কবে বরাত ফিরবে, এই ঘোড়ারোগের কোনো দাওয়াই বাতলাবেন আপনি!...আচ্ছা, আদাব অর্জ...।"

রিসিভার রেখে তিনি ফিরে নিজের জায়গায় এসে বসে বলেন, "শোনো, দুষ্টুমি কোরোনা। পেপার ওয়েট মাটিতে পড়ে ভেঙে যাবে। ওটা রেখে দাও। মন দিয়ে আমার কথা শোনো।"

"হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম আমি।" অন্য একটা ফাইলের ফিতে খুলতে খুলতে শেখ সাহেব বললেন, "তাশ খেলার দোষের বিষয়ে বলছিলাম। তাশ থেকে জুয়ো, জুয়ো থেকে চুরি; চুরি করলে কি হয় জানো?" বশিরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "জেল, মানে কয়েদের সাজা।"

বশির ফাইল থেকে বাইরে উঁকি মারা একটা হলদে কাগজে কলমের ডগা দিয়ে ছেঁদা করছিল।

"পাজী, অকর্মের ধাড়ী" শেখ সাহেব তার হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে বললেন, "এসব বাজে কাজ ছেড়ে আমার কথা শোনো। জানোই তো, রোজ কত চোর-ছ্যাঁচোড়কে চালান দিতে হয়? এরা সবাই তাশ খেলতে খেলতে চুরি করা শেখে।

যদি তাদের মাথায় আইনের এমনি ডাণ্ডা না পড়ে তাহলে না জানি তারা আরো কত অনাছিষ্টি কাণ্ড বাধাবে।” বলে শেখ সাহেব টেবিলের এক কোণায় রাখা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু বশিরের নজর অন্য একটি বইয়ের দিকে। বইটার মলাটের উপরের কাপড় একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, সেটা টেনে টেনে বশির প্রায় আধখানা উপড়ে এনেছে।

“বেকুফ্‌, গাধা কোথাকার!” বইটা উঠিয়ে বশিরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শেখ সাহেব বলেন, “তোমাকে কি বইয়ের মলাট ওপড়াতে ডেকেছি এখানে? আমার কথা মন দিয়ে শোনো।” কয়েকটা সমনের উপর সই করতে করতে তিনি পুরোনো কথার খেই ধরলেন, “আমাদের, পুলিশ অফিসারদের গভর্ণমেন্ট এত বেশী মাইনে ও পেন্‌শন কেন দেয়, জানো? শুধু এইজন্যে যাতে এই দেশ থেকে অপরাধ একেবারে নির্মূল ক'রে দিই। কিন্তু যদি আমাদের ছেলেরাই তাশ আর জুয়ো খেলতে শুরু ক'রে দেয়, তাহলে তামাম দুনিয়া কি বলবে, আর আমরাই বা কেমন ক'রে নিজের নিমকের ঋণ শোধ....”

কথার মাঝখানে পিছনের দরজা দিয়ে শেখ সাহেবের খুব লম্বা মতন একটা চাকর এসে দাঁড়ায়। ও একটি সেপাই। শেখ সাহেব সর্বদাই এ ধরণের দু'তিন জন বিশ্বস্ত সেপাই বাড়ীতে রাখতেন। এদের মধ্যে একজন গরু মোষ চরায় ও দুধ দোয়ায়, আরেকজন রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করে। তৃতীয় যে লোকটা ভেতরের দিক থেকে ঘরে ঢুকল, তাকে রাখা হয়েছিল আসামীর কাছ থেকে পয়সা উশুল করার জন্য। লোকটা মাথা নুইয়ে সেলাম ক'রে বললে, “আজ্ঞে, ওরা এসে বসে আছে।”

“কারা?”

“আজ্ঞে, সেই বুগ্‌ঘী বদমাশের লোকেরা, যারা দশহরার মেলায় জুয়াখানা খোলার আর্জী পেশ করেছিল।”

“তুমি নিজেই ওদের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারবে।”

"আমি তো ওদের বলেই দিয়েছি যে শেখ সাহেব আড়াইশোর কমে রাজি নন, কিন্তু....।"

"তা, ওরা কি বলছে ?"

"ওরা বলছে, আমরা নিজেরাই একবার শেখ সাহেবের চরণ স্পর্শ করতে চাই। যদি আপনার অসুবিধে না হয় তো দু'মিনিটের জন্য আসুন। ওরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে।"

"আচ্ছা চল।" বলে শেখ সাহেব উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বশিরের দিকে তাকালেন। ছেলেটা ঝিমুচ্ছিল। যদি শেখ সাহেব তক্ষুণি বকুনি দিয়ে তাকে জাগিয়ে না দিতেন তাহলে টেবিলে তার মাথা ঠুকে যেত।

"যাও জিরিয়ে নাও।" নিজের টুপি ও বেল্ট সামলাতে সামলাতে শেখ সাহেব বললেন, "সন্ধ্যাবেলা তোমাকে আরো উপদেশ দেব। আর কখনো তাশ খেলোনা।"

শেখ সাহেব বেরিয়ে গেলেন। ছেলেটা আড়ামোড়া ভাঙল, হাই তুলল, চোখ রগড়াল, তারপর লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

ময়না বউদি

শহরের একটা গলি। দু'টো বাড়ী সামনাসামনি। মাঝখানে তিন সাড়ে তিন গজের ব্যবধান। একতলার জানালা দু'টোও মুখোমুখি। সামনের জানালা দিয়ে দেখা যায় দেয়ালে একটা আয়না টাঙানো। ঘরটায় জিনিষপত্র খুব কম ; একটা খাট, পিঁড়ি, তাকের উপর কয়েকখানা বই, তেল চিরুণী। দেয়ালে দু'য়েকটি ছবি।

ছোট ঘর। একটি মেয়ে ছাড়া আর কারো মুখ ক্বচিৎ চোখে পড়ে এ ঘরে। সে কখনো সেলাই করছে বা বই পড়ছে বসে বসে, কখনো মাথা নিচু করে চুপচাপ মগ্ন হয়ে রয়েছে নয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুলে চিরুণী বোলাচ্ছে। দিনে কয়েকবার যত্ন করে চুল বাঁধে মেয়েটি। বাড়ির সকলের ধারণা মেয়েটা চিরুণী-পাগল।

দীঘল চুল। চুলের দৈর্ঘ দেখতে যখনি সে পিছন ফেরে, দেখে চুল তার গোড়ালি ছুঁয়েছে। এইটুকু বলা যায় যে সে নিজের চুলের জন্য গর্বিত। আলোর ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে যেমন কোন সন্দেহ নেই, চুল নিয়ে মেয়েটির গর্ব তার চেয়েও নিঃসন্দিগ্ধ।

যুবতী দীর্ঘাঙ্গী। সুন্দরী। সামনের জানলা থেকে চোখের রঙ দেখা না গেলেও তার রূপ বড় বিষন্ন, মধুর।

কে জানে, সারাদিনে কতক্ষণ সে জানলায় বসে বসে চোখের জল ফেলে কিন্তু কখনো কারো দিকে তাকায় না। অবশ্য গলির অন্য নারীরা টের পায়। কেউ ওদিক দিয়ে আসা যাওয়া করার সময় সাড়াও দেয়।

কথা বলে মিষ্টি গলায় মাথা নিচু করে।

সে ঘরে না থাকলে জানলা বন্ধই পড়ে থাকে, অথচ শীতের বিকেলে বা গরমকালের বেলা বারোটার ঝাঁঝাঁ দুপুরে জানলা ঠিক খোলা। সে জানলার কাছে পিছন ফিরে বসে মাঝে-মাঝে গলিটায় উঁকি দেয়।

গলির মোড়ে বইয়ের থলি কাঁধে একটা বাচ্চা ছেলেকে ফিরতে দেখা যায়। মেয়েটি সব কাজকর্ম ফেলে জানলার শিকের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটা কখনো কখনো মুখ তুলে তাকায় তারপর সোজা ঢুকে পড়ে বাড়িতে। ছেলেটার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা জুতোর শব্দ কান পেতে শোনে। যদিও মেয়েটি কোনোদিন ওদের বাড়ি যায়নি তবু ওদের সিঁড়িতে কতগুলো ধাপ তা ওর জানা। প্রতিটি ধাপের আওয়াজ শুনতে শুনতে কখনো সে নিজের বুক চেপে ধরে।

ও বাড়িতে কোনো দরজা খোলা হলেই সে বুঝতে পারে বৈঠকখানায় কেউ এসেছে।

বইখাতার থলে একধারে রেখে ছেলেটা নিজের জানলা খানিকটা খুলে সামনের জানলার দিকে তাকায়। মেয়েটি সেদিকে তাকায়না—কেননা সে জানে ছ'টি চোখ তারই দিকে নিবদ্ধ। সেই চোখ, যার পথ চেয়ে সে বসে থাকে, যে কোনোদিন ফিরতে দেরী করলে অন্য ছেলেদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ওর এত দেরী হচ্ছে কেন ? যদিও প্রশ্নটা সে কাউকে করেনি।

খোকা বৈঠকখানার দরজা বন্ধ ক'রে উপরে চলে যেত।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটেছে। খোকার বয়স এখন তেরো। সামনের জানলার প্রতি কৌতুহল এখন একধরণের নতুন আস্বাদ জাগায় ওর মনে।

একদিন খোকা মাকে জিজ্ঞেস করে, "আমাদের বাড়ি সকলেই তো আসে কিন্তু সামনের বাড়ির কেউ আসেনা কেন ?"

"আমাদের গলিতে এরাই একমাত্র জৈন পরিবার। এরা মাছ-মাংস ছোঁয়না তাই শিখদের বাড়ি আসা-যাওয়া নেই।"

"কিন্তু মা, আমরা তো মাংস খাইনে।"

"এঁদের ধারণা সব শিখেরাই আমিষ খায়।"

"বাড়ি থেকেও বেরোননা।"

"মাঝে মাঝে বেরোন। বড় দুঃখ গেছে এদের মাথার উপর দিয়ে।

পর পর দু'জন মারা যাওয়ার ওদের সংসারটা তছনছ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র ছেলের বিয়ে দিল, দু'বছর যেতে-না-যেতে মারা গেল সে। ছেলেটি মারা যাওয়ার পর একটা বাচ্চা হয়েছিল, বছরখানেকও বাঁচলো না। এখন তিনটি বিধবা যেন শুধু কান্নাকাটি করার জন্য বেঁচে আছে।"

"বাচ্চাটা কার?"

"ময়নার। তাকে তুমি নিশ্চয়ই জানলায় বসে থাকতে দেখেছ।

"ও সব সময় জানলায় বসে থাকে কেন মা?"

"জোয়ান মেয়ে বিধবা হলে বড় চোখে চোখে রাখে এরা...আর এদের সংসারে কাজের ঝক্কিও বেশী নেই।"

"চোখে চোখে কেন রাখে মা?"

"এমনি। মনে সুখ যে নেই, যদি কারো কাছে বাড়ির কোনো কথা বলে।"

"মা, আমাদের বাড়িতে যারা আসেন...তাদের কাউকে তুমি কাকিমা ডাকতে বলো কাউকে মাসিমা বা পিসিমা...। যদি ওঁর সঙ্গে কখনো কথা হয়-কী বলে ডাকবো?"

"কাকে? ময়নাকে?"

"হ্যাঁ—যে জানলায় বসে থাকে।"

"ও তোমার বউদি। ওর স্বামী পাড়া সম্পর্কে তোমার ভাই হত। বড় ভালো ছেলে ছিল।"

"ময়না নামটাই বা কি রকম!"

"কেন, ভালো লাগেনা?"

"না, বেশ নাম; কিন্তু আগে এ ধরণের নাম শুনিনি তো। মামাবাড়িতে খাঁচায় বসে মিষ্টি গলায় কথা বলে যে পাখিটা, সেইটেই ময়না তো? টিয়া কিন্তু এত সুন্দর কথা বলতে পারেনা।"

"হ্যাঁ, ওইটেই।"

"আমাকে একটা ময়না আনিয়ে দেবে?"

"মামাকেই বোলো। এনে দেবেখন।"

কিছুদিন পরে খোকার বৈঠকখানায় দেখা যায় একটা খাঁচা ঝোলানো। সে যখন ছাদে যায় খাঁচাটাও সঙ্গে নেয়।

খোকা রোজ তার ময়নাকে শেখায়, "ময়না বউদি জানলায় বসে।"

জানলার ময়না কখনো খোকার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এই পোষা ময়নার কথাগুলো খুব ভালো লাগে : "ময়না বউদি জানলায় বসে।"

শীতকালে ময়না বউদি নিজের ঘরেই ঘুমোয় রাত্রে। পরীক্ষা কাছে এসে পড়ায় খোকাও আজকাল বৈঠকখানায় শুচ্ছে। প্রায়ই ময়না বউদি ঘুমন্ত খোকার নিশ্বাসের আওয়াজ পায়। নিজের খাট থেকে উঠে অনেকক্ষণ ধরে এই শব্দ শোনে।

তার বয়স এখন পঁচিশের কাছাকাছি! খোকা এখনও তেরো বছরের হয়নি। মনে মনে সে বলে, "ইস্ যদি খোকার সঙ্গে খেলার সুযোগ পেতুম! কী মজাই না হত। যখন সে স্কুল থেকে ফেরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারতুম, যদি তার অসুখ করত ও বাড়িতে গিয়ে শিয়রে জেগে বসে থাকতুম। ...অসুখ করলে কি আর খারাপ ব্যাপারের ভয় থাকে কারো মনে···?"

তারপর সে নিজেকেই শোনায়, "আমাকে এত স্বাধীনতা দিচ্ছে কে? এ ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতেই থুত্থুড়ি বুড়ি হয়ে যাবো। শাশুড়ির মতই শাদা নুড়ি হয়ে যাবে আমার চুল। খোকার বিয়ে হয়ে যাবে। জানলাটাও আর এরকম খোলা থাকবেনা। তখন কার অপেক্ষায় আমার অন্ধকার জীবনের এই অফুরন্ত দিন ও রাতগুলো কাটবে?"

ভাবতে ভাবতে তার মন খারাপ হয়ে যায়। বিছানা থেকে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নাভরা রাত। খোলা জানলা দিয়ে অল্প চাঁদের আলো খোকার মুখের উপর এসে পড়েছে। খোকা এখন গভীর ঘুমে। শ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। বিলম্বিত। ময়নার মনটা বড় উতলা হয়ে ওঠে। তার মনে হয় দু'বাড়ির

মাঝখানের ব্যবধান ভীষণ কম। কী ভালোই লাগত, যদি ছুটো জানলার মাঝখানে একটা চারপাই ফেলে পুল বানানো যেত। খোকার কাছে পৌঁছে গেলে ওকে জাগাতুম না, মুখে চুমো খেয়ে আবার ফিরে আসতুম ঘরে।

কিন্তু এ ব্যবধান কম নয়।

মনের অজস্র আকাঙ্খার তুলনায় তার সাহস কতটুকু।

আবার এসে খাটের উপর শুয়ে পড়ে সে। খানিক পরেই খোকার বৈঠকখানা থেকে ভেসে এল: 'ময়না বউদি...' চমকে ওঠে সে। কিন্তু এতো খাঁচায় পোরা ময়নার বুলি।

খোকা আগের মতই ঘুমোচ্ছে।

ময়নার শাশুড়ি সেই সময় পায়খানা যাবার জন্য উঠেছিলেন, কানে গেল ময়নার ঘরে খুটখাট শব্দ। 'ময়না বউদি' ডাকটাও যেন শুনলেন। ডাক দিলেন ময়নাকে। ময়নাও তক্ষুনি সাড়া দিল ভিতর থেকে। শাশুড়ির মনে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে।

"অর্ধেক রাত কাবার হয়ে এল, এখনো ঘুমোসনি ময়না?"

"এই...এমনিই ঘুম ভেঙে গেছে।"

শাশুড়ি ঘরে ঢুকলেন। সামনের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে একটা মানুষের আকৃতি—ওধারের ঘরটায় কেউ শুয়ে আছে।

"কার সঙ্গে কথা বলছিলি তুই?"

"আমি আবার কার সঙ্গে কথা বলব।"

শাশুড়ি আবার সামনের জানলার দিকে তাকান।

ময়না বলে, "ও তো সরদারদের খোকা, অঘোরে ঘুমোচ্ছে।"

শাশুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খোকা না হয় খুবই ছোট, আর বয়সের তুলনায় বেশ সরল কিন্তু তবু সে ব্যাটাছেলে। কাঁচা বিধবা, তারই বা কি আক্কেল, বাচ্চাদের দিকে অমন করে নজর দিচ্ছে।

খোকা স্কুল থেকে যখনই ফিরুক, ময়না দেখে। এসেই খোকা বৈঠকখানায় যায়। জানলা [illegible]। গত বছরের চেয়ে

এখন তাকে বেশ বড়সড় লাগে। কথাটা একান দিয়ে শুনে ওকান দিয়ে বের করে দেবার মতন তুচ্ছ নয়। ছোট ছোট টুকরো মেঘই কখনো কখনো আকাশ কালো করে ভেঙে পড়ে।

আজকাল যখন খোকা স্কুল থেকে ফেরে ময়নার জানলা বন্ধ থাকছে। রাতেও সে জানলা খোলে না।

ওই জানালা খোকার জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল, তাই এখন খেলতেও ওর তেমন ভালো লাগে না। মাকে জিজ্ঞেস করেও কোনো লাভ নেই, ও বাড়ির সঙ্গে মায়ের কোনো সম্বন্ধ নেই। বিয়েটিয়ে উপলক্ষে কালে ভদ্রে মিষ্টি দিতে যাওয়া ছাড়া কেউ ওদের চৌকাঠ ডিঙিয়েছে কিনা সন্দেহ।

আজকের রাতটা অন্ধকার।

ময়নার জানলা থেকে একটা শব্দ এলো যেন কেউ একের পর এক চাবি বদলে তালায় লাগিয়ে দেখছে।

তারপর ধীরে ধীরে জানলাটা খোলে। ময়না উঠে দরজায় কান পেতে শোনে কেউ জেগে আছে কিনা, তারপর সে গলিতে উঁকি দেয়। কানে আসে খোকার নিঃশ্বাসের শব্দ। খোকা ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়না, তবু ময়নার স্নেহভরা চোখ যেন খোকার সারা শরীর হাতড়ে বেড়ায়।

তার মনে হল সে খোকার খাটে গিয়ে বসেছে, ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে ও জাগাচ্ছে। ময়না নিজেরই গলা শুনতে পায়,

"খোকা—খোকা—খোকন!"

ও কিন্তু এখনো ঘুমোচ্ছে। ময়না বলে চলেছে, ও খোকা তোর ময়না বউদি, একবারটি ঘুম থেকে ওঠ, কথা আছে, শুধু একটা কথা, একটামাত্র....ব্যস....

খোকা জেগে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

ময়না মনে মনে ভীষণ লজ্জা পায়। বুঝতে পারে কথাগুলো সে মোটেই মনে মনে বলেনি, মুখেই আউড়ে ফেলেছে। তাই খোকা জেগে উঠেছে।—যদি আরো কেউ জেগে থাকে।

খোকা নিজের জানলায় এসে বসে। সে বুঝতে পারে ময়না বউদিও অন্ধকারে জানলায় বসে আছে। কতবার তার ইচ্ছে হয়েছে ময়না বউদির গলা জড়িয়ে ধরে—বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল, সে, জানলাটা কেন বন্ধ থাকে ভাবে।

"ময়না বউদি—ময়না বউদি—"

"কি খোকন, আমার মাণিক—একটু আস্তে, আস্তে কথা বল্ —তোর ফিসফিস করে বলা কথাও আমি শুনতে পাবো।"

"আমিও আপনার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আপনি বুঝি খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন?"

"হ্যাঁরে।"

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

"এটা আর ঘর নেই রে, কয়েদখানা। জানলাটায় পর্যন্ত তালা পড়েছে।"

"এরকম হল কেন?"

"সেদিন তোর পোষা ময়নাটা ডেকেছিল। আমি ভাবলুম তুই....আমার মাথায় তখন ভূত্ চেপেছিল রে। আমার শাশুড়িও তখন উঠেছিলেন, ভাবলেন, আমি বুঝি তোর সঙ্গে কথা বলছি।"

"তাতে কী হয়েছে....আমি বলি....আপনি তো আমার বউদি...."

"খোকা, অনেক কিছুই হয়েছে তারপর....সদরে তালা পড়েছে। ....তাই আমিও চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এই ঘরে এ রাত্রিই আমার শেষ থাকা। যাবার আগে খুব ইচ্ছে করেছিল, তোর সঙ্গে দেখা হোক। কাউকে বলবিনে তো....?"

"না, ময়না বউদি, আমি কাউকে বলবনা। কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?. আমি বড় হবো বিয়ে করব, বউকে বলব, ময়না বউদির কাছে যাও। তারপরে সেও আপনাকে আসতে বলবে আমাদের বাড়িতে, আপনি কি তার কথা এড়াতে পারবেন।

আসা-যাওয়া হলে তখন আর কেউ কিছু বলবেনা দেখবেন। আপনি যাবেন না বউদি।"

"কিন্তু তুই তো বেজায় ছোট, তোর বিয়ে হতে এখনো অনেক দেরী, তাহলে বল্ এই কয়েদখানায় এতগুলো বছর কেমন করে কাটবে আমার....শুধু চোখের দেখা তোর সঙ্গে—তাও যেদিন থেকে বন্ধ হয়েছে....।"

"কোথায় যাবেন আপনি? আমিও সেখানে যাবো আপনার সঙ্গে দেখা করতে...."

"তা হয়না খোকা, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনো ব্যাটাছেলেই আর আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেনা।"

"সেখানে যাবেন না।"

"আমার আর কোনো উপায় নেই—আমি পূজনী* হবো ঠিক করেছি।"

"পূজনী আবার কী?"

"জৈনদের সন্ন্যাসিনী নারী, তাদের মাথা ন্যাড়া ক'রে মুখের উপর কাপড় বেঁধে খালি পায়ে থাকতে হয়।"

"না, না ময়না বউদি আপনি কক্ষনো পূজনী হবেন না। ওদের দেখলে আমার বড় ভয় করে। ওদের চোখ পর্যন্ত ফেটি বাঁধা দেখলে আমার কেমন অন্যরকম লাগে।"

"খোকন, আমার যে আর কোনো পথ নেই।"

ময়না বউদি কোনো জিনিষ বলের মত গোল করে পাকিয়ে জানলা দিয়ে খোকার বৈঠকখানায় ফেলে দেয়...."আমার এই স্মৃতিচিহ্নটা রাখিস। সকালবেলা খুঁজে নিস। এখন সাড়াশব্দ পেয়ে কেউ জেগে না ওঠে।"

ময়না বউদির জানলা বন্ধ হয়ে যায়। তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনতে পায় খোকা। বাকী রাতটা আর ঘুমোতে পারেনা।

---

*পূজারিণী

পরের দিন খোকা স্কুল থেকে ফিরলে মা বলেন, ময়না মেয়েটা বড় দুঃখিনী। শাশুড়ি দু'বেলা কেবল খোঁটা দিত আর ঝগড়া করত। অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় মেয়েটা পালিয়েছে। চিঠি লিখে গেছে, ও পূজনী হতে যাচ্ছে।

"কিন্তু এখানে থেকে পূজনী হওয়া যায়না, মা ?

"নাঃ, পূজনী হতে গেলে নিজের শহর ছেড়ে অন্য শহরে গিয়ে কোনো মন্দিরে থাকতে হয়। পূজারীরা মেয়েটার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। যদি বোঝেন মেয়েটার সৎ-ধর্মে মতি হয়েছে তাহলেই তাঁরা পুরোপুরি তার ভার নেন। ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং কয়েকদিন সে যা চায় তাকে তাই করতে দেন তাঁরা। তারপর মাথা নেড়া ক'রে পূজনী হবার পালা। পূজনী হবার পর সে আর ভালো খেতে পরতে পাবেনা, ব্যাটাছেলের সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ।"

"ময়না বউদি কোথায় গেছে ?"

"পরে জানা যাবেই।"

"ধরো যদি কাছাকাছি কোনো শহরে গিয়ে থাকে একদিন আমাকে নিয়ে যাবে তো....? দেখে আসবো....।"

"তোমার মাসীমাদের ওখানে জৈনদের খুব বড় একটা মন্দির আছে। ময়না যদি সেখানে গিয়ে থাকে, তুমি না হয় দু'দিন ঘুরে এসো, তোমার মাসীমাই দেখিয়ে আনবেন। কেউ পূজনী হলে সারা শহরে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়।"

খোকা মাসীমাকে চিঠি লিখল, তিনি যেন এ বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন।

হপ্তা দু'য়ের মধ্যে সকলেই জেনে ফেলল খবরটা। সারা গলিতেই আলোচনা। আহা, বড় ভালো মেয়ে, কেউ কখনো তার কপাল অবধি দেখতে পেতনা ; এত সুন্দর চুল ছিল। কত যত্ন করত চুলের। তাকে একেবারে নেড়া করে দেবে, সন্না দিয়ে একটা একটা করে চুল উপড়ে ফেলবে....আহা বেচারী !

খোকা মাসীমার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। মাসীমা ময়নাকে দেখে এসেছেন আজ। সুন্দর কাপড় চোপড় পরে ছিল ময়না। গায়ে অনেক গয়না-গাটি। নানান জনে ধার দিয়েছে এসব। গান বাজনার ব্যবস্থাও ছিল। ময়না খোকাদের গলিতে থাকত জেনে মাসীমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানেই যেতে লাগলেন। মাসীমা ফিরে এসে খোকাকে বলতে লাগলেন, "ময়নার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। দেখো, কাল লোকেরা তাকে ডুলিতে বসিয়ে সারা শহর ঘোরাবে। পুষ্পবৃষ্টি করবে, গোলাপ জল ছিটোবে।

খোকাও তার বউদিকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠল। ময়না বউদিকে সে একই ধরণের কাপড় পরতে দেখেছে। আর সেই পোশাকেই তাকে সবচেয়ে ভালো লাগে খোকার। গয়নাগাটিতে ঝলমলিয়ে না জানি কত ভালো লাগছে। মাসীমা বলেছিলেন, ময়নার হাসি দেখলে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবেনা কেউ।

ময়নার দেওয়া রুমাল, তার সেই স্মৃতিচিহ্ন এখন খোকার ভিতরের পকেটে রাখা। একথা সে কাউকে বলেনি কিন্তু রোজ একবার রুমালটা খুলে করে দেখত। হিন্দী অক্ষরগুলো খোকা শিখে নিয়েছে, কেননা ময়না বউদি রুমালে ছুঁচ সুতো দিয়ে লিখে দিয়েছিল, "আমার স্নেহের খোকাকে—তার বউদির কাছ থেকে।"

আগামী কাল দুপুরের পরে মাসীমা জানালেন, ময়নার ডুলি বেরোবে, সমস্ত বাজারে তাকে ঘোরানো হবে। যে কেউ ইচ্ছে করলে তাকে দেখতে পারে। পরের দিন খোকা মাসীমার বাগান থেকে ফুল তুলে রুমালে বেঁধে নিল।

যখন ডুলি তাদের চকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে খোকা ইচ্ছে করেই বাড়ীর লোকজনদের কাছ থেকে সরে গেল। সে শুধু ডুলি দেখে ফিরতে চায়না, সারা রাস্তা ডুলির সঙ্গে হাঁটবে।

উর্দিপরা লোকগুলো বাজনা বাজাচ্ছে। জৈনরা টাকা পয়সা ছিটোয়। ডুলিতে তার বউদি বসে—গয়নায় ঢাকা। মুখখানা

হয়তো একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে কিন্তু চেহারায় এখনও আগেকার সেই দীপ্তি। সকলে বলাবলি করে, পূজনীর রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কিন্তু এই আড়ম্বরে খোকা ময়না বউদির আগেকার সেই রূপ দেখতে পাচ্ছিল না। এই হাসিতে উজ্জ্বল মুখের থেকে পুরোনো সেই বিষণ্ন চোখ দু'টি খোকার বেশী ভালো লেগেছিল।

যখনই ওর মনে হয় বউদি এদিকে তাকাচ্ছে তক্ষুনি খোকা ফুল ছুঁড়ে দেয়, পূজনীও হাত জোড় করে, তবে সে হাত ওর জন্য নয়। খোকা ভাবছিল এই ভিড়ে এত ছোট ছেলেকে ময়না বডদি দেখবেই বা কেমন করে?

রাস্তায় মোড় ঘোরার সময় হঠাৎ ডুলি তার খুব কাছে এসে পড়ল। ফুল বর্ষণ চলছে। ময়না হাত দুটো জড়ো করে আবার। তক্ষুনি খোকা তার উপর ফুল ফেলতে চাইছিল। ময়না তাকে চিনতে পারে। তার আধ বোজা চোখ খুলে বড় হয়ে উঠেছে। সে একদৃষ্টে দেখে, তারপর সাহস করে ডুলি থামাতে বলে।

"এই ছেলেটা আমাদের গলিতে থাকে। ওর হাত ডুলি পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছেনা। ওকে এক মিনিটের জন্য আমার কাছে নিয়ে এস।"

এ এক অদ্ভুত অনুরোধ, কিন্তু পূজনী যে হতে চায় তার কোন কথাই অমান্য করা যায় না।

"খোকা, নিয়ে আয়, তোর ফুলগুলো আমাকে দে। কত দূর থেকে এসেছিস...আমার গলির খোকা তুই।"

খোকা খুব খুশী। ময়না বউদি তাকে দেখেছে, কাছে ডেকে হাত পেতে ফুল নিয়েছে।

...রুমালটা ও ফেরাল না। খোকা ভাবলে, বউদি চিহ্ন করে রাখবে ওটা।

শোভাযাত্রা 'পাসরে'তে এসে পৌঁছয়। লোকজন চলে গেল, ময়না ও তার সঙ্গে কয়েকজন মহিলা 'পাসরে'-র ওপরে চড়তে লাগল।

সিঁড়ির ওপরে পা রাখার আগে ময়না দেখল, খোকা সামনের এক দোকানে তক্তার উপর দাঁড়িয়ে।

উপরে নিয়ে গিয়ে বড় পূজারীর সম্মুখে ময়নাকে বসানো হয়।

বড় পূজারী প্রশ্ন করেন, "তুমি নিজের মনটাকে শক্ত করে নিয়েছ তো ?"

"হ্যাঁ মহারাজ, নিয়েছি।"

"সমস্ত কাপড়-চোপড় গয়না এবার তোমাকে খুলে ফেলতে হবে। সারা জীবনে আর তুমি সে সব ফিরে গ্রহণ করতে পারবে না।"

"জানি মহারাজ! আমার ও সবের প্রতি কোনো আকাঙ্খা নেই।"

"যা আমাদের নিয়ম, তোমাকে সেই রকম পোষাক পরতে হবে, আহারাদিও করতে হবে অনুশাসন মতো।"

"মহারাজ, ভালো আহার্যে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

"পুরুষ মানুষকে ছোঁয়া তো দূরের কথা, তার কল্পনা করাও এই ধর্মে বিঘ্ন উৎপন্ন করবে, যে ধর্ম তুমি অঙ্গীকার করতে যাচ্ছো এখন।"

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অনুভব করে তার পকেটে রাখা খোকার রুমাল খুলে যাচ্ছে, রুমালের কোণগুলো বাহু হয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয়, "হাঁ, মহারাজ, এও মেনে নিলাম।"

"এখন তুমি ওই ঘরে গিয়ে শাড়ী-টাড়ী ছেড়ে যে কাপড় তোমাকে দেওয়া হবে, পরে এসো। তারপর তোমাকে চুল কাটতে হবে, পূজনী মাতা তোমাকে বলে দেবেন কেমন করে সন্না দিয়ে চুল উপরে ফেলতে হয়।"

চুল কেটে ফেলা—উপড়ে ফেলার উল্লেখ শুনতেই ময়নার মুখ দিয়ে অর্ধস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এল, তবু খুব সাহস করে সে বললে, "বাবা, আপনি কি আমাকে চুল রাখার অনুমতি দিতে পারেন না ?"

"সে কেমন করে হবে ?"

মূখ্য পূজারী বিস্মিত গলায় বলেন।

"আমি জানি আমার এই দাবী অদ্ভুত...।"

ময়না তার অন্তরে এক ধরণের জোর অনুভব করছিল, "কিন্তু যদি আপনি এটা মেনে নেন,...কখনও কাউকে নালিশের সুযোগ দেব না, দেখবেন। বুঝতে পারছিনা আমার ভেতরে কি যেন গিঁট বেঁধে রয়েছে...আমি আপনার এমন শিষ্যা হব, সমস্ত সম্প্রদায় চমকে উঠবে, আশ্চর্য হয়ে যাবে,...আমার চুল যদি কাটতে না দেন..."

"কিন্তু এতো কিছুতেই হতে পারেনা, তুমি কি এটা জানতেনা ?"

"আমি জানতুম,...আমি চুল কেটে ফেলব ভেবেছি। কিন্তু...কিন্তু এখন যখন কাটার সময় এসেছে, মনে হচ্ছে আমার চুলগুলো যেন জীবন্ত। এরা আমার প্রাণ থেকে বেড়ে উঠেছে। যখন আমি চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতুম এরা এক দমকে আমার পা ছুয়ে ফেলত, এদের মধ্যে যেন এক জীবন্ত স্পর্শ। কত বছর ধরে আমি মাথার চুলগুলি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলিনি।" মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বলে যায়, "আপনি একবারটি এইটি ক'রে দেখুন না। হোক না এর নজির নেই। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে নিজের এই কাজের জন্য কখনও অনুতাপ করতে হবেনা।"

মূখ্য পূজারীর হৃদয় গলে যায়, কিন্তু তিনি ভাবেন 'পূজনী' মেয়ের মাথায় চুল দেখে লোকে কী বলবে ?

"না, বাছা, তোমার কথা মেনে নিতে পারছিনা।"

"তাহলে হে পূজ্য, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন, আমি নিরালায় বসে নিজের মনকে বুঝিয়ে নিই", ময়না নিজেকে শক্ত করে বলে।

"হ্যাঁ যাও . . . সামনের রকে বসে ভেবে নাও।"

ময়না উঠে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের রকে গিয়ে বসে। এই রকের কার্নিশের তলায় বাজার। খানিক পরে ময়না ওঠে।

"এ এক অদ্ভুত মেয়ে। আমি অনেকগুলি মেয়ের এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছি কিন্তু এই মেয়েটির প্রত্যেকটি কাজ আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। এ যদি পূজনী হয় বেশ নাম করবে।"

"কিন্তু ও রকের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে কেন?" অন্য লোকটা বিচলিত হয়ে বলে।

বড় পূজারীও দেখলেন, ময়না রকের আলসের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে খোঁপার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছে। খোঁপা খুলে গেল—চুল কোমরের তলায় নেমে এল। হাল্‌কা হাওয়ায় চুল সরসর করে উড়ছে।

"কত লম্বা..."

"ওহ্..." সকলে উঠে সিঁড়ির মুখে দৌড়োয়। আলসের উপর ময়না নেই।

নিচে পৌঁছেছে সকলেই। সারা বাজারে হাহাকার। ক্ষত-বিক্ষত ময়নার শিয়রে বসে আছে একটি ছেলে। সে ওর এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে সিঁথি খুলে দিয়েছে। কালো চুলের মাঝখানে জায়গায় জায়গায় জ্বলজ্বল করছে রক্ত। ছেলেটার চোখ দিয়ে জল ঝরছে—পড়ে থাকা রমণীর চোখের ভিতর সে তাকিয়েছিল; ওর চোখ খোলা। এর আগে ছেলেটা কখনও এই চোখ দু'টির রঙ দেখেনি। তারা দু'টি সেই আঁধার রাতের মতই কালো, যে রাতে শেষবার ও ছেলেটাকে জাগিয়েছে। কিন্তু সেই রাতের গভীরে এক সূর্য লুকিয়েছিল—তাই তো সে রাতে ছেলেটা অন্ধকারে দেখতে পেয়েছিল—ওই চোখ দুটো এখনও তেমনি কালো—আলোয় ভরা, উজ্জ্বল।

কিন্তু এখন তার ভিতরে কোন সূর্য নেই।

পেমীদের বাচ্চা

বছর বিশেক আগের কথা।

আমি তখন বছর সাতেকের ও আমার দিদির বয়স এগারো হবে। বাড়ি থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে ছিল আমাদের ক্ষেত। মাঝপথে একটা সড়ক পড়ত—জরনৈলী।* তার উপর দিয়ে জংলী, পাঠান, রাশ—নানান বিদেশী লোকের যাওয়া-আসা ছিল।

আমরা—তখন যারা ছোট ছিলাম, বাড়িতে বসেই রাশের ভয়ে জুজু—বড়োদের সঙ্গ ছাড়া ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় পেতাম। অথচ মুশকিল এই যে রোজই কখনো একবার, কখনো বা দু'বার বাবা আর ক্ষেত মজুরদের জন্য খাবার পৌঁছতে যেতে হত। প্রত্যেকদিন সেই সড়ক পার হওয়ার সময় আমাদের মনে হত কোনো বিপদ সংকুল উপত্যকা দিয়ে চলেছি।

এমনিতে আমরা সাহসে বুক বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তাম। যখন এতটা চলে এসেছি যে আর দু'তিনটে বাঁক পেরোলেই সড়কে পৌঁছব—ঠিক খাল পার হওয়ার মুখে, তখন উপকথার মেষ-শাবকের মতোই আমরা এদিক ওদিক চাইতে শুরু করেছি—যদি পথ চলতি গাঁয়ের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—আর আমরা এই অকূল পাথার পেরিয়ে যেতে পারি।

আমরা যে ধরণের ধর্মীয় শিক্ষা পাচ্ছিলাম তাতে এই রকম ভয়গুলো আমাদের স্বভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে-বেলা বাড়িতে বড়োদের কাছে বসে স্বর্গ ও নরকের গল্প শুনতাম। আমাদের কপালগুণে স্বর্গ ক্ষেতের বাইরে কোথাও চোখে পড়তনা অথচ নরকের খুঁটি দেখতাম সব জায়গাতেই পোঁতা আছে। সবচেয়ে বড় নরক ছিল পাঠশালা, সেখান থেকে যদি ছাড়া পেলাম তো ক্ষেতে খাবার পৌঁছনোর নরক সমুখে এসে দাঁড়াত।

*গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডকে চলতি ভাষায় জরনৈলী সড়ক বলে।

এইটুকুই ভেবে নিন যে, আমাদের নিষ্পাপ পথের প্রত্যেক বাঁকে নরকের বিভীষিকা·ওৎ পেতে থাকত।

সড়কটার ভয়ের সমুদ্র পেরোতে হত বলেই ক্ষেতে যাওয়াটা নরক যন্ত্রণার মতো লাগত কিংবা ক্ষেতে খাবার পৌঁছে দিতে হত বলেই ওখানটা যাওয়া এত ভয়ের কারণ ছিল, সেটা আমি ঠিক ঠিক বলতে পারবনা। তবে আমি জানি ক্ষেতটা ছিল স্বর্গ আর খাবার নিয়ে যাবার খাটুনিটা আমাদের কাছে নরক-যন্ত্রণার মতোই বিচ্ছিরি লাগত। আর জরনৈলী সড়কের মাঝখানের জায়গাটা ছিল ভয়-সমুদ্র।

শীতকালের দিন। আমরা ভাইবোন দুপুরের খাবার নিয়ে ক্ষেতের দিকে রওনা হলাম। মিষ্টি রোদে পথ চলতে চলতে আমরা ঝিমোনোর আনন্দ উপভোগ করছি—এদিকে মনে মনে সড়ক পার করার ভয় ইঁদুরের মতো আমাদের ভিতরটা কুরে খাচ্ছে।

আমরা ভয়কে চাপা দেবার একটা সহজ ফন্দি বের করলাম। দিদি আমাকে একটা গল্প বলতে আরম্ভ করল।

"এক যে ছিল রাজা। তার রাণী মারা গেল। মরার সময় রাণী রাজাকে বলল—আমাকে একটা কথা দাও। রাজা জানতে চাইল কী..."

গল্পে কান না দিয়ে এবার আমি পিছন ফিরে গাঁয়ের দিকে তাকাই, মনে হচ্ছে আমাদের রাস্তা ধরেই যাবে এমনি কেউ একজন আসছে।

"তুই শুনছিসনা ভাইটি।" দিদি আমার কাঁধ নাড়া দিয়ে বলে।

"না আমি শুনছি।" ছোট ভায়ের মত রুক্ষ ভাবেই আমি জবাব দিই।

"...হ্যাঁ, রাণীর যখন মরার সময় হল রাজাকে ডেকে বলল, আমাকে-কথা দাও। রাজা জিগেস করলেন, কী কথা। রাণী বলল, তুমি আর বিয়ে কোরোনা। আরে, আমি বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম রাণীর দু'ই ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল

এই রাজা আর রাণীকে আমার বাবা মায়ের মতন লাগত। যদি আমাদের মা মরে যায়, তাহলে মাও মরার আগে বাবাকে কথা দিতে বলবে। এই কথাটাই আমাদের অচেতন মনে বাজতে থাকে। মনে হয়, রাণীর মেয়ে যেন আমার দিদি আর রাণীর ছেলে আমি নিজে।

দিদি গাঁয়ের দিকে তাকাচ্ছিল ঃ "তারপর কি হল বলতো—"

আমি আগের মত রুক্ষ সুরে বলতে থাকি।..."রাণী বলল, বুঝছো না ? আমার ছেলেমেয়েদের সৎমা বড় কষ্ট দেবে।" দিদি কিন্তু আরো মিষ্টি গলায় মেয়েলী ধরণে বলে। "এই জন্যে সে রাজার কাছ থেকে কথা চেয়েছে। রাজা বললেন, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি।"

বোধহয় রাজা যদি কথা না দিতো, তাহলে রাণী মরতে রাজি হতনা।

"হুঁ।"

আমরা জানতুম দিনের বেলা গল্প বললে, পথ চলতি লোক রাস্তা হারিয়ে ফেলে, তবু দু'জনের কেউই অপরকে সাবধান করে দিইনি। কোন রকম ভাবনাও করতে চাইনি তা নিয়ে।

"কিন্তু রাজা শীগগিরই আরেকটা বিয়ে করল।"

"হুঁ।"

পিছনের বাঁকে একটা লোককে আসতে দেখলাম। দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লোকটাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলাম। হায়রে, লোকটা অন্যদিকে যাচ্ছিল—আমাদের দিকে ফিরেও তাকালনা।

যে উদ্দেশ্যে আমাদের এই ছলনার আশ্রয় নিতে চাওয়া—এত সাধের গল্প বানানো-তা টিঁকলনা। ভেবেছিলাম আমরা কথা-গল্পে এত মশগুল হয়ে পড়ব যে, অনায়াসে রাস্তা পেরোনো যাবে। কিন্তু যখন চলতে চলতে এতটা এগিয়েছি যে, আর একটা মোড় ঘুরলেই সেই কুপথ, আমাদের গল্পও থমকে গেছে, কোন বয়স্ক

মানুষের দেখা পাবার ক্ষীণ আশাও ভেঙ্গে পড়েছে, ভয় পেয়ে দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দশ পনেরো পা ইতস্ততঃ চলার পর আমাদের ভয় আরো বেড়ে গেল। সড়কের একপাশে পাঠানদের মতন খোলা সালোয়ার ও কালো রঙের রেশমী ফতুয়া পরা কেউ শুয়ে আছে।

"দিদি, দ্যাখ রাশা শুয়ে আছে।"

লোকটা পাশ ফিরে শোয়।

"এ যে নড়ছে-চড়ছে, নিশ্চয়ই জেগে আছে।" দিদি ভয় পেয়ে বলে, "এখন কি করি ?"

"ওকি অমাদের ধরে নেবে ?"

"নয় তো কি ?" দিদির জবাব।

আমরা দু'জন রাত্রে খুব কমই বাইরে বেরোতাম, কিন্তু শুনেছিলাম ভয় পেলে ওয়াহে গুরুর নাম জপ করতে হয়। তাহলে ভয় পালিয়ে যায়। মা আমাদের এক মামার গল্প বলতেন। একবার আমাদের মামা এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাত্তিরে কোনো গাঁয়ের শ্মশানের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের পায়ের উপর জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি এসে পড়তে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণ মামাকে জিগেস করল, এখন কি করি ? মামা বললেন, ঠাকুর, ওয়াহে গুরুর নাম স্মরণ করো।

আমাদের মামা ওয়াহে গুরুর নাম জপ করতে লাগলেন আর বামুন রাম নাম। আগুনের ফুলকি তখনো পড়ছে কিন্তু তাদের থেকে অনেক দূরে। এই ব্যাপারে মামার কথায় গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠত।

"আয়, আমরাও ওয়াহে গুরুর নাম করি।"

"ওয়াহে গুরুর নামে তো ভূত পেত্নীই ভয় পায়, মানুষ নয়।" দিদি আমাকে বলে।

তার কথা মেনে নিতে হল আমাকে।

সড়কের উপর শুয়ে আছে রাশা—সে তো মানুষ, ভগবানের নামে ভয় পাবে কেন ?

"তাহলে আমরা কি করব ?"

দু'জনে পাঁচ-ছ মিনিট জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনো আমাদের আশা, এই রাশাকে ঘাবড়ে দেবার মতো কোনো লোক এসে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে। এ আবেদনে সাড়া দেবার জন্য কাউকেই আসতে দেখলুম না।

আমরা দু'জনেই একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু এ হেন সময়ে আমরা পরস্পরের মুখে কী খুঁজে পেতে পারি? আমাদের সারল্য ও একতা উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েক মিনিট পরে আমার কান্না পেল।

দিদি তার ওড়না দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, "কাঁদেনা ভাইয়া, কাঁদছিস কেন? আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি। এক্ষুনি গাঁ থেকে কেউ না কেউ এসে যাবেই।"

আমরা সড়কের দিকে কয়েক পা এগোই, তারপর থমকে দাঁড়াই, পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসি।

শেষকালে দিদি কিছু একটা ভেবে বলে, "আমরা বলব, আমরা তো পেমীর বাচ্চা, আমাদের ধরে নিয়ে যেওনা।"

ওর মুখে পেমী শব্দটা বড় মিষ্টি শোনাল, আর এখন—যখন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আমাকে, সেই সঙ্গে নিজেকেও সাহস জোগাল—দিদি নিজেও পেমী হয়ে যাচ্ছিল।

আমার বুকে সাহস ফিরে এল। রাশা যখন জানতে পারবে আমরা পেমীর বাচ্চা, সে নিজে থেকেই আমাদের কিছু বলবেনা, ধরবেনা।

বুকে কাঁপুনি নিয়ে টলতে টলতে লোকেরা 'ওয়াহে গুরু' 'ওয়াহে গুরু' জপ করতে করতে শ্মশানভূমি পেরিয়ে যায়, গরুর লেজ ধরে যেমন ক'রে হিন্দুরা ভবসাগর পার করে।

আমরাও ভাইবোনে পেমীর নাম করতে করতে সড়ক পার হলাম। পাঠান আগের মতই শুয়ে রইল।

খসমাঁ খানে*

পুরোপুরি জেগে ওঠার আগেই দ্রৌপদী বলে—ঠিক বলে না, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়, "খসমাঁ খানে।" বলতে কি, হর্ণের তীব্র শব্দে তার কানে তালা লাগার যোগাড়। হর্ণের যত শব্দ সে আজ পর্যন্ত শুনেছে এ আওয়াজটা যেন সবচেয়ে জোরালো।

"এ গণেশ ট্যাক্‌সীঅলা নয়, নিশ্চয়ই চাননশাহজী।" ভগতরাম বলেন। স্বামীর মুখে চাননশাহের নাম শুনে দ্রৌপদী সামান্য লজ্জা পায়। "ইস্, চাননশাহ শুনে ফেলেননি তো?"

তিন চারদিন আগে, ভোরবেলা গন্‌শার ট্যাক্‌সীর হর্ণ শুনে দ্রৌপদীর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, "খসমাঁ খানেরা বোধ হয় রাতেও ঘুমোয়না।" তখন ভগতরাম ওকে বুঝিয়েছিলেন, "ও একটা গরীব ট্যাক্‌সীঅলা, চালান হয়েছে ওর। বেচারা মুন্সীজী,—সুপারিশের জন্য এসেছে।" তাই শুনে দ্রৌপদী আরো গলা চড়িয়ে বলেছিল, "থাক্ না খসম কে।" কথাটা গণেশের কানে গিয়েছিল কিন্তু গরজ বড় বালাই, সে বেচারা কি আর বলে। আজ চাননশাহের জন্য দ্রৌপদীর বকুনি খেতে হলনা ভগতরামকে। দরজায় মোটর দাঁড় করিয়ে চাননশাহ সোজা ভগতরামের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। দ্রৌপদী "আসুন আসুন, বসুন" বলে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

চাননশাহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করে, "কি লালাজী তৈরী তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওষুধের শিশিটা নিয়ে নিই, কি জানি সন্ধ্যেবেলা যদি ফিরতে দেরী হয়ে যায়...আর...।" কথার মাঝেই কিন্তু চাননশাহ বলে ওঠে, "আরে না না এখুনি ফিরে আসবো, নতুন মোটর, আড়াই ঘণ্টায় আম্বালা, সেখানে ঘণ্টাখানেক লাগবে,

*খসমাঁ খানের বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায় ভাতার খাগী।

তারপর দিল্লী পৌঁছতে আরো আড়াই ঘণ্টা, মাত্র ছ'ঘণ্টার মামলা। এখন ছটা বাজে, যদি দশ পনেরো মিনিটে রওনা দিই তাহলে সোয়া বারোটা নাগাদ ফিরে আসা যাবে।"

"না শাহজী রেফুইজী ক্যাম্পে কম করেও আমার সোয়া দু'ঘণ্টা সময় লাগবে।"

"তা মানছি, বড়জোর তিনটে বাজবে, তাহলেও সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবো। উঠুন শীগ্‌গির চলুন, যত তাড়াতাড়ি বেরুবো তত তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে।"

দ্রৌপদী বলে, "ধরো যদি দেরী হয়, রাত্তিরে ওখানেই থেকে যেতে হয় তাহলে সঙ্গে গরম কাপড়, বিছানা...।"

দ্রৌপদীকে কথা শেষ না করতে দিয়ে চাননশাহ ভগতরামের হাত ধরে চারপাই থেকে ওঠায়। "চলুন, সঙ্গে কিছু নেওয়ার দরকার নেই, একটু পরেই ফিরে আসবো। যদি ঠাণ্ডা লাগে মোটরে কম্বল আছে তাই মুড়ি দিয়ে বসুন, তিনটে নাগাদ আপনাকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দেব।"

নিশ্চিন্ত হয়ে ভগতরাম মোটরের নরম গদীতে হেলান দিয়ে বসে বলেন, "কাজের জন্য যারা আসবে তাদের তিনটের সময় আসতে বলো।"

ভগতরামের হাঁটুর উপর কম্বল ফেলে দিয়ে চাননশাহ বলে, "আপনি কমিশনার সাহেবকে একবার দেখা দিয়ে যেখানে খুশী চলে যাবেন, গাড়ীতে যথেষ্ট পেট্রোল আছে। ব্যস্ ওতেই আমার কাজ হবে।"

লালা ভগতরাম রেফুইজীদের নেতা। নানা কাজে অকাজে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাঁর কাছে লোকেদের আনাগোনা লেগেই থাকে। তিনি সকলের কথা দরদ দিয়ে শোনেন, তাদের কাজ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। দ্রৌপদীর স্বভাব এমনিতে মিষ্টি, তার মনটাও খুব সহানুভূতিপ্রবণ, কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভাঙার আগে বা রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পরে

যারা এসে দরজার কড়া নাড়ে তাদের উপর মাঝে মাঝে চটে যায় ও।

কোয়ার্টার থেকে মোটরটা বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা রেফুইজী এসে ভগতরামের খোঁজ করে। দ্রৌপদী তাকে জানায়, লালাজী চাননশাহের সঙ্গে আম্বালা গেছেন। সেই রেফুইজীটা বিড়বিড় করতে-করতে চলে যায়।

"পুঁজীপতিদের সঙ্গে বের হতে তো কই দেরী হয়না। অথচ আজ যদি আমার সঙ্গে কাষ্টোডিয়ানের কাছে না যান তাহলে সন্ধ্যে-বেলা আমার বাসন-কোসন রাস্তায় টান মেরে ফেলে দেবে।"

সে চলে যাবার পরেই আর একটা রেফুইজী এসে বলে, ঋণ তো মঞ্জুর হয়ে গেছে কিন্তু টাকা নেবার বেলায় জামিন হবে কে?"

"আমার বদলীর কাগজপত্র তো আজই সই হয়ে যাবে, সারা বাড়ি রেফুইজী আত্মীয় স্বজনে ভরা। বুড়ো মা বাবা। গিন্নীর আবার আজকালের মধ্যে বাচ্চা হবে...। এদিকে যেখানে আমাকে পাঠাচ্ছে সেখানে থাকার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই।"

"পেশোয়ারে ছিলাম এ-ডি-এম, এখানে জুটেছে কেরানীর চাকরী। তাও আবার এখান থেকে সরাবার মতলব ভাঁজছে।"

"দিদি, আপনিই বলুন, একশো ষাটটা বাংলার মালিক যদি এখানে কোনও বাড়ীর বারান্দাতেও থাকবার ঠাঁই না পায় তাহলে মাথা গুঁজবে কোথায়?"

জলের হাল্‌কা আল্‌তো ফোঁটাও ক্রমাগত পড়ে পড়ে শক্ত পাথরের বুকে খোঁদল সৃষ্টি করে। দ্রৌপদীর বুকেও রয়েছে মায়ের হৃদয়। "স্বামী গেছে, ছেলে গেল, এখন বুঝি বা ইজ্জতও যায়।" একটি আধবয়সী রেফুইজী মেয়ের মুখে এই কথা শুনে তাকে তিনটের সময় আসতে বলেছিল দ্রৌপদী। কিন্তু সে যায়নি নিজের দুঃখের কথা শোনাতে বসেছে। মানুষের চোখে জিভ নেই সত্যি কিন্তু ভাষা আছে।

ওর কাহিনী শুনতে শুনতে দ্রৌপদী এত তন্ময় হয়ে পড়ে যে,

অন্যদের তিনটের সময় আসার কথা বলতে ভুলে যায়। এমন সময় দেখা গেল আর একটি মেয়েকে। শতছিন্ন নোংরা দোপাট্টায় তার ফরসা অনাঘ্রাত দেহসৌষ্ঠব কষ্টে-সৃষ্টে ঢেকেঢুকে দ্রৌপদীর দিকে এগোচ্ছিল। শরীরের সামনের দিকটা ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সে সামনের দিকে এমন নুয়ে পড়েছিল যে তার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা মানুষও ওর চোখে পড়ছিল না। মাটির দিকে চোখ রেখে যখন সে দোর-গোড়ায় এসে পৌছল, চৌকাঠে বসে-থাকা একজন রেফুইজীর মাথা ওর পাঁজরায় ধাক্কা খেল। রেফুইজীটা নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল। মেয়েটি দড়াম ক'রে আছাড় খায়। ওর পড়ার আওয়াজে দ্রৌপদীর খেয়াল হল, ওর অস্তিত্বের বিষয় সচেতন হয়ে ওঠে। আগে-আসা রেফুইজী মেয়েটার সাহায্যে দ্রৌপদী ওকে তুলে বাইরের ঘরের নোংরা সতরঞ্চির উপরে শুইয়ে দিল, যদিও সতরঞ্চি অনেক লোকের জুতোর ধূলো-মাটিতে কর্দমাক্ত নোংরা।

ঘরেতে অপেক্ষারত লোকেদের 'তিনটের সময় আসবেন' বলে বিদায় করে দেয় দ্রৌপদী। পড়ে গিয়েই মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখে দ্রৌপদী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সারা শরীর ঘামে নেয়ে গেছে। দ্রৌপদী ভেবে পায়না তার কি করা উচিত। আগে আসা রেফুইজী মেয়েটি উঠে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ব্যাকুল দ্রৌপদী সেই দরজার ফাঁকে চোখ রেখে বাইরে উঁকি দেয়। তখনই হর্ণের আওয়াজ কানে আসে। চমকে ভাবে, এ্যাঁ, তিনটে বেজে গেছে। চোখে পড়ে—আরে, এ তো গণেশ খসমখানা। কথাটা দ্রৌপদীর অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে কিন্তু ভাবনায় হাবুডুবু খাচ্ছে তখন। গণেশকে ইশারায় কাছে ডাকে, কিন্তু তাকে কাজের কথা বলতে সংকোচ হয়, কিন্তু উপায় বা কী?

"ক্যারোলবাগ, গুরুদ্বারা রোডের লেডি ডাক্তার করতার কাউরকে ডেকে আনো।"

সমস্ত দিল্লী শহরটাই গণেশের চেনা হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর মুখে নামটা শোনা মাত্র ট্যাক্সী নিয়ে ছুটে যায়।

ফিরে এসে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গণেশ জোরে জোরে হর্ণ দেয়। কিন্তু সে সময়ে রেফুইজী মেয়েটির কাতরানি আর নবজাতকের কান্না ছাড়া আর কোন শব্দই দ্রৌপদীর কানে যায় না। লেডি ডাক্তারকে দেখে দ্রৌপদী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। প্রসূতির অবস্থা লক্ষ্য করে কর্‌তার কাউর দ্রৌপদীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

"ট্যাক্সীঅলাকে পাঠাবার পর খেয়াল হল আপনাকে টেলিফোন করলেই পারতাম, আপনি একবার টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন।" দ্রৌপদীর কথা শুনে লেডি ডাক্তার বললেন, "হ্যাঁ সেটা ঘমণ্ড সিংহের নম্বর। ও নম্বরে ফোন করলে কিন্তু এখন আর আমার কাছে খবর পৌঁছয় না। পয়সাআলা লোক তো। তবে হ্যাঁ, ওর আত্মীয়স্বজন বা চেনা-জানা কারুর কাজ হলে তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে দেয়।"

"খসমখানে, পয়সার এত গুমোর।" দ্রৌপদী থাকতে না পেরে বলে। দ্রৌপদীর রেফুইজীর প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করে লেডি ডাক্তার প্রসূতির ঠিকানা জানতে চান।

আগাগোড়া ওর বৃত্ত.ান্ত শুনিয়ে দ্রৌপদী বলে, "এখন পর্যন্ত নাম-ধাম কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। একটু ভালা হয়ে উঠুক তখন দেখা যাবে। ভাগ্যিস মাঝ রাস্তায় বেচারার কিছু হয়নি...।"

"হ্যাঁ, দ্রৌপদীদি, আমাকেও আপনাদের কাছে কাঁদুনি গাইতে আসতে হবে। লালাজী কোথায়?"

"কেন? ব্যাপারটা কী? উনি আম্বালা পর্যন্ত গেছেন, ফেরার সময় হয়ে এল।"

"ব্যাপার আর কি দিদি, যে গ্যারাজে বসি, আপনি তো জানেন, প্রায় হাজার দু'য়েক খরচ করে আমি তাতে পার্টিশন করিয়েছি। দিনের বেলা সেটা কর্মস্থান, রাতে ওখানেই কাউচে শুয়ে ঘুমোই। জানতে পেরেছি, এ্যাডভোকেট বকসী খুশালচন্দ আমার গ্যারেজটা নিজের নামে এ্যালট করিয়ে নিয়েছেন।"

"এ্যা! মরুক খসমখানে।"

"হ্যাঁ দ্রৌপদীদি, ভাবনা-চিন্তায় রাতে ঘুম হয়না।" তিনটে বাজলো, সাড়ে তিনটে, চারটে, তারপর পাঁচটাও বেজে গেল। লালা ভগতরামের কোয়ার্টারের সামনে রেফুইজীদের বেশ ভিড়—কিন্তু তিনি তখনও আম্বালা থেকে ফিরে আসেননি।

"চাননশাহজীর বাড়ীতে টেলিফোন করে দেখনা।" দ্রৌপদীর কথামতো একটা ছোট ছেলে টেলিফোন খুঁজে পেতে জানালো, "তাঁর বাড়িতে টেলিফোন নেই।"

"নেই? সে কি, এইতো কিছুদিন হল লালাজী চেষ্টা-চরিত্র করে ওদের বাড়ি টেলিফোন দেওয়ালেনা" দ্রৌপদীর কথা শুনে একটা রেফুইজী বিড়বিড় করে, "লালাজী দৌড়-ঝাঁপ ক'রে শুধু বড়লোকদের কাজই করেন।"

"খসমঁা খানে, হুকুম চালাতে আসে। মাগ্‌না কোন কাজকর্ম চলতে পারে? আজকেই চাননশাহজী লালাজীকে মোটরে করে আম্বালা নিয়ে গেছে। ওর নিজের কাজ ছিল মানছি, কিন্তু লালাজীরও তো রেফুইজীদের অবস্থা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। আরামে গেছেন, আবার আরামেই মোটরে ফিরবেন।" কথা বলতে বলতে দ্রৌপদী নিজের ছেলেকে হাঁক পাড়ল, "টেলিফোন এনকোয়ারী থেকে লালা চাননশাহের নম্বরটা জেনে নে।"

"কোত্থেকে কথা বলছেন?"

"লালা চাননশাহের বাড়ি থেকে।"

"শাহজী আম্বালা গিয়েছিলেন?"

"ফিরে এসেছেন।"

"তাঁকে একটু টেলিফোনটা দিন।"

"খানিক পরে আপনি ফোন করবেন। উনি এখন বাইরের বাগানে। কয়েকজন গেষ্ট এসেছেন, পার্টি চলছে।"

"বেশ, তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে জানান লালা ভগতরাম কোথায়? তিনিও ওঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।"

"আপনি কে কথা বলছেন?"

"দ্রৌপদী, লালজীর বাড়ি থাকে।"

"বেশ, দু-এক মিনিট ফোনে অপেক্ষা করুন কিংবা নিজের নম্বরটা বলে দিন।"

নম্বর জানিয়ে দ্রৌপদী করতার কাউরের সঙ্গে কথা বলছিল এমন সময় টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল।

"হ্যালো।',

"হ্যাঁ, বলুন।"

"শাহজী বললেন, ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি থেকেই টাঙ্গা নিয়ে লালজী রেফুইজী ক্যাম্পে চলে গিয়েছিলেন। মোটরে পেট্রোল কম ছিল তা ছাড়া শাহজীর আরো দু'একটা কাজ ছিল। অবশ্য রেফুইজী ক্যাম্পে গিযে লালজীকে নিয়ে আসবার কথা ছিল কিন্তু আরো নানা কাজে শাহজীর দেরী হয়ে গেল। এদিকে বাড়িতে কয়েকজনকে তিনি চায়ে ডেকেছিলেন। যদি তিনি লালাজীকে নিতে ক্যাম্প যেতেন তাহলে ফিরতে দেরী হয়ে যেত তাই একাই ফিরে এসেছেন ...।" লোকটার কথা তখনও শেষ হয়নি কিন্তু দ্রৌপদী 'খসমাঁখানে' বলেই রিসীভারটা আছড়ে ফেলে। ব্যাপারটা সবাই বুঝল। কাজের জন্য যারা এসে বসেছিল তারা যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিল।

রাত্রির পরিবেশ যতই শান্ত হয়ে উঠে দ্রৌপদীর উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে।

রাস্তা দিয়ে কোনো মোটর গেলেই ওর মনে হয় গাড়ীটা ওদের কম্পাউণ্ডে আসছে। ভুল করে দরজা খোলে কিন্তু মোটর দাঁড়ায় না—তেমনি তীরবেগে উধাও হয়। রেফুইজী প্রসূতির সেবা-শুশ্রুষার অজুহাতে রাত জাগতে হলেও এমনিতে কি সত্যি দ্রৌপদীর চোখে ঘুম আসতো আজ?

"পৌষ মাঘের রাত, বিছানা-পত্তর কিছু নেই, গরম কাপড়ও তো সঙ্গে নেননি, তায় আবার ওষুধ না খেলে ঘুম আসে না।"

ভাবনায় চিন্তায় দ্রৌপদী কখনো বসে, কখনও উঠে দাঁড়ায়, কখনো সদ্য-প্রসূতির কাপড়-চোপড় ঠিক করে দেয়। এমনি করে রাত কেটে ভোর হল। শেষ পর্যন্ত, কালকের মতই ভোর বেলায় একটা মোটর ওদের কম্পাউণ্ডে এসে থামলো। হর্ণের আওয়াজ আজকেও কালকের মতই তীক্ষ্ণ, তীব্র, কিন্তু দ্রৌপদীর কানে ওই আওয়াজটা ভোরের আশাবরী রাগের মত মিষ্টি শোনালো আজ।

গণেশ বাইরে থেকে ট্যাক্সীর দরজা খুলে দিল। একটা পাতলা নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে লালা ভগতরাম ট্যাক্সী থেকে নামলেন।

দ্রৌপদী ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল কম্বলটা কতখানি পুরু। তখন লালজী বলছিলেন, "বেচারা রেফুজীটা সারারাত ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছে। তার কাছে তো ওই একটি মাত্র কম্বল। তবু রেলগাড়ীতে বসবার সময় মানুষটা জোর করে আমার গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে দিল।"

দ্রৌপদী তার বাঁ হাত কামিজের পকেটে ঢোকায়। তখনই তার কানে আসে, "সৎশ্রী অকাল।" গণেশের ট্যাক্সী বেগে দূরে চলে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে দ্রৌপদীর মুখ থেকে ঠিকরে বেরোয়, "এই গরীব মানুষটাকে ছাখো আর ওই খসমখানেদের... ।"

রাসলীলা

১

তখন আমার বয়স বছর আট-নয় হবে। আমরা যেখানে থাকতাম তিনটে পরিবারের থাকার পক্ষে সে বাড়িটায় যথেষ্ট জায়গা ছিল। এক পাশে আমরা থাকতাম, অন্য পাশে অমৃতসরের এক নামকরা ঠিকাদার। আরেকটায় বাস ছিল এক হিন্দু বেনের —আজকের চোখ দিয়ে অনুমান করতে পারি বয়োবৃদ্ধ মানুষটার বয়স ছিল ষাট-পঁয়ষট্টি। আমি জন্মাবার ঢের আগে থেকেই সে এ বাড়িতে থাকতো আর আমাকে খুব ভালোও বাসতো। শুনেছিলাম পৃথিবীতে তার আপনজন বলতে কেউ নেই। এই কারণেই বোধহয় সে নিজেই টাকাপয়সা খরচ ক'রে কোনো গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে।

তিন চার মাস ধরে আমি দেখছিলাম দাদুর দরজা সব সময়েই বন্ধ, যদিও বাইরে তালা লাগানো থাকে না। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখলাম দরজাটা খোলা। দাদুকে ভিতরে দেখে সোহাগভরা গলায় "দাদু! দাদু!" বলে যেই ভেতরে ঢুকেছি দাদু ফিরে চোখ রাঙিয়ে আমাকে চড় দেখায়, মুখের সামনে আঙুল রেখে আমাকে বাইরে ইশারা করে বেরিয়ে যেতে। আমি তো অবাক। দাদুও নিশ্চয়ই আমার থ হয়ে-যাওয়া ভাব দেখতে পেয়েছিল। আমি ফিরে যাওয়ার উপক্রম করতেই দাদু স্কুলের ব্যাগ সুদ্ধ আমাকে কোলে উঠিয়ে নেয় ও বাইরে নিয়ে এসে আমার হাতে এক আনা দিয়ে বলে, "কিশন! এখন থেকে তুই আমাকে কাকা বলে ডাকিস। ডাকবি তো?" আমি তার প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালে আমাকে আদর ক'রে কোল থেকে নামিয়ে দেয় সে।

বাড়ি ঢুকতেই মা আমাকে এক গেলাস দুধ দিয়ে বলেন—এখুনি

ছোট পরোটা তৈরী করে দিচ্ছি। এরই মধ্যে দাতুর ঝি আমাকে ডাকতে আসে।

মা বলেন, "যা খোকা, তোর জেঠু তোকে ডেকে পাঠিয়েছে বোধহয়।"

আমি অবাক হয়ে বলি, "কোন জেঠু? ঠিকেদার জেঠু?"

মা বলেন, "না কাপড়আলা জেঠু।

আমি বলি, "দাতু তো বলছিল, সে আমার কাকা।"

মা হেঁসে বললেন, "হ্যাঁ সেই ডেকেছে। এ ওদের নতুন ঝি। খোকন! তোর জেঠিই বোধহয় তোকে ডেকে পঠিয়েছে।"

এইসব তুর্বোধ্য কথা-বার্তা শুনতে শুনতে আমার মাথা ঘুরে যায়, পরোটা পরে খাওয়া যাবে ভেবে আমি ঝির সঙ্গে গেলাম।

কাকার ঘরে ঢুকলে সে আগের মতই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে সেই অবস্থাতেই ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। লোহার পালংকের কাছে লম্বা আলমারীতে বসানো এক-মানুষ লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক মেয়ে তার হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা কালো চুল আঁচড়াচ্ছিল। ছিপছিপে হালকা গড়ন, গায়ের রং গমের মতন। আয়নার ভিতরে আমাদের আসতে দেখে সে এদিকে ফিরবার আগে পাঞ্জাবী প্রথা মতো মাথার উপর শাড়ীর আঁচল টেনে দিল। কাকা বললেন, "কিশন, এই তোর কাকীমা।"

বাড়ির শেখানো মতন আমি কাকীমার পায়ে প্রণাম করবার জন্য নিচু হই কিন্তু কাকীমা পা পিছনে সরিয়ে নিয়ে তু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার হাত তুটো কোমর পর্যন্ত পৌছয়, আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরি। সে আমার চুলের মধ্যে দীর্ঘ নরম আঙ্গুল চালিয়ে বিলি করতে করতে বলে, "কী মিষ্টি বাচ্চাটা।"

কাকা বলে, "রামপিয়ারী! ওকে আমিও খুব ভালোবাসি। বলতে গেলে ওকে এক আঙ্গুল তু'আঙ্গুল করে মেপে মেপে বড় করেছি।"

মনে পড়ে যখন আমি তার কোমরের কাছ থেকে হাত তুটো

সরিয়ে নিয়েছিলাম এক দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল।

কাকা বলেন, "কি ব্যাপার পিয়ারী ?

"কিছু না।" আবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে বলে। একটু পরে আমাকে আদর করে বলে, "তোমার নাম কি খোকা ?

আমি আমার নাম বললে সে অপাঞ্জাবী ধরণে উচ্চারণ করে, "কৃষ্ণচন্দ্র।"

চুল আঁচড়ানো ফেলে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে আমাকে সর আর ভাত খেতে দিল ও। পরোটার কথা ভুলে গিয়ে আমি জিনিষগুলো পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম তারপর খেলতে চলে এলাম বাইরে।

দিন তিনেক পরে। স্কুল থেকে ফিরছিলাম। দেখলাম কাকার দরজা একটুখানি খোলা। দরজার পিছন থেকে কে যেন আমাকে ডাকছিল। গলাটা চেনা। স্কুলের ব্যাগ নিয়েই ঢুকলাম। ভেতরে কেউ ছিল না। কি জানি কেন, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেই ঘরে গেলাম যে ঘরে সেদিন ঢুকেছিলাম। কাকীমা ঠিক সেই ভাবেই চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়নার মধ্যে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এখন মাথায় ঘোমটা নেই। একটু ইতস্ততঃ করে ও আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার গোলগাল সুন্দর মুখখানা দেখি। ধীরে ধীরে তার চোখে জলের বড় বড় ফোঁটা দেখা দিল। আমি থাকতে পারি না। আমি জানতেও চাইলাম না ও কাঁদছে কেন ? দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে যেমনি আমি তার দিকে এগিয়ে যাই সেওঁ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। আমার হাতদু'টো তার পিঠে জড়িয়ে ধরে আর সেও আমাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে। সেই প্রথম আমি অনুভব করি কোমলতা কি ? সত্যি বলছি আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কাকীমা ডান হাতে আমার গাল তার নরম বাঁ গালে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ অবধি এমনি করে বসে রইলাম আমরা। ওর চোখের জল আমার গাল বেয়ে পড়ছিল। আর্দ্র

হলেও সে জল গরম লেগেছিল। আমি আবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে এত নিকট থেকে যখন ওর মুখের দিকে তাকালাম দেখি ওর চোখ ছুটো বন্ধ, ঠোঁট কাঁপছে। তার পর অন্য হাত শিথিল হয়ে আসে, ধীরে ধীরে চোখ মেলে চায় ও। আজকের অভিজ্ঞতায় বুঝি সেদিন তার চোখ ছিল ভারাক্রান্ত, আলস্যে ভরা যেন তক্ষুনি ঘুম ভেঙেছে। আমি জানতে চাইলাম, "কাকী......"

মাঝখানেই সে বাঙালীদের মতন উচ্চারণে হিন্দীতে বলে ওঠে, "কৃষ্ণচন্দ্র, আমার নাম রাধা। আমাকে রাধা বলে ডেকো।"

আমি মাথা নেড়ে জানাই, "যা তোমার খুশী।" তারপর আমার আগের প্রশ্ন ভুলে গিয়ে বলি, "কাকা কোথায় ?"

রাধা বলে, "সে পশরা নিয়ে মঙ্গলহাটে গেছে। অমাবস্যা ছাড়া কখনো এই সময় তার ফুরসৎ থাকেনা।"

"ঝি ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তাড়িয়ে দিয়েছি তাকে। সে ভালো নয়। এখন আমি সমস্ত কাজ নিজেই করতে পারবো।"

জানিনা হঠাৎ তার কি খেয়াল চাপে। আমার বাঁ কাঁধে স্কুলের ব্যাগ তখনো ঝুলছিল—সেটি নামিয়ে রাখে। আমার কোট খুলে পালংকের উপর ফেলে। ফিতে খুলে জুতো জোড়াও সরিয়ে রাখে। আমার বাঁ পা একটু সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটুর কাছ থেকে বাঁকিয়ে অন্য পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে রাখে। ডান পাটা যেমন ছিল তেমনি সোজাই রইল। তারপর ও চারিদিকে চোখ বুলোয় যেন কিছু খুঁজছে। তারপর ছুটে গিয়ে আলনা থেকে একটা কাঠের ছড়ি নামিয়ে এনে ছড়িটা আমার হাতে দিয়ে তার একটা ধার আমার ঠোঁটের উপর রাখে। পিছনে সরে গিয়ে আমাকে দেখতে থাকে। তাঁর ঠোঁটে একটু হাসি ঝিলিক দেয়, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঈষৎ বিলম্বিত 'হু।' কিছুক্ষণ পরে ওর সাজগোজের টেবিলের দেরাজ থেকে গোলাপী রঙের একটি ফিতে বেরোয়—আমার সোনালী চুলগুলি একপাশে সরিয়ে সেই ফিতে

কপালে বেঁধে বাঁ কানের কাছে একটা সুন্দর ফুল তৈরী করে। আয়না লাগানো লম্বা আলমারী খুলে হলদে রঙের একটি বেনারসী শাড়ী আনে। সেটা হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে ও দেয়ালে টাঙানো একটা বড় ছবির দিকে এগিয়ে যায়, ছবির গলায় ফুলের মালা পরানো। ভালো ক'রে ছবিটা দেখার পর আমার দিকে ফেরে, ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে আমার কোমরে সেই শাড়ীটা জড়াতে থাকে। আমাকে শাড়ীটা পরাবার পর তাকে খুব খুশী আর বিহ্বল দেখায়। ঠিকেদার সরদারদের ছোট মেয়েটা নিজের দাদার কাছ থেকে খেলনা পেলে এই রকম করে। রাধাকে আমার সেই মেয়েটার মতই মনে হচ্ছিল।

খানিক পরেই সে ছড়িটা কেড়ে আমার ব্যাগের পাশে ফেলে দেয়। দু'হাতে মেঝে থেকে উঠিয়ে কোমরের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব দ্রুতগতিতে ঘুরপাক খেয়ে আমাকে নামিয়ে দেয়। আমি টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিই। রাধা আমার তপ্ত গাল দু'হাতে চেপে ধরে কপালে ও চুলের উপর চুমো খায়।

ধীরে ধীরে ও জুড়িয়ে আসে। শাড়ীটাড়ী খুলে রেখে স্কুলের পোশাক পরিয়ে আবার আমাকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেয়। রান্নাঘর থেকে দুধেভরা রুপোর ছোট গেলাস আর রেকাবী ভরা আঙ্গুর নিয়ে এসে আমার সমুখে রাখে। আমি প্রথম দিনের মতই মা-বাবার হুকুমের অবমাননা ক'রে সব খেয়ে নিই। স্নানঘরে নিয়ে গিয়ে সে আমার মুখ হাত ধুইয়ে দেয়। বরফের মত শাদা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। রাধা আমার পিছনে পিছনে আসে। মনে হচ্ছিল রাধা যেন সরদারদের মেয়ের মতই আমাকে বলছে, "কালকে আবার খেলতে এসো। তোমাকে সুন্দর নাচ দেখাবো।"

দরজার বাইরে বৃষ্টি নেমেছিল। তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় নারকেল গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ভিজতে ভিজতে আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকি। মা ব্যাকুলভাবে আমার জন্য অপেক্ষা

করছিল। ঢুকতেই আদর করে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাগ রাগ মুখ করে বলে, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ!"

মা-বাবা ও বইয়ের উপদেশের বিরুদ্ধে সেই প্রথম মিথ্যে বললাম, "অবনীন্দ্রের বাড়ী। ও একটা নতুন মেশিন-লাট্টু এনেছে মা।"

মা শান্ত হয়।

২

পরের দিন স্কুলে পড়ায় আমার একটুও মন বসেনা। অনেক কষ্টে অনেক প্রতীক্ষার পর ছুটির ঘণ্টা বাজে। বিপিন তার বইয়ের ব্যাগে একটা চাবি দেওয়া মোটর এনেছিল। তার ইচ্ছে আমরা মোটরটা ফুটপাথে চালিয়ে খেলব। কিন্তু আজ আমি তাকে সোজা জবাব দিলাম। আমি রাধার সঙ্গে খেলতে চাইছিলাম, আর দেখতে চাইছিলাম সেই নাচ যা সে আজ নাচবে।

বাড়ি গিয়ে দুধ না খাবার ছুতোয় আজেবাজে বানিয়ে বললাম। 'অবনীন্দ্রের বাড়ি খেলতে যাচ্ছি' মিছে কথাটা বলে আমি সোজা রাধার বাড়িতে গিয়ে ঢুকি।

অনেক আগে থেকেই রাধা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আজ তার সাজগোজ দেখে আমার চক্ষুস্থির। এর আগে আমি কোনো মেয়েকে এত সুন্দর শাড়ী পরতে ও সাজতে দেখিনি। হাতের মুঠোয় আঙ্গুল ধরে ও আমাকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যায়। আমাকে আসনে বসিয়ে নিজে মেঝের উপর বসে। সামনে রুপোর বাসনে দুধ, মালাই, ভাত, চাপাটি তরকারি এমন কি মাখন অবধি রাখা। একটা সোনালী রেকাবীতে সেই মরশুমের সবরকম ফল। আমার অনিচ্ছার কথা শুনেও রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ও আমাকে খাওয়াতে থাকে। খেতে খেতে শীগ্‌গিরই আমার পেট ভরে যায়। রাধা স্নানের ঘরে গিয়ে আমার হাত-মুখ ধুইয়ে দেয়।

আমরা পাশের ঘরে ঢুকি। ঘরটা ধূপের সুগন্ধে ম'ম' করছে। ড্রেসিং টেবিলের উপর একটি রুপোর থালায় ফুলের মালা ও তখনো না-জ্বালানো ঘি-র পিদ্দিম। দেখতে-দেখতে আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির গোছা থেকে একটি চাবি বের করে একটি কাপড়ের আলমারী খোলে। তার থেকে একটি হলদে রেশমী শাড়ী বের করে রাধা খাটের উপর রাখে। একটি তাক থেকে ময়ুরের পালক বসানো মুকুট নামাতে নামাতে রাধা বলে, "কৃষ্ণচন্দ্র, এমুকুট আমি নিজের হাতে তোমার জন্যে বানিয়েছি জানো?"

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। রাধা দেরাজ থেকে একটি বাঁশী বের করে আনে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ধুতি, ফুলের হার ও বাঁশী দিয়ে সাজিয়ে কালকের মত দাঁড় করিয়ে দেয় আমাকে। সামনের ছবির গলাতেও ফুলের একটা মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। সামনের আয়নায় আমার মুখ দেখি। হুবহু সামনের ছবির মতন লাগে। আমি শুধোই, 'রাধা, ও ছবিটা কার?"

মুচকে হেসে ও বলে, "বারে, তাও জানোনা? কৃষ্ণচন্দ্রের।"

"আমার?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ হ্যাঁ—কৃষ্ণচন্দ্রের।"

দেশলাই জ্বালিয়ে থালায় সাজানো পাঁচটি পিদ্দিম ধরানো হয় তারপর রাধা দু'হাতে থালা ধরে আমার সমুখে এসে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ফেলে। একটু পরে চোখ খুলে আঙুলে ধোয়া কেশর ও চাউলের পিটুলি নিয়ে আমার কপালে ফোঁটা পরিয়ে দেয়। কি মনে করে আমি আঙুলে কেশর তুলে তার কপালের দিকে হাত বাড়াই। ও মাথা নোয়ায়।

আমার আঙুলের ছোয়ায় রাধা কেঁপে ওঠে। হাতে ধরা প্রদীপের থালা চলকায়। বাতির শিখা, ধূপের ধোঁয়া কাঁপে আর জানিনা কেমন ক'রে ওর পায়ে নুপুপের ঝুমঝুম কেঁপে ওঠে। হঠাৎ রাধা নিজের জায়গা থেকে নড়ে ওঠে, এমনভাবে সামনে এগোয় যেন পিছলে পড়বে। এমন করে ওর শরীরটা এগিয়ে

আসে, আবার চকিতে নিজেকে সামলে নেয়। পিছলে যাওয়া ও সামলে নেওয়ার গতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমি বুঝতে পারি নাচ শুরু হয়ে গেছে। কোমর বেঁকাতেই তার খোলা চুল মাটি ছুঁতে থাকে। হাওয়ার হিল্লোলে জেগে ওঠা ঢেউয়ের মত দোলা লাগে শরীরে। গতিবেগ দ্রুততর হয়। ঘুঙুরের ঝংকারে অদ্ভুত এক নিবিষ্টতায় ভরে উঠে ঘর। গতিবেগ আরো দ্রুত। জ্বলন্ত শিখার একটি বৃত্ত আমার চারিদিকে জেগে ওঠে। যেন নক্ষত্ররা পাক খাচ্ছে। আশে-পাশে কয়েকটি রাধাকে দেখতে পাই। আমারই চেহারার কয়েকটি ছেলে আমার বর্তমান পোষাকে তার সঙ্গে ঘুরছে। মনে হচ্ছিল আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই। এমন মনে হয় কেউ যেন জোর করে আমার আঙুলগুলো বাঁশীর ফুটোর উপর রেখে দিয়েছে। আমি বাঁশীতে মুখ রেখে ফুঁ দিই। জানিনা কেমন করে আমার ছোট ছোট আঙুলগুলো বাঁশীর ফুটোয় নেচে বেড়ায়। আমি কখনো বাঁশী বাজাইনি, আজও কোনো বাজনা বাজাতে শিখিনি অথচ সেদিন যেমন বাজিয়েছিলাম, সে রকম বাঁশী আমি কোনো ওস্তাদকেও কখনো বাজাতে শুনলাম না।

ধীরে ধীরে আমার আঙুলগুলো শিথিল হয়ে আসে। নাচের বেগ মন্থর হয়ে যায় ক্রমে। একটাই রাধা থেকে যায়, আমিও একা হয়ে পড়ি। কবরের নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরে ঘরটাকে। রাধা মাতালের মত টলছিল। কিন্তু প্রদীপ রাখা থালাটা সে পড়ে যেতে দিচ্ছিল না। আমি এগিয়ে গিয়ে থালাটা তার হাত থেকে নিই। টেবিলে রাখার তর সয়না, তার আগেই রাধা সশব্দে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। বাঁশী খাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আমি তাকে সামলাই। জানিনা কোথা থেকে আমি এত শক্তি পেয়েছিলাম। একজন সমর্থ মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল নিজেকে। ধুতির আঁচল দিয়ে বাতাস করে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। উঠে রাধা আমার গালে চুমু খায়। আমার শিরায় শিরায় কি এক কাঁপন থরথরিয়ে ওঠে। আধো অচেতন অবস্থায় আমি ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি। কেঁপে উঠে সেও

আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে, আমার বাহু দু'টির মধ্যে নিঃসাড়ে নিজেকে এলিয়ে দেয়। আমি ওর গালে ঠোঁটে এমনকি চুলেও চুমু খাই। রাধা একটুও সাড়া দেয় না, নিথর হয়ে থাকে। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। কিছুক্ষণ পরে সে তন্দ্রালু চোখ দু'টি অল্প একটু খোলে আর তক্ষুনি বন্ধ করে নেয়।

দরজায় শব্দ হয় হঠাৎ। আমরা উঠে দাঁড়াই কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। আমাকে আবার আগের মতন কিশনচন্দ সাজিয়ে দেওয়া হয়। যখন বাড়ী পৌঁছোলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

৩

ডাক্তারকে দেখান হল। তার রায় হল আমার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ঠিক।

"এর খিদে পায়না কেন?" আমার বাবা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন।

"হজমশক্তি তো ঠিকই আছে" ডাক্তার উত্তর দেন।

স্কুলে পরীক্ষার ফল ভালোই হয়েছে তবু আমার উপর নজর রাখা হল।

আমি রোজ রাধার কাছে যাই কেউই এটা সন্দেহ করেনি। কিন্তু প্রত্যেক দিনই রাতে কিছু খেতে চাইনে তাই নিয়ে মার বড় ভাবনা। মা গোয়েন্দার মত আমাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। একদিন আমি রাধার বাড়ি গিয়েছি, মা পা টিপে টিপে লুকিয়ে আমার পিছনে পিছনে এলো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ ভিতরে ঢুকতে পারলো না। কতক্ষণ ধরে বাইরে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়েছিল। নাচ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ডাক শোনা গেল। জোর গলায় মা ডাকে, "রামপিয়ারী! রামপিয়ারী!"

আমি তো ভয়ে জড়োসড়ো কিন্তু রাধা চটপট কাপড়-চোপড় খুলে আমাকে আমার পোষাক পরিয়ে দেয়। ডাকাডাকির ঝড়ের মধ্যেই হাত-মুখ ধুইয়ে দেয়। আমাকে আবার ঘরেই লুকিয়ে রেখে

ও বাইরে বেরোয়, দরজা খুলে মাকে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি ?

মা রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "কিশন কোথায় ?

রাধা বলে, "আছে এখানেই কোথাও।"

"আমি তাকে নিজের চোখে ভিতরে ঢুকতে দেখেছি," মা বেশ কড়া গলায় বলে।

"দেখছি ভিতরে আছে কিনা।" রাধা খুব শান্ত গলায় বলে, "আমি ঘুমোই আর ও অনেক সময় দরজা বন্ধ করে একা একা খেলা করে।"

ও ভিতরে এসে আমার হাত চেপে ধরে। ভয়ের চোটে আমি তখন অসহায়ের মত কাঁপছি। রাধা মৃদুস্বরে বলে, "ভয় পেয়োনা কৃষ্ণ! আমরা তো চোর নই। কোনো পাপও করিনি।"

সাহস ফিরে এল আমার বুকে। রাধা আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে। আমার হাত মার হাতে দিয়ে বলে, "এই নিন, আপনার মাখনচোরাকে ধরুন, ভিতরের ঘরে লুকিয়েছিল।"

মা আমাকে ছেড়ে ভিতরে ঢোকে। পাশের ঘরে ছড়ানো জিনিষপত্র, জ্বলন্ত পিদ্দিমগুলো দেখে ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে, "হুঁ" তারপর রাধার উপর সন্দেহ ভরা চোখের আগুন ছড়িয়ে বাইরে এসেই আমাকে ঠেঙাতে শুরু করে। রাধা আমাকে ছাড়াবার জন্য বেরিয়ে আসে আবার কি ভেবে ভিতরে চলে যায়। আবার আসে, আবার ফিরে যায়। আমার গালে এক একটা চড় পড়তেই ও কুঁকড়ে যায়।

মা বাড়ি এসে আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে বাবার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে। আমি জেনে শুনে নাক ডাকাতে আরম্ভ করি। বাবা ফিরলে মা বেশ যত্ন করে খেতে দেয়। খাওয়া দাওয়ার পরে রোজকার মতো বারান্দায় কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর বাবা এসে নিজের খাটে শুয়ে পড়ে। মাও কাজকর্ম চুকিয়ে

নিজের খাটে এসে বসে। খানিক পরে মা মৃদু গলায় বলে, "ওগো! জেগে আছ?'

বাবা পাশ ফিরে শুয়ে বলে, "হ্যাঁ।"

"আমি একটা কথা বলতে চাইছিলাম," এমন স্বরে মা বলে যেন কথাটা ভীষণ জরুরী।

"কি কথা?"

মা আজ যেটুকু দেখেছে আর যা শুনেছে সব ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলার পর জুড়ে দেয়, "জানিনা এই বাঙালিন্ যাদুকরণী আমার সোনাকে ঘরে বন্ধ করে কি করছিল?"

বাবা জবাব দেয়, "পাগলীর মত কথা বলিসনা সোধাঁ!

মা তবু এ ব্যাপারে নাছোড় দেখে শেষে বাধ্য হয়ে বাবা বলে, "আচ্ছা, কালকে বুড়োর সঙ্গে দেখা করব।"

8

তৃতীয় দিন যখন আমি স্কুল থেকে ফিরছিলাম, বাড়ি না ঢুকে সোজা রাধার বাড়ির দিকে পা বাড়াই। চোখে পড়ে দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে জিনিষ-পত্র কিছু নেই। চোখ রগড়ে ভাল করে তাকাই। কেউ নেই। পাশের ঘরে ঢুকি, সেখানেও কেউ নেই। মনে হচ্ছিল, আমার শরীরের একটা অঙ্গ কেটে নিয়ে কেউ চলে গেছে। বইয়ের ব্যাগ সমেত আমি একটা কোণে বসে পড়লাম। বোধ হল, আমি পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কে একজন এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ভাবলাম, হয়তো রাধা। কিন্তু হাতটা খুব কসে ধরা হয়েছিল। মাথা উঠিয়ে দেখলাম—সমুখে মা। আমি কাঁদছিলাম। মা আমাকে টেনে হিচড়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

আলোক সামান্য

..."তারপর গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে হাসান আবদালের জঙ্গলে পৌঁছোলেন। দারুণ গরম, কাকের চোখ ঠিকরে পড়বে এমনি চড়চড়ে রোদ। চারিদিক নির্জন, ধু ধু করছে বালি আর পাথর। রোদেপোড়া ঝোঁপঝাড়, শুকনো গাছ। মানুষজনের দেখা মেলেনা কোথাও।"

"তারপর কী হল মা?" আমি চেঁচিয়ে উঠি।

"গুরু নানক নির্ভাবনায় আপন মনে হেঁটে চলেছিলেন, হল কি, এদিকে মরদানার খুব তেষ্টা পেল। কিন্তু জল কোথায়। গুরু বললেন, মরদানা সবুর করো। সামনের গাঁয়ে পৌঁছে যত ইচ্ছে জল খেও।"

কিন্তু মরদানার তখন দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। শুনে গুরু নানক খুব ভাবনায় পড়লেন। এই জঙ্গলে বহুদূর পর্যন্ত জল তো কোথাও নেই, অথচ মরদানা একবার জেদ ধরলে সব্বাইকে বড় মুশকিলে ফেলে। গুরু আবার তাকে বোঝান, ছাখ মরদানা এখানে জল কোথাও নেই। খানিক সবুর কর। ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নে।"

"কিন্তু মরদানা আর এক পাও এগোয়না, সেখানেই বসে পড়ে। তারপক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়। গুরু বেশ অসুবিধায় পড়লেন। মরদানার জেদ দেখে হাসি পেল তাঁর, বিরক্ত লাগল। ফের মরদানা যখন কিছুতেই চলতে রাজি হলনা, গুরু নানক ধ্যানে ডুবে গেলেন। চোখ খুলে দেখলেন, মরদানা জল থেকে তোলা মাছের মত ছটফট করছে। সদ্‌গুরু তা দেখে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন, ভাই মরদানা, এখানে পাহাড়ের উপর একটা কুটিরে বলী কন্ধারী নামে এক দরবেশ থাকে। যদি তুমি তার কাছে যেতে পারো, জল পাবে। এ জায়গায় ওরই কুয়ো জলে ভরতি—আর কোথাও না।"

"তারপর কি, বলনা।" আমি অধৈর্য হয়ে উঠি, মরদানা জল পেল কিনা জানতে।

"মরদানার জোর তেষ্টা পেয়েছে, কথাটা শুনেই সে পাহাড়ের দিকে ছোটে। চড়চড়ে দুপুর—তেষ্টাও পেয়েছে ভীষণ, তায় পাহাড়ে চড়া। হাঁপ ধরে, ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে যায় মরদানার শরীর। অনেক কষ্টে সে উপরে পৌঁছয়। বলী কন্ধারীকে সেলাম ক'রে সে একটু জল চায়। বলী কন্ধারী ইশারায় কুয়োটা দেখিয়ে দেয়। সে যখন কুয়োর দিকে চলেছে বলী কন্ধারীর কি খেয়াল হয়, মরদানাকে জিগেস ক'রে, 'ভাই তুমি কোত্থেকে আসছ?'

"মরদানা উত্তরে বলে, আমি পীর নানকের সাথী। যেতে যেতে এখানে এসে পড়েছি, আমার ভীষণ তেষ্টা পেল কিন্তু নিচে জল কোথাও নেই। নানকের নাম শুনে বলী কন্ধারী খুব চটে গেল। তক্ষুনি ও মরদানাকে কুটির থেকে তাড়িয়ে দিল। জল না পেয়ে ক্লান্ত হয়রান মরদানা নিচে এসে গুরু নানকের কাছে নালিশ করতে থাকে। গুরু তার অভিযোগ শুনে মৃদু হাসেন।—মরদানা, তুমি আবার যাও। নানক তাকে উপদেশ দেন।—এবারে খুব নম্রভাবে তুমি ওর কাছে যেও, বোলো আমি নানক দরবেশের সঙ্গী। মরদানা তেষ্টায় কাতর। জলও আর কোথাও ছিলনা। ক্ষোভে রাগে মনে মনে বিড়াবড় ক'রে নালিশ করতে করতে সে আবার উপরে ওঠে। কিন্তু বলী কন্ধারী তাকে সেবারেও জল দিলনা।—একটা কাফেরের চেলাকে আমি এক ঢোঁক জলও দেবনা। বলে বলী কন্ধারী আবার তাকে ফিরিয়ে দিল। এবারে মরদানা যখন নেমে এল তখন তার অবস্থা কাহিল। শুকনো ঠোঁট ফেটে চৌচির, সারা শরীরে ঘাম ছুটছে। মনে হচ্ছিল, মরদানার মেয়াদ আর বেশীক্ষণ নয়। গুরু নানক সব শুনে মরদানাকে বল্লেন, 'ধন্য নিরংকার' হাঁক দিয়ে সে আরো একবার বলীর কাছে যাক। মরদানা হুকুম অমান্য করতে পারেনা। আবার রওনা হয়, যদিও সে জানত এবার রাস্তাতেই তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তৃতীয়বার পাহাড়ের চূড়োয় উঠে মরদানা বলী কন্ধারীর পায়ে আছড়ে পড়ে, কিন্তু রেগে আগুন ফকির এবারেও তার কাকুতি মিনতিতে টলেনা।

—নানক নিজেকে পীর বলে বেড়ায় আর অনুগতকে এক ঢোঁক জল খাওয়াতে পারেনা। বলী কন্ধারী ঝেড়ে কথা শোনায়। এবারে নিচে পৌঁছে তেষ্টায় কাতর মরদানা গুরু নানকের পায়ের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে। গুরু মরদানার পিঠে হাত বুলোতে থাকেন। তাকে সাহস জোগান। মরদানা চোখ খোলে। গুরু তাকে সামনের একটা পাথর ওঠাতে আদেশ করেন। মরদানা পাথরটা তুলতেই তার নিচে থেকে মাটি ফুঁড়ে ওঠে জলের ফোয়ারা—যেন স্রোত জেগে উঠেছে। আর দেখতে দেখতে চারদিক জলে জলাকার। ওদিকে বলী কন্ধারীর হঠাৎ জলের দরকার পড়ল। কুয়োয় এক ফোঁটা জল নেই দেখে ভীষণ অবাক হয়ে যায়। অথচ টিলার নিচে যেন জলের বান ডেকেছে, মাটি ফুঁড়ে উঠছে ফোয়ারা। ভীষণ রেগে বলী পাথরের একটা আস্ত চাঙড়া গায়ের জোরে নিচের দিকে ঠেলে দিল। এতবড় পাথরকে নিজের দিকে গড়িয়ে আসতে দেখে মরদানা চিৎকার করে ওঠে। গুরু নানক সংযত গলায় মরদানাকে 'ধন্য নিরংকার' উচ্চারণ করতে বলেন, আর পাহারের টুকরোটা যখন মাথার খুব কাছে এসে যায়—গুরু হাত বাড়িয়ে পাঞ্জা দিয়ে পাথরটা ঠেকান। হাসান আবদালে যার নাম এখন 'পাঞ্জা সাহেব', পাথরের উপর এখনো গুরু নানকের হাতের সেই ছাপ রয়েছে।"

গল্পটা (সাখী) আমার খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু হাত দিয়ে পাহাড় থামাবার কথা শুনে আমার মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে উঠল। কী করে এটা ঘটতে পারে? তাছাড়া পাথরের উপর এখনো নানকের হাতের ছাপ আছে! আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছিল না। "পরে হয়তো কেউ খোদাই করে রেখেছে।" অনেক-ক্ষণ ধরে আমি মার সঙ্গে তর্ক করলাম। এতখানি মেনে নিতে রাজি ছিলুম যে, পাথরের নিচে থেকে জল বেরোতে পারে। বিজ্ঞানে এমন সব পদ্ধতি আছে যা কাজে লাগালে যেখানে জল আছে সে জায়গাটার খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু এটা কিছুতেই মানতে

পারিনা যে, কোনো মানুষ গড়িয়ে আসা পাহাড়কে আটকাতে পারে। আমি কিছুতেই মানিনি—মা আমার মুখের ভাব দেখে চুপ ক'রে গিয়েছিল।

গড়ানো পাহাড়কে কেমন করে থামাবে ? এই সাখীর (ধর্মকথা) কথা মনে পড়লেই আমার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠত।

এই ধর্মকথা অনেকবার গুরুদ্বারায় শোনানো হয়েছে। কিন্তু হাত দিয়ে পাহাড় থামাবার কথা শুনে আমি প্রত্যেকবার মাথা নেড়েছি।

কিছুদিন পরে আমরা শুনলাম পাঞ্জা সাহেবে 'সাকা' হচ্ছে। সে যুগে অনেক 'সাকা' হত। যখনই কোনো 'সাকা' হত, আমি বুঝে নিতাম, সেদিন আমাদের বাড়িতে রান্না হবেনা। আর রাত্তিরে মাটিতে শুতে হবে। কিন্তু এই 'সাকা' কি ব্যাপার তা জানতাম না।

আমাদের গাঁ পাঞ্জা সাহেব থেকে বেশী দূরে নয়। যখন এই সাকার খবর এলো, মা পাঞ্জা সাহেব রওনা হলেন। মার সঙ্গে ছিলাম আমি আর আমার ছোটবোন। সারা রাস্তা দেখলাম মায়ের চোখে জল। ভবে হয়রান হচ্ছিলাম, এই 'সাকা' আসলে কী ?

পাঞ্জা সাহেব পৌছে আমরা এক অসাধারণ ঘটনার কথা শুনলাম।

দূরের কোনো এক শহরে ফিরিঙ্গিরা নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে হত্যা করেছিল। যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে জোয়ান বুড়ো সকলেই ছিল। যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের গাড়ীতে ভরে ভরে অন্য শহরের জেলে চালান দেওয়া হচ্ছিল। বন্দীরা সকলেই খিদে তেষ্টায় কাতর, অথচ হুকুম ছিল গাড়ী রাস্তায় কোথাও থামানো চলবেনা। খবরটা যখন পাঞ্জা সাহেবে এসে পৌছল, শুনেই সমস্ত মানুষ রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জা সাহেবে গুরু নানক নিজের মরদানার তেষ্টা মিটিয়েছেন, সেই শহরের উপর দিয়ে খিদে তেষ্টায় উৎপীড়িত

যাত্রীদের নিয়ে ট্রেন বেরিয়ে যাবে এ কেমন করে হতে দিতে পারে তারা? ঠিক হল গাড়ী থামানো হবে। স্টেশন মাষ্টারের কাছে আর্জি পেশ করা হল, টেলিফোনে জানানো হল—টেলিগ্রামও পাঠানো হল। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের হুকুম, গাড়ী কোথাও থামানো হবেনা। অথচ গাড়ীর কামরায় অপেক্ষমান স্বাধীনতাকামী, দেশ-প্রেমিক ভারতীয়রা অভুক্ত পিপাসার্ত—তাদের খাবার জলের কোন ব্যবস্থা নেই। পাঞ্জা সাহেবে গাড়ী থামবেনা। অথচ পাঞ্জা সাহেবের লোকেরা অবিচল: গাড়ী থামাতেই হবে। শহরের মানুষজন রুটি ডাল পুরি পায়েস স্তুপাকার ক'রে ফেলল স্টেশনে।

কিন্তু গাড়ী তুফান বেগে এসে কালবোশেখীর ঝড়ের মতন বেরিয়ে যাবে। তাকে থামাবে কী করে?

আমার মায়ের সই বলছিলেন, "তারপর সেখানে রেল লাইনের উপর ওরা শুয়ে পড়লো—আমাদের ছেলেপুলের বাপেরা—তার সঙ্গে সাথীরা আর সকলে। তারপর আমরা মেয়েরা শুয়ে পড়লাম। তারপর বাচ্চারা শুয়ে পড়ল। গাড়ী এল। চিলের মতন আওয়াজ করে চেঁচাতে চেঁচাতে সিটি বাজিয়ে। অনেকটা দূর থেকেই তার দৌড়ের তেজ ঢিমে হয়ে গেছল। তবু হাজার হোক রেলগাড়ী, থামতে থামতেও অনেকখানি এগিয়ে যায়। দেখতে দেখতে গাড়ীর চাকা ওঁদের বুকের উপর উঠেছে....ফের ওঁর সাথীদের বুকে....যখন চোখ খুললাম, দেখি গাড়ী আমার মাথার কাছে এসে থেমেছে। আমার পাশে শুয়ে থাকা মেয়েদের বুক থেকে ধন্য নিরংকার ধন্য নিরংকার ধ্বনি উঠছিল। নিমেষের ভিতর গাড়ী পিছু হটল আর চাকার নিচে শুয়ে থাকা মানুষগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল...

"নিজের চোখে দেখতে পেলাম রক্তের নদী বইছে, অনেক দূরে বয়ে যাচ্ছিল সেই রক্ত-স্রোত—বাঁধানো নালার পুল পর্যন্ত।"

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বসেছিলাম। মুখ দিয়ে একটা টু শব্দও বেরোল না। সারাদিন এক ঢোঁক জলও নামল না আমার গলা দিয়ে।

সন্ধ্যেয় ফিরে আসার সময়ে মা আমার ছোটবোনকে আবার সেই গল্পটা শোনাচ্ছিলেন। কী করে গুরু নানক এই পথে এসেছিলেন মরদানাকে সঙ্গে নিয়ে। মরদানার কেমন তেষ্টা পেয়েছিল। বলী কন্ধারী তিনবার মরদানাকে হতাশা করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কখন গুরু মরদানাকে পাথর তুলতে বলেছিলেন। কেমনভাবে মাটি ফুঁড়ে উঠল জলের ফোয়ারা। আর কিসের টানে বলী কন্ধারীর কুয়োর সমস্ত জল নিচে নেমে এল। তারপর বলী কন্ধারী রাগের চোটে উপর থেকে পাহাড়ের একটা প্রকাণ্ড চাঙড় নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মরদানা কি রকম ভয় পেয়েছিল। কিন্তু গুরু নানক ধন্য নিরংকার বলে নিজের হাতে সেই পাহাড় আটকে রাখলেন।

কিন্তু পাহাড় কী করে হাত দিয়ে থামাতে পারে মানুষ? আমার বোন বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে মাকে।

কেন থামাতে পারবেনা? আমিও মাঝে পড়ে বললাম। ঝড়ের মত ছুটে আসা রেলগাড়ী অবধি থামলো, আর পাহাড়কে কেউ আটকাতে পারবেনা?

আমার চোখে জল ছাপিয়ে এল। খেলাচ্ছলে নিজেদের প্রাণ দিয়ে যারা এই কাজ করে গেল—সেই মানুষগুলোর জন্য।—নিজেদের তৃষ্ণার্ত অভুক্ত দেশবাসীকে যারা রুটি আর জল দিয়ে গেল।

দসোধাসিং

রাস্তাটা দসোধাসিং-এর চেনা। বানিহাল থেকে মাইল দশেক গেলেই পাহাড়ের চড়াইতে হাঁকরা বিচ্ছিরি বাঁকটার কথা পাঠান-কোট থেকেই সে নিজের ক্লীনারকে বলতে থাকে। কাটা খরমুজের ফালির মতো সড়কের সেই জায়গাটার দারুণ বদনাম। বরফ পড়ার মরশুমে এমন প্রচণ্ড হাওয়া চলে যে, পাহাড়ের উপর থেকে খসতে থাকে। সড়কও বন্ধ হয়ে যেত কখনো-সখনো। তখন সরকারের তরফ থেকে বরফ সরাবার কাজ চলে, ট্রাফিক যাতে আটকে না পড়ে।

আজ আবহাওয়া পরিস্কার। বটোতে রাতটা কাটিয়ে স্টিয়ারিং-এ বসে দসোধাসিং বলে ওঠে, "বাঃ বাঃ! আরে আজ তো ভয় পাবার কিছু নেই রে ব্যাটা।" তারপর নিজের ক্লীনারকে গজখানেক লম্বা গালাগালি দিয়ে রঙ-বেরঙের জীবজন্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ পাতিয়ে শান্তিজল ছিটোনোর সুরে বলে, "ওয়াহ গুরু, সাচ্চা পাদশাহ! তোরই ভরসা"

গাড়ীতে তিনজন আরোহী ও অনেক মালপত্র। সামনের আয়না দেখে দসোধাসিং বলে, "আপনারা ওয়াহ গুরু, সাচ্চা বাদশাহের আড়াইজন মাত্র প্রাণীই তো! দু'জন পুরুষ, একজন মেয়েছেলে।"

যাত্রীদের মধ্যে একজন পুরুষ বলে ওঠে, "সর্দারজী, মেয়ে-ছেলেকে আপনি অর্ধেক সোয়ারী হিসেবে গুনছেন নাকি?

"তাহলে তো টিকিটও আদ্দেক হওয়া উচিত।" মেয়েটি বুলবুলের মত মিষ্টি সুরে বলে।

বানিহাল গেটে গাড়ীগুলো থামে। গেট খুলতে এখনো মিনিট বিশেক বাকী। দসোধাসিং বলে, "বিশখানা গাড়ী আমাদের সামনে আর পাঁচখানা আমাদের পিছনে, সব মিলিয়ে ছাব্বিশ। হয় সবাই একসঙ্গে মরবো নয়তো পার হয়ে যাব। আবহাওয়া কিছু খারাপ নয়।" সে আবার আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে

বলে, "তোর ইচ্ছা তুইই জানিস, ওয়াহ গুরুজী! একদিন না একদিন টিকিট কাটাতেই হবে। ওখানেও আমরা তোমার ড্রাইভারই হব।"

"ওস্তাদ, আমি কিন্তু ওখানে ক্লীনারী করবো না।" ক্লীনার মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"চুপ মেরে-যা, আলুবোখারা কোথাকার।" দসৌধাসিং নিজের ভাষায় বেশ শালীনতা দেখায়।

"ওস্তাদ, এই ক্লীনারী আর কদ্দিন করাবে?" ক্লীনার সামনের সিটে বসেই প্রথমে পিছন ফিরে আরোহীদের দেখে তার পর নিজের দৃষ্টি দসৌধাসিং-এর দিকে ফেরায়।

"চুপ কর জানী চোরের কছহরা* কোথাকার।" দসৌধাসিং তাকে একহাত নেয়। "এখন পর্যন্ত তুই জানিসই বা কি? হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে পারিস আর ভারী ভারী বচন ঝাড়তে পারিস।"

"জানী চোরের কছহরা-র মানে কি সর্দারজী?" মেয়েটি হেসে প্রশ্ন করে।

দসৌধাসিং সামনের আয়নার ভিতর দিয়ে এই রোগা-টিংটিঙে মেয়েটির লম্বাটে মুখের উপর বড় বড় চোখ দু'টি জরিপ করে বলে, দশম পাদশাহ বলে গেছেন বীবীজী! কি বলেছেন? পাঁচটা ক'কার ধারণ কর। কড়া, কেশ, কংঘা, কৃপাণ। এই হল চারটি আর পঞ্চম হল কছহরা। একবার 'শয়তান-গলি'তে বেলচা দিয়ে বরফ পরিস্কার করবার সময় এর কছহরা হারিয়ে যায়। আমি ওকে একটা কছহরা দিই, সেটা আমি জম্মুতে সেলাই করিয়েছিলাম। তখন থেকে, ওয়াহ গুরুর দিব্যি, আমাদের এই জানী চোর নিজের মাইনে থেকে কখনো কছহরা সেলাই করায় না। যখন কছহরা ছিড়ে যায় সমুখে এসে 'ওস্তাদ' বলে, নয় 'কাকা' বলে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।"

*কছহরা=জাঙিয়া

রোগা-পটকা মেয়েটি তার দু'ই সঙ্গীকে বলে, "বেশ হয় যদি আমরা সর্দারজীকেও আমাদের নাটকে একটা পার্ট দিই।"

"আমাকে ড্রামায় পার্ট দেবার আগে," দসোঁধাসিং গেট খোলার খবর পেয়ে বলে, "শয়তান গলি থেকে বাঁচিও, হে সাচ্চা পাদশাহ! বেঁচে গেলে ড্রামায় পার্টও ঢের করতে পারব।"

সামনের গাড়ীগুলি দ্রুতগতিতে গেট পার হয়ে যাচ্ছিল। দসোঁধাসিংও গেট পার করে।

মসৃণ সমতল পথে উপরে উঠতে উঠতে পাহাড়ের বিশালতার দিকে চেয়ে সে দু'ই হাতে কান ছুঁয়ে বলে, "সৎনাম শ্রী ওয়াহ গুরু! অকালপুরুষ, তুমিই ভরসা!" এবং দ্বিতীয়বার কান ছুঁয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে বলে, "সাচ্চা পাদশাহ, তোমারই শরণ নিয়েছি। পঞ্চভূত দিয়ে পুতুল বানিয়েছ। কাউকে ড্রাইভার গড়েছ তো কাউকে ক্লীনার। কেউ কেউ আবার নাটকের মেয়ে-পুরুষ।" তাপপর ছিপছিপে মেয়েটার লম্বাটে মুখে সরু চিবুকে বড় তিলটার উপর চোখ রেখে বলে, "বীবীজী আপনি কি ড্রামা করেন। কোন পার্ট করেন আপনি?"

রোগা মেয়েটার একজন সঙ্গী সর্দারজীর কাঁধ থাবড়ে বলে, "আমাদের এই গুলহিমা নায়িকার চেয়ে ছোট কোনো পার্ট করেনা।"

গুলহিমা বলে, "সর্দারজী, ইনি হলেন আমাদের ডাইরেক্টর! এঁরই নজরের দৌলতে আমি হিরোইন। শেঠজীও আমার কাজে খুশী।"

ডাইরেক্টর মোরগের মত পেট ফুলিয়ে বলে, "গুলহিমা, তুমি তো নায়িকা হবার জন্যেই জন্মেছ। এ কথা কতবার শেঠজীই বলেছেন। এ সবই তাঁর টাকা কড়ির দৌলতে।"

তৃতীয় সঙ্গী খুব বিনীতভাবে বলে, "বুঝলেন সর্দারজী, গুলহিমার ডায়ালোগ আমাকেই লিখতে হয়।"

"ও! আপনি ড্রামা লেখেন?" জোরে গাড়ীর ষ্টিয়ারিং

ঘোরাতে ঘোরাতে সর্দারজী বলে, "বাহবা কি বাহবা! সাচ্চা পাদশাহ! আমাদের দশম বাদশাহ[1]ও বিচিত্র নাটক[2] লিখে-ছিলেন। বাবা বলতেন যে, দশম গুরু নারীর সমস্ত চরিত্র অনাবৃত ক'রে দেখিয়েছেন। একবার আমার ঠাকুমা জিগেস করেছিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমার মধ্যেও কি নারী চরিত্র দেখতে পাস?" বাবা বলেছিলেন, "তুমি আমার মা! সেই জন্য তোমার মধ্যে দু'চারটে কম বা দু'চারটে বেশী চরিত্র (বিশেষতা) হবে।" দসৌধাসিং পর্বতের বিশালতার দিকে দৃষ্টি রেখে আবার বলে, "শয়তান গলি আর বেশী দূর নয়। হে সাচ্চা পাদশাহ, আমাদের আড়াইখানা প্রাণের দায়িত্ব তোমার। আজ শয়তান গলির নাটকের মাঝখান দিয়ে আমাদের নিরাপদে বের ক'রে নিয়ে যাও। বরফের সঙ্গে পিরীত কিসের। 'ওয় বল্লে বল্লে' (মরে যাইরে)! আমাদের পিরীত তো আগুনের সঙ্গে—সে যে পঞ্চভূতে তৈরী পুতুলের জন্ম দিয়েছে আবার তাকে খেয়েও ফেলতে পারে।"

সড়কের পাশে এক জায়গায় দসৌধাসিং গাড়ী থামায়। পিছনের গাড়ীগুলো এগিয়ে যায়।

"কেন, থামলেন কেন সর্দারজী"? গুলহিমা বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করে।

দসৌধাসিং গাড়ী থেকে নেমে বলে, "ওরে জানী চোরের কছহরা! বাইরে বেরিয়ে দেখ। হ'ওয়ার নাড়ী কি বলে?"

জানী চোর বাইরে বেরোবার সময় তার পাগড়ি জানালায় আটকে যাওয়ায় রাস্তায় গিয়ে পড়ে। সে নিজের চুলগুলো গুছিয়ে চূড়ো করে বেঁধে রঙ-বেরঙের পাগড়িটা মাথায় জড়িয়ে বলে, "হাওয়া কি বলবে ওস্তাদ? তোমার মনের এই ধন্দ করে ছাড়বে?"

গুলহিমা বলে, "মহেশজী আমাদের আগামী নাটকে দু-একটা

[1]গুরু গোবিন্দসিংহ।

[2]বিচিত্র নাটক গুরু গোবিন্দসিংহের প্রসিদ্ধ রচনা।

ডায়ালোগ জ্ঞানী চোরেরও থাকা চাই।" তারপর ডাইরেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলে, "আখতার সাহেব, আমাদের কোনো নাটকে যদি জ্ঞানী চোর সাবানের ফেনার মতো জেগে ওঠে আর খানিক নিজের জারিজুরি দেখিয়ে বসে পড়ে তাহলে তো কামাল হয়ে যাবে। খুব মজা হবে।"

"আমি তো সর্দারজীর জন্য একটা ভালো রোলের কথা ভাবছিলাম," আখতারের স্বর উচ্চাগ্রামে উঠতে থাকে তারপর গাড়ির ছাদের দিকে তাকাতে তাকাতে নিচু গলায় বলে, "তোমার কি মনে হয়, গুলহিমা ?" ডাইরেকটরী করতে করতে সুর বদলে বদলে কথা বলার অভ্যাস গিয়েছিল তার।

"কথাটা মহেশজীকে জিজ্ঞেস করুন। ডাইলোগের মালিক তিনিই।" গুলহিমার ঠোঁটে হাসি খেলে যায় যেন গানের ভাষায় নতুন উপমা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।

"আমি তো তোমারই সংলাপ ফিট করছিলাম গুলহিমা!" মহেশ গম্ভীর হয়ে বলে, "তোমার মা তোমাকে চিনার গাছের শুকনো পাতার গাদার মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল। যদি তুমি নিজের মুখে ষ্টেজের উপরে এ কথাটা বল তাহলে বড় মজা হয়।"

আখতার বলে, "সব কিছুই কি এমনি ক'রে পাওয়া যায় ? কেউ চিনারের শুকনো পাতার গাদায় আবার কেউ খড়ের কুঁড়েঘর থেকে। কণ্ব ঋষিও তো শকুন্তলাকে জঙ্গলের এক প্রান্তে পাতার গাদা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

দসৌধাসিং সামনে যাওয়ার বদলে পিছনে যাওয়ার বিষয়ে বলছিল।

জ্ঞানী চোর বলে, "এ সবই তোমার মিছে ভয় ওস্তাদ। রাস্তায় কোথাও বরফের চিহ্ন নেই। হাওয়াও বিগড়োয়নি। এতক্ষণে আমরা সুরঙ্গের রাস্তাটা পেরিয়ে যেতাম।"

"জ্ঞানী চোর ঠিকই বলছে সর্দারজী!" গুলহিমা সিটে বসে

বসেই কটাক্ষ ছোঁড়ে। "এবার চলা উচিত। আমাদের এ্যাডভান্স স্কোয়াড শ্রীনগরে আমাদের জন্যে বসে আছে হয়তো।"

"বীবীজী, তুমি জানো না," দসৌধাসিং দু'হাতে কান ছুঁয়ে বলে, "বাতাসে শব্দ। যেন কেউ জপজী পাঠ করছে। এই জায়গাতেই গত বছর আমার বন্ধু অজিত ড্রাইভার বরফ চাপা পড়ে মরেছে। তিন ভরি সোনার ঝুমকো তৈরী ক'রে এনেছিল। সেদিনই তার স্বর্ণের জন্মদিন। অজিত জপজী পাঠ করতে করতে মরেছিল। আপনারা কি অজিতের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেন না?"

"এই সমস্ত কথাই আমি আমার নাটকে লাগাতে পারি," মহেশ চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলে।

জানী চোর আর আখতার সর্দাজীর উপর জোর দিচ্ছে যে, গাড়ী চালানো উচিত।

"তালি দাও হে আড়াই পরাণ!" দসৌধাসিং নিজের জিদ ছেড়ে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চলে।

গুলহিমা তুড়ি মেরে বলে, "সর্দারজী পলকেই আপনি শয়তান গলি পার করে যাবেন।"

যখন গাড়ী 'শয়তান গলি'র মাঝামাঝি পৌছোয় গুলহিমা চেঁচিয়ে ওঠে, "সর্দারজী, গাড়ী থামান।"

গাড়ী থামতেই গুলহিমা বাইরে বেরিয়ে বলে, "কি সুন্দর পাহাড়ের চারদিক। পরের বার আমরা শেঠজীকে সঙ্গে নিয়ে আসবো।"

আখতার বলে, "একজন আর্টিষ্টও সঙ্গে থাকা উচিত যে, এই সিনারীকে পটের ওপর এঁকে রাখতে পারে।"

দেখতে দেখতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পেজা তুলোর মত তুষার গড়িয়ে আসে। দসৌধাসিং ভয় পেয়ে বলে উঠে, "আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেছে। হাওয়াও চাইছে শয়তানী করতে। আজ আর রক্ষে নেই সাচ্চা পাদশাহ। তোমার রূপ বড়ই মধুর। আজ

বোধহয় বরফের তলায় বিছানা পাতা হবে।" সে গাড়ী চালাবার বৃথা চেষ্টা করতে থাকে। জানী চোর হ্যাণ্ডেল মারছিল।

দসৌধাসিং গাড়ীকে গালাগালি দিতে শুরু করে, "শালী, আস্তাকুঁড়েতে যাওয়ার দিন তোর ঘনিয়ে এসেছে। তোর সর্দিকাশির দাওয়াই বের করার মুরোদ আমাদের নেই।"

জানী চোর বেলচা দিয়ে বরফ সরাবার চেষ্টা করছিল। দসৌধাসিং বলে, "এখন কি করা যায় বীবীজী? ওয়াহ গুরুর দিব্যি, ইঞ্জিনের কোনো পার্টস ভেঙে গেলে নিজের দাঁত উপড়ে আমি তাতে ফিট করে দিতাম। টায়ার ফেটে গেলে বিনা টায়ারেই গাড়ী সুরঙ্গের মুখে নিয়ে যেতাম।" তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "সাচ্চা পাদশাহ, আপনি তো বরফ ফেলে ইঞ্জিনই ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন।"

গুলহিমা বলে, "আমার চিরকালের ইচ্ছা যেন কোনো পাহাড়ের কোলে মরি। নিজের জন্য কয়েকটা মূহুর্ত যেন আমি পাই। আখতার, সেই শুভক্ষণ আজ এসে গেছে।"

দসৌধাসিং নিচে নেমে এসে জানীকে জড়িয়ে ধরে বলে, "জানী, তুইই আমার জান। ওরে ব্যাটা, ছাখ্‌ সামনেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

মহেশ দেখে দসৌধাসিং এর চোখে জল। সে বলে, দেখছ গুলহিমা? আমার কিন্তু মরণের সঙ্গে কোলাকুলি করতে একটুও দুঃখ হওয়া উচিত নয়। আমি আমার নাটকের নায়িকার সঙ্গে যাচ্ছি।"

"মহেশ! কখনো সখনো ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত তোমার।" আখতার উপদেশের ছলে নিজের ঈর্ষা লুকিয়ে বলে, "একটু ভেবে দেখ! আমাদের কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে।"

দসৌধাসিং বলছিল, "সাচ্চা পাদশাহ! আমার নাটকটা পুরো হতে দাও। তারপর চাও তো যবনিকা ফেলে দিও।"

মহেশ বলে, "সর্দারজী আপনি আমাদের ড্রামার হিরো।"

দসৌধাসিং বিরস মুখে বলে, "দাড়িঅলা হিরো কখনো হয়েছে কি? বুঝলে দোস্ত, মনের আশা মনেই রয়ে গেল।" আবার সে বিব্রত হয়ে বলে, "এ কি? এখানেও অজিতের জপজী পাঠের সুর ভেসে আসছে।"

সর্দারজীর কথা না শোনার ভান করে মহেশ বলে, "গুলহিমা! গাড়ীর চাকা থেমে গেছে বলেই কি তোমার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যাবে?"

আখতার বলে, "আমরা মরার পর এখান দিয়ে যারা যাবে তারা আমাদের ডায়ালোগ শুনতে পাবে। কাজেই একটু সামলে ডায়ালোগ চালিও।"

"বাঁচাই যদি অদৃষ্টে থাকে তবে কে মরতে চাইবে?" মহেশ বলে, "কি বলো গুলহিমা?"

দসৌধাসিং বলছিল, "ওরে জানী, একটু জপজী পড়ে নে। পরকালটা শুধরে নে।" তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, ওহ ওয়াহ গুরু, বান্দা অপরাধী! তোমার জপজী পাঠ করা আমার কর্ম নয়।"

জানী চোর এখনো বেলচা তুলে বরফের সঙ্গে লড়ছিল। সে উঁচু গলায় বলে, "আমারও একটা কথা শুনে নাও ওস্তাদ। আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরফের নিচে চাপা পড়ে মরা ঢের ভালো।"

মহেশের দিকে তাকিয়ে গুলহিমা বলে, "এই ডায়ালোগটাও নোট ক'রে নিও।"

"নাটক একেই বলে।" আখতার নিজের জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বলে, "খাটে শুয়ে গোড়ালি ঘসে ঘসে মরার চাইতে এ মৃত্যু অনেক ভালো। কি বল গুলহিমা, তোমার নাম যদি নোশলব হত তাহলে কেমন হত?"

দসৌধাসিং বলছিল, "অজিত, জপজী পাঠ বন্ধ করো। গুলহিমার কথা আমাদের শুনতে দাও।"

আখতার বলে, "আমার বউ ছেলেমেয়ের কি হবে? শয়তান গলি। এই ঝড়ের সন্ধ্যা আর এই গুলহিমা যার নাম নোশলব হওয়া উচিত ছিল।"

"আপনারা ভাবছেন যে আমরা রিহার্সাল করার জন্য এক জায়গায় বসে আছি, কখন আমাকে পরিচালকের ইশারায় নাচতে হবে।" গুলহিমার অট্টহাসি উপহাসের সীমা ছুঁতে থাকে।

মহেশও চুপ করে থাকতে পারেনা, "গুলহিমা! আমার না আছে বউ, না ছেলেমেয়ে। আমি মরার পরেও বলবো যে, আমি শেক্স্পিয়ারের মত কোনো হ্যামলেট লিখতে পারিনি।"

গুলহিমা বলে, "সর্দারজী হিরো, সত্যিকার বড় হিরো, যার সঙ্গে জীবন করেছে পরিহাস। যার হিরো হওয়া উচিত সে হয়েছে বি ক্লাস বাসের ড্রাইভার। আর যে আসলে ড্রাইভারও নয়, ক্লীনার হলে মানাত সে হিরো হয়ে বসেছে। এ পৃথিবীটা এক অদ্ভুত জায়গা।"

বাতাসের সঙ্গে কে জানে কোত্থেকে এত কুয়াসা এসে জমছিল। রাস্তা দেখা যায়না। তারপর ধীরে ধীরে তুষার পড়তে শুরু করে। এখন এ ছাড়া আর গতি নেই বলে আড়াইটা প্রাণীর মতো দসৌধাসিং ও জানী চোরও এসে বাসের ভিতরে কুঁকড়ে বসে থাকে।

আখতার এমন চুপ মেরে যায় যে গুলহিমা বার বার ডাকলেও সাড়া দেয়না। বসে বসে সিগারেট টানে।

মহেশ গুলহিমার আরো কাছ ঘেঁসে বসে বলে, "জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে আর কয়েক হাতের তফাৎ রয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। গুলাবো গুজরীর কথা কেন মনে পড়ছে? সে মেলার হালোয়াইকে দুধ দিতে আসতো। আর আমি ডায়ালোগ খুঁজতে একপোয়া দুধ নেবার অছিলায় মেলার সেই দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তখন থেকে আজকের ব্যবধান দশ বছর। কিন্তু একি ব্যাপার গুলহিমা, তোমার হাসিতে গুলাবোর নিঃশ্বাসের সৌরভ যেন মিশে রয়েছে। গুলাবো যেখানে দাঁড়াতো সেখানেই মেলার ভীড়

জমে উঠত। আমার মনে আছে গুলহিমা, তুমি একবার বলেছিলে মহেশ, আমি আগুন। আমার কাছে যে আসবে—পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আজ আমি ওই আগুনে ছাই হয়ে যেতে চাই।"

গুলহিমা হেসে বলে, "নাম আমার গুলহিমা, মানে বরফের ফুল। কিন্তু এটাও ঠিক যে এক বুক আগুন আমি লুকিয়ে রেখেছি।"

মহেশ জিজ্ঞেস করে, "এটা কি সত্যি যে বরফের মোকাবিলা আগুনই করতে পারে?"

বাইরে চলেছে তুষারপাত...

দসৌধাসিং ও জানী চোর যেন অনড় অবশ। আখতারও তার সিগারেট নিবেয়ে দিয়েছে।

মহেশ বলে, "গুলহিমা, আমার সঙ্গে তুমি 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' ছবি দেখতে দেখতে বলেছিলে, পিয়েরের চেহারার সঙ্গে তোমার ভীষণ মিল মহেশ! ইস্ যদি তুমি পিয়েরের মতো লম্বা হতে, তোমার চোখে মোটা লেন্সের চশমা থাকতো...। এবার যদি এই ঝড়ে বেঁচে যাই তাহলে আমিও চোখে একটা চশমা নেব। রয়ে গেল লম্বা হওয়ার সমস্যা, সে আমি উঁচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের নাতাশার সঙ্গে কথা ব[illegible]খন।"

গুলহিমা হেসে ফেললো, যেন বাঁশীর সঙ্গীত সম থেকে পঞ্চমে উঠে যাচ্ছে।

বাইরে বরফ পড়ছে। দসৌধাসিং নিস্তব্ধতা ভেঙে কখনো কখনো অকাল-পুরুষকেও* ডাকে।

আখতার হার মেনে সিগারেট ধরায়। কয়েকটা লম্বা টান মেরে আবার নিবিয়ে দেয়।

দসৌধাসিং ঘোষণা করে, "নি[illegible]র নিজের দেবী দেবতা পীর মুরশিদের নাম জপ করে নাও দোস্ত। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আর বেশী দেরী নেই।"

---

*ঈশ্বর

গুলহিমা বলে, "আপনি তো আমাদের নায়ক।"

মহেশ গুলহিমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, "তোমার গলায় কমনীয়তার সঙ্গে যে ধার আছে তা আমি কোত্থেকে আনবো? কাল্‌চারাল ডেলিগেশনের সঙ্গে সাগর পারে যাওয়ার সময় তুমি নিজের প্রেমের চিহ্ন বলে জরির রুমাল দিয়ে যেওনা কিন্তু। আমি শ্রীনগরের লাল চকে দাঁড়িয়ে গোল্‌ড্‌ ফ্লেকের একটা প্যাকেটের বিনিময়ে সেটা বিক্রী করে ফেলতে পারি।"

গুলহিমা গম্ভীর হয়ে বলে, "শ্রীনগরের লাল চকে কে কার লাল রুমাল বিক্রী করে? একটা রুমালের আশায় হয়তো তুমি সারা জীবন ধরে ছটপট করছো।"

মহেশ গোল্ড ফ্লেকের ডিবে থেকে শেষ সিগারেটটা বের করে ধরায়, বলে, "আমাকে দেখতে যত ভালোমানুষ মনে হয় ততখানি ভালো হয়তো আমি নই গুলহিমা। জীবনে আমি তেরোবার প্রেমে পড়েছি। সাগরপারে হাসিঠাট্টা বিতরণ করার সময় আমাদেরও একটু মনে রেখো।"

দসৌধাসিং তার স্মৃতির গাড়ী পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, "তোমাদের মেলেশাহ কথা বলতে জানেনা। সাচ্চা পাদশাহ ওয়াহ গুরুজী নিশ্চয়ই গুজরীকে বরফের ফুল বানিয়েছিলেন। দেখুন মশাই, পিরীতের গলি আগুনেরই গলি। আমিও একজনকে ভালোবেসেছি এবং তাকেই মনে রেখে এই রাস্তাগুলোতে গাড়ী চালাই। আর এখন আমার ভালোবাসা কিক্কড়সিংহীর সঙ্গে হয়ে গেছে, সাচ্চা পাদশাহ। এ ব্যাপারটা আমাদের রপ্ত। কিক্কড়সিংহী হল আগুন, আর বরফেই আগুনের প্রয়োজন হয়।" তারপর যেন স্মৃতির আগুনে ইন্ধন জোগাতে জোগাতে সে বলে, "তাকেও পেয়েছিলাম এইপথে, ফুলের প্রাণ। তার নাম ছিল লালারুখ। যেন বটোতের ডাকবাংলোতে ইজিচেয়ারে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে।"

গুলহিমা বলে, "আমরা সবাই নাটকে নিজের নিজের পার্ট করছি।"

"আর আমরা একে অন্য পাত্রের সঙ্গে হাসতে পারি, কাঁদতে পারি।" মহেশ তাকে সমর্থন জানায়।

"সর্দারজী কিন্তু এক ড্রামার হিরোইনের সঙ্গে অন্য ড্রামার হিরোইনকে গুলিয়ে ফেলছেন," আখতার চুপ করে থাকতে পারেনা, "বাঃ সর্দারজী, কি কথাই না শোনালেন।"

দসৌধাসিং দেখে, পাহাড় থেকে যত বরফ গড়িয়ে আসার ছিল, গড়িয়ে এসেছে। তুষারপাতও বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ পাহাড়ের তলার দিক থেকে একটা আলো দেখা যায়। নিজের জমে যাওয়া হাতে ঝটকা মেরে গলার পুরো জোর দিয়ে বলে, "আগুন! আগুন! আমরা সবাই বেঁচে গেলাম ফুলপরাণী! অভিনন্দন জানাই— অভিনন্দন তোমাদের।"

সে বাইরে বেরিয়ে দেখে। বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে কুয়াশাও কম! বরফের উপর দাঁড়িয়ে সে গুনগুন করে গান করে—

কুড়িয়ে বঙ্গাল দীয়ে

নী দুখ তয়নু কেড়ি গল দা? (ওরে বাংলা দেশের মেয়ে, কিসের দুঃখ তোর।)

তারপরই সে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, বলে, "ওরে বুলবুলের লণ্ঠন, লেডি ও জেন্টলমেন। প্রাণে বেঁচে গেলাম রে, সুন্দরীরা।"

এখন আড়াইখানা প্রাণও গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। গুলহিমা হেসে বলে, "সর্দারজী! আপনার ডায়োলোগ শোনান।"

দসৌধাসিং খুশীতে ভরা আওয়াজে বলে, "নী কচ্চীয়ে কঁুয়ার গঁদলে! নী গুলে দী জান্।[১] নী বুলবুল দী লালটেন, আগুনের কাছে তো পৌঁছোই। তারপর এমন এমন কথা শোনাবো, এমন-এমন ঘুঙুর বাজাবো যে তোমাদের এই ডাইরেক্টর আর এই নাটকনবীশ দুজনেই যদি ভোঁদড় না বনে যায় তাহলে আমার নাম বদলে দিও, গুলে দী জান্।"

[১] ওগো কচি কলির বোঁটা! ওগো ফুলপরাণী

গুলহিমার হাসি আর থামতে চায়না।

আখতার সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। মহেশের কাঁধে থাবা মেরে বলে, "ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে যাব আমি।"

জানী বেলচা উঠিয়ে রাস্তা ছেড়ে তলার দিকে রাস্তা সাফ করতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ পাথরের উপর পা পড়ায় এমনভাবে পিছলে যায় যে দু'হাত নিচে বরফের মধ্যে গিয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে সামলে নেয়। আখতার ও মহেশ তিন চারটে ডিবে উঠিয়ে জানীর পিছনে চলতে শুরু করে। গুলহিমারই যত মুশকিল। আগুন যত নিকটেই হোক পথ অতি দুর্গম।

দসৌধাসিং কিক্করসিংহী ডিবেতে ভরে নেয় তারপর গুলহিমাকে বলে, "রুগির পথ্যি ফুলকো রুটি যারা খায় তারা তোমাকে কেমন করে ওঠাবে ফুলপরাণী? ওয়াহ গুরুর দিব্যি। তোমাকে বইবার কাজ শুধু তন্দুরী রুটি খেকোরাই করতে পারে। কিন্তু ফুলপরাণী, ভয় পাবে না তো?"

এখন গুলহিমা দসৌধাসিং-এর দুই বাহুর মধ্যে। সে বলতে বলতে চলে, "ফুলপরাণী, ফুলের মতই তোমাকে ওখানে গিয়ে নামিয়ে দেবো। ওরে বুলবুলের লালটেন, লেডি ও জেণ্টলমেন।"

দুজনের শরীরের আগুন না জানি কত বরফই গলিয়ে ফেলে।

আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকা বুড়ো গুজর নিজের নাম বললে রহিমু। তার কুকুর ছানাটা আগন্তুকদের ভৌ ভৌ করে অভ্যর্থনা জানালে।

দসৌধাসিং-এর মুখে বরফে গাড়ি ফেঁসে যাওয়ার গল্প শুনে রহিমু বলে, "বরফ থেকে বাঁচার জন্য যেন সবার বরাতে আগুন জোটে।" ডব্বু ও তারস্বরে নিজের প্রভুর উক্তির সমর্থন করতে থাকে।

দসৌধাসিং কিক্করসিংহীর ডিবে বের করে আর পকেট থেকে কাঁচের গেলাস। সে বলে, "ও রহিমু চাচা, এই আমার আগুন। আমি পাটিয়ালা পেগ টানবো।"

পেগ অফার করে সে বলে, "প্রথমে তুমিই আমার আগুনের ভোগ গ্রহণ কর, হে ফুলপরাণী।"

ইঙ্গিত বুঝে রহিমু চাচা চারটে বাটি ও জলের ঘটি নিয়ে আসে।

প্রথম পেগ গুলহিমার হাতে। তারপর সবাই নেয় নিজের নিজের পেগ। রহিমু চাচা মদ খেতে রাজী হল না।

দসৌধাসিং কিক্কড়সিংহীর চার চুমুক খেয়ে বলে, "ও চাচা! শাদা দাড়িওয়ালা পীর শাদা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের মুশকিল আসান করতে কেন এলো না? পীরের বুঝি আজকাল ঘোড়ায় চড়ার সামর্থ নেই?"

রহিমু চাচা বলে, "ওহে সর্দার, বসন্ত এলে যখন বরফ গলতে শুরু করে, তখন পীর তার শাদা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের নিজের মুখ দেখাতে আসে। তখনই পীরের রাস্তা খোলে। কিন্তু এখন তো পীরের সুড়ঙ্গ তৈরী হয়ে গেছে। আর পীরের পথ বারো মাস চালু থাকে।"

দসৌধাসিং তার বাটি থেকে দুই চুমুক খেয়ে বলে, "ওরে চাচা, পীরের মর্জী না হলে সুড়ঙ্গও তৈরী হতে পারতো না। ওয়াহ গুরুর দিব্যি। মুসাফিরদের গাড়ীতে বসে থাকতে দেখে সেও আরাম-প্রিয় হয়ে গেছে। ঘোড়ায় চড়া ছেড়ে দিয়েছে।"

জানী মাথা দুলিয়ে বলে, পীরের দাড়ি বরফের মত শাদা হয়ে গেছে। জওয়ানীর শক্তি আর নেই।"

আখতার বলে, "পীর বসে পড়েছে, বলছে,—আমার উপর দিয়ে তোমরা আসা যাওয়া করো, আমার বুকে ছেঁদা করে বেরিয়ে যাও। তবেই না রাস্তা পাওয়া গেছে।"

মহেশও চুপ করে থাকতে পারে না।

"আগে লোকেরা ভাবতো, পীরের বুকে ছেঁদা করলে এত জল বেরোবে যে, সমস্ত উপত্যকা ডুবে যাবে এবং ঝিল হয়ে যাবে, যেমন প্রাচীন যুগে ছিল। কিন্তু এ ধরণের কোনো বিপদ তো হয়নি।"

গুলহিমা স্মিতহাস্যে বলে, "আমি বলি কি তোমরা এ সব কথা বন্ধ করো। শীত বলছে আজই পড়বো আর খিদে বলছে আজই লাগবো।"

কিক্কড়সিংহীর সাথে ওরা ডিবেতে ভরা সব খাবার নিঃশেষ করে।

দসৌধাসিং নেশায় টলতে টলতে বলে, "জানী, এবার তুই ড্রাইভার হয়ে গেলি।"

রহিমু চাচা অগ্নিকুণ্ডে কাঠ দিচ্ছিল। দসৌধাসিং পাগড়ি খুলে গলায় ফেলে, চুলগুলো গুছিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলে, "আমার দাড়ি এখন কাঁচা—পাকা ফুলপরাণী। কিন্তু ওগো মেয়ে আমার মাথার চুলে পীরের তুষার। ওগো পরাণের ফুলমণি! এবার পীরের বরফ আরো বেশী পড়বে। ওয়াহ গুরুর দিব্যি। এখনো আমাদের মাংস পেশীতে জান্ আছে", এই বলে সে তার বাটির শেষ দু'তিন চুমুক কুকুরছানাটার মুখে ঢেলে দেয়। কুকুরটা চ্যাঁ চ্যাঁ করে দসৌধাসিংকে ধন্যবাদ জানায়।

গুলহিমা হেসে বলে, "এখনও আমাদের অনেক নাটকে অভিনয় করতে হবে।" সে নিজের পেগ শেষ করে ফেলে।

দসৌধাসিং তার গেলাসে কিক্কড়সিংহী ঢেলে দেয়—চুমুক লাগিয়ে বলে, "এখনো আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।"

"মেয়ে! মেয়ে! না, আমাদের গলার প্রাণ।" দসৌধাসিং বলে, "তুমিও মায়া। অনন্ত। অকাল পুরুষের মায়া দেখব, না তোমার? ওয়াহ গুরুর দিব্যি। ফুলপরাণী। নাটকনবীশদের দিয়ে নিজের কথাই শুধু লেখাবে না আমার কথাও থাকবে তাতে সুন্দরী?"

শুনে সকলে হেসে ওঠে।

মনে হয় সকলের সব কথাই যেন ফুরিয়ে গেছে। শাঁ শাঁ করে ঘুম নেমে আসছে।

কুকুরছানাটা লেজ দোলাতে দোলাতে দসৌধাসিং-এর শরীরে নিজের গা ঘসতে থাকে।

সবাই ঢুলতে থাকে। সবচেয়ে আগে রহিমু চাচার নাক ডাকতে শুরু করে। যেন সে নিজেই পীর পাঞ্চাল।*

দসৌধাসিং-এর ঘুম পায় নি। কুকুরছানাটা তার পিঠে নিজের পিঠ ঘসছে। কিঙ্কড়সিংহীর শেষ পেগ মুখে ঢেলে দসৌধাসিং বলে, "নেরে ব্যাটা! আজ আরামে ঘুমোস। যদি আজ স্বপ্নে পীর পাঞ্চালের দেখা পাস, বলিস—ওরে পীর ফকির, তোর রাজ্যে দসৌধাসিং-এর কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়।"

কুকুরছানাটা কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে দসৌধাসিং এর দিকে তাকায়, তারপর সেও ঘুমিয়ে পড়ে।

দসৌধাসিং গুনগুন করে গেয়ে ওঠে—

তেরে সামনে বইঠ কে রোনা
তে দুখ তয়নুঁ নইয়োঁ দসনা

(তোমার সামনে বসে কাঁদবো কিন্তু মনের দুঃখ তোমাকে জানাবো না।)

দসৌধাসিং-এর নজর বারে বারে গুলাহিমার উপর গিয়ে পড়ে, ওর মুখখানা নিবন্ত আগুনের আভায় আরো সুন্দর লাগে। যেন আগুন বরফে ডুব দিচ্ছে আর বরফ আগুনে নামছে। তার ইচ্ছে করে ওকে জাগিয়ে ওর কাহিনী শোনে। কিন্তু সে এই ভেবে থেমে যায়—এ পথে না জানি কতবার লালারুখ কতরূপে দেখা দেবে।

যখনই তার চোখ গুলহিমার উপর পড়ে সে আপনা আপনিই কুকুরছানার পিঠে হাত বুলোয়। তার ঘুম আসছিল না।

গুলহিমা পাশ ফিরে শুতে গিয়ে আধখোলা চোখে দসৌধাসিংকে দেখে। সে তখন একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

*কাশ্মীরে হিমালয়ের পর্বতমালা।

আগাছা

মাত্র তিন-চার মাস হল পাকিস্তান হয়েছে। এখানে সব কিছুই যেন বিপর্যস্ত। থানা ও ফাঁড়িগুলোতে মাল-পত্তরের ডাঁই জমেছে। ট্রাংক, পালংক, দোলনা, টেবিল, সোফা-সেট, ছবি সব কিছু নিজের জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে থানায় এসে পৌঁছেছে। ভেবে দেখুন, দোলনা ও ছবির সঙ্গে থানার কি সম্পর্ক? এক সময়ে কোনো বাড়িতে এই সব জিনিসগুলোর জন্য একটা বিশেষ জায়গা ঠিক করা ছিল। তখন সে বাড়ির লোকেরা হয়তো ভাবতো যে, এ জিনিসগুলো নির্ধারিত জায়গা থেকে অন্যত্র সরালেই খারাপ লাগবে। অথচ এখন জিনিসগুলো এখানে ডাঁই করা। বাড়ির বাসনকোসনগুলো আলমারি, রান্নাঘর ও ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে সরকারী অফিসের সামনে গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। কেউই এদের মেজে-ঘসে গুনে রাখেনি। অন্তত মাস কয়েক থেকে কোনো মেয়ে পুরুষ এদের ছোঁয়নি।

পাকিস্তানে সব কিছুই এখনো উৎক্ষিপ্ত। অনেক বাড়িতে নিজের খুঁটির দড়ি ছিঁড়ে আসা গরু-মোষও আছে। বিহ্বল উদাস চোখে তারা চারদিক দেখে ও অচেনা জায়গায় ভয়ে ভয়ে পা রাখে। উলটে-পালটে শুধু মাটিই পাকাপাকি স্বস্থানে রয়েছে আর এই মাটির উপরই অসংখ্য উদ্বাস্তুদের হামাগুড়ি। ওয়াগার বড় ক্যাম্প থেকে এদের ঠেলে দেওয়া হয আর উদ্বাস্তুরা হেঁটে বা গরুর গাড়ীতে জমির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়।

উদ্বাস্তুরা তো আছেই, পুরোনো বাসিন্দারা অবধি উৎখাত হয়। মানুষজনের অনেকের জাতভাইরা চলে গেছে, বন্ধুদের ছেড়ে বন্ধুরা। শ্রমিকদের মিলমালিক চলে গেছে আর মিলমালিকদের শ্রমিকেরা। যারা চলে গেছে তাদের জায়গায় নতুন লোকজন এসে গিয়েছিল। এই নতুন লোকগুলা কি ধরণের? নোংরা আর ক্ষ্যাপাটে। পুরোনো মানুষজনের সঙ্গে মিশ খায় না। এরা সালাম আলেকুম

বলে পাশে বসে কথা বলা দূরে থাক দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি মারে। ডাকলেও কথা বলতে চায়না। এই লোকগুলোই গাঁয়ের শিকড় নড়িয়ে দিয়েছে। পুরোনো বাসিন্দাদের কাছে নিজেদেরই গ্রাম অচেনা লাগে কেননা এখন তাদের গাঁ আর সেই গাঁ নেই, যেখানে তারা জন্মেছে, বড় হয়েছে। তাদের ভিটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নহর বা খালও তাদের কাছে পর হয়ে গেছে। সেই জলে তারা ওজু করতে পারে না। কয়েক দিন ধরে এই নহরগুলোতে লাল জল বয়ে এসেছে। কয়েকটা মড়া এমন কি মড়ার কাটা হাত-পাও ভেসে এসেছে। এই জলে কী ওজু করা যায়? নিজেদের বাচ্চাদেরও তারা এই খালে নাইতে বারণ করে। আসলে সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেছে, আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে। নিজের জায়গায় শিকড় গেড়ে থিতু হতে চেষ্টা করছে। সব কিছুই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

"দেশটা উচ্ছন্নে গেছে", এক জোয়ান জাঠ চারিদিকের ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে তার বুড়ো বাপকে বলে।

"ধ্বংস তো হয়েছেই, কিন্তু ছাখ, আলাদা আলাদা জায়গায় আবার লোকজন জমে বসেছে, সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।"

"এ সব শুধু ফাঁকা কথা। এ বেচারারা কোথাও থিতু হতে পারবে? রুটির গরাস ছিঁড়ে মুখে পোরার মুরোদও এদের নেই।"

"ওরে নারে, পাগলা না, উপর থেকে দেখলে এই রকমই মনে হয়। দেখেছিস নিশ্চয়ই, ক্ষেতে আগাছা হয়। লাঙ্গল চালাবার সময় কেউ কি একটুও পরোয়া করে? শিকড় সমেত উপড়ে ক্ষেত থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু দিন দশেক পরেই দেখবি কোনো না কোনো জায়গায় আবার তারা গজিয়েছে। মাসখানেক পরেই মনে হবে যেন সে ক্ষেতে কখনো কেউ লাঙ্গল চালায়নি।"

বাস্তবিকই এই বুড়োর কথায় কোথায় যেন একটা সত্য উঁকি

মারে। যারা জমি পাচ্ছিল তারা সেখানেই খুঁটি জমিয়েছে। কাঁচা এ্যালটমেন্টের ক্ষেত তাদের সান্ত্বনা জোগায়। তারা নতুন ক্ষেতের বেড়ার কাছে ছোট-ছোট গর্তে ঘুঁটের আগুন জ্বেলে রাখে ও যখন খুশী হুঁকো ভরে একসঙ্গে টানতে বসে যায়। আস্তে আস্তে ওদের মোষগুলোরও ভয় ভেঙ্গে এসেছে। গাছের ডালে তারা মাথা চুলকোয় আর কখনো-সখনো মনের আনন্দে বেড়ার দেয়ালে গা ঘসে। এদের নতুন গাঁয়ে কোনো তশীলদার বা অফিসার গেলেই এদের মধ্যে কয়েকজন লোক এগিয়ে যায় নিজেদের পঞ্চায়েত প্রধান বলে জাহির করতে। তারা সমস্ত গ্রামের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের ফিরিস্তি তশীলদারকে শোনায় আর এমনি ক'রে সমস্ত লোকের মোড়লি করে, নিজেদের নেতৃত্বের ক্ষমতা দেখায়। হরেক রকমের মামুলি কথা নিয়ে আসা লোকেদের পিছনে বসিয়ে দেয়। শুধু একজন লোকই কথা বলবে বলে অফিসারকে হুঁকো জলের কথা জিজ্ঞেস ক'রে তার নজর নিজের দিকে ফেরায়। এই সব ব্যাপার দেখে বোঝা যায় যে, এ রকম একটা ধাক্কাও ওদের একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারেনি।

এই ধরণের উচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অথচ পুনর্বাসিত পাকিস্তানে আমি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সম্পর্ক-অধিকারী নিযুক্ত হয়েছিলাম। আমার কাজ ছিল জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া আর মুসলমান বানানো পরিবারকে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেওয়া। হিন্দুস্তানী সেনার একটি দল ও পাকিস্তান স্পেশাল পুলিশের কিছু সেপাই আমাদের সাহায্য করছিল।

অন্য লুকোনো জিনিসের মতো মেয়েদের খোঁজার কাজ মুশকিলও বটে আবার সহজও। কখনো কখনো মেয়েগুলোকে অল্প চেষ্টাতেই খুঁজে পাওয়া যেত আবার কখনো কখনো অনেক খোঁজ-তালাশ করার পরেও মেয়েটিকে পাওয়া যেতনা। পাকিস্তানী পুলিশ অবশ্য মেয়েদের উদ্ধার কার্যে একটু আদটু সাহায্য করতো কিন্তু নিজের থেকে কখনো ওদের বিষয়ে কোনো খোঁজখবর দিতনা।

তবুও যখন ওরা নিজে থেকেই আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে রওনা হত, কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যেত।

এবার এই অঞ্চলের দারোগা শুধু যে আমার সঙ্গে রওনাই হল তা নয়, সে নিজেই আমাকে অপহৃত মেয়েটির ঠিকানা জানাল। সে এও জানালে যে, মেয়েটি তারই থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের নম্বরদারের পুত্রবধূ ছিল। আমরা যে গাঁয়ে যাচ্ছিলাম পাকা সড়ক থেকে সেটি অনেক দূরে। অনেকক্ষণ ধরে কাঁচা মেঠো পথ ও পাগদণ্ডিতে আমাদের নাজেহাল হতে হল।

যখন গাঁয়ে পৌছোলাম গাঁয়ের মুরুব্বীরা দারোগাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ভিড় করে এলো। বিপর্যস্ত সেই দিনগুলোয় পাকিস্তানে গভর্ণমেণ্টের খুব দাপট। দারোগা সেই মেয়েটির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতেই তারা চটপট একটা কুঠরি দেখিয়ে দিল। এই ছোট্ট কুঠরিটা একটা বড় হাতার এক কোনায়। দারোগা ও অন্যান্য সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—আমি সোজা ভিতরে ঢুকলাম। একটি মাটির তৈরী ঘর। ভিতরে তিনটে চারপাই বিছানোর মতন জায়গা। একদিকে কাঠের একটা তাকে থালা বাটি গেলাস। ঘরের কোনে বিছানা ও আরো কয়েকটা জিনিসপত্র।

মেয়েটি চারপাইতে শুয়ে ছিল। কয়েকদিন থেকে তার জ্বর। এক হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বোধ হয় কোনো ফোঁড়া। সে সময় মেয়েটা নিস্তেজভাবে বিছানায় পড়েছিল, কথা বলছিল, খুব ধীরে ধীরে। আমি তার পাশের চারপাইতে বসলাম।

"কি খবর ?" আমি তার অবস্থাটা বোঝবার জন্য সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি।

"চার-পাঁচদিন থেকে জ্বর।"

"তোমার দেখাশোনা করার জন্য কোনো মেয়েছেলে নেই এখানে ?

"না, আশে-পাশে কোনো মেয়ে নেই।"

এর আগে আমি যেসব ধরে-নিয়ে-আসা মেয়েকে দেখেছি এই

মেয়েটার পরিস্থিতি তাদের থেকে আলাদা। সেইসব মেয়েদের কাছেপিঠেই পুরুষ ও মেয়েরা সতর্ক হয়ে থাকতো। কারুর না কারুর চোখের তলায় বা পাহারায় মেয়েটিকে থাকতে হত এবং সেই অবস্থাতেই আমাকে দেখানো হত। এর বেলায় যা দেখছি, এই কুঠরিতে একাই থাকে মেয়েটা, লোকেরা তাকে এই অবস্থাতেই ফেলে রেখেছে। বরঞ্চ এমনও মনে হচ্ছিল যে লোকেরা তাকে সাহায্যও করেছে। মেয়েটার গাঁ আর বাড়ির লোকেদের কেমন ক'রে শেষ করে ফেলা হয়েছে তা আমি আগেই শুনেছিলাম। দ্বিতীয়বার ওর মুখ থেকে এসব শুনে কোনো লাভ নেই। ওর এখনকার অবস্থা কেমন সেটা জানতেই আসা।

"এখানে তুমি কদ্দিন থেকে আছ ?

"যেদিন গাঁ ধ্বংস হয়েছে সেদিন থেকেই এখানে আছি।"

"এই বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় তোমাকে কে দিয়েছে ?"

"আপনি তো ভীষণ বোকা।"

বুঝতে পারলুম। মেয়েটা একা থাকেনা, এখানকার জিনিস-গুলোও তার নিজের নয়। এই কুঠরি, জিনিসপত্র ও এই মেয়েটির শরীরের মালিককে কেবল সমুখে দেখা যাচ্ছিল না।

এখানে কত সহজেই কথাটা লিখে ফেলছি কিন্তু সে সময় ব্যাপারটা জেনে, মনে আছে রীতিমতো চোট লেগেছিল মনে। পুলিশ ও সাধারণ লোকদের সাহায্যের জন্যে পৃথিবী আর মানুষ সম্পর্কে সারা দিনমান আমার মনে যে ভালো ধারণাগুলি জন্মেছিল তারা আমার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। এ সময় তিক্ত বাস্তবের ঠিক মুখোমুখি আমি। একটা মাটির কুঠরিতে একজনের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া স্ত্রী আমার সামনে চারপাইতে নিস্তেজ শুয়ে। আমার চোখে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের সবচেয়ে রূঢ় চিত্র।

দলিতা নিগৃহীতা মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে এখানে। তার জাত ধর্ম বা গাঁয়ের কেউ সেখানে নেই। কখনো কেউ জানায় নি

যে, সে আবার ছেড়ে-আসা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারে। যদি কেউ তাকে একথা বলত তাহলেও মেয়েটি বিশ্বাস করতে রাজী হতনা। এত ক্ষমতামত্ত এই প্রকাণ্ড পাকিস্তান থেকে ওকে কেমন ক'রে বের করে নিয়ে যেতে পারে মানুষে। এ বিষয়ে ভাবারও যেন কোনো মানে হয় না।

সে সময় ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই ওঠেনা। পৌষ মাঘের শীতে অসুস্থ অবস্থায় মেয়েটিকে নড়াচড়া করানোও মুশকিল। আর কেউ অবশ্য এখান থেকে ওকে গায়েব করতে পারবেনা। কেননা আমরা এসে পড়েছি আর তারাও জেনে গিয়েছে যে, আমরা মেয়েটিকে দেখে নিয়েছি।

"বেশ শুনুন বউঠাকরুণ, আমি আবার অন্য কোনো দিন আসবো।" আবার আসার অর্থ আমি ওকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু এ সম্ভাবনা বোধ হয় ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

"তুমি এখন যাচ্ছ তাহলে?"

"হ্যাঁ।"

"একটু বসো। আমার একটা কথা শুনে যেও।"

আমি আবার তার পাশের খাটে বসে পড়ি।

"তোমার কাছে একটি জিনিস চাইবার আছে—যদি তুমি দিতে পারো। একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ?

"তুমি আমার শিখ ভাই। আমিও তো শিখ ছিলাম। এখন মুসলমানী হয়ে গেছি। বুঝতেই পারছ আজ আমার নিজের বলতে কেউ নেই। বড় দুঃখ, জানো? ধরবে আমার হাত? আমার একটি ছোট ননদ আছে। তাকে বাহারা চকের ড্যাকরা বদমাইশরা নিয়ে গেছে। সে দিনের হামলায় তাদের দলটাই ছিল সবচেয়ে বড়। তারাই আমার ননদকে নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এখন মাতব্বরী তোমার বেশ জমে উঠেছে। তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। সবাই তোমাকে খাতির করে। পুলিশের লোকেরাও দেখছি

তোমার কথা শোনে। আমার দিক থেকেও ওদের কাছে অনুরোধ করো। আমি তার বড় বৌদি। আমি তাকে নিজের হাতে বড় করেছি। আমি তার মার মতো। সে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে। আমি নিজেই দেখেশুনে ওর বিয়ে দেব। আমার অংশীদার জুটবে, হাতে-পায়ে জোর পাব। কাউকে নিজের বলে ডাকতে পারব।"

সেই বৃদ্ধ জাঠের কথা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, "ত্যাখ, ক্ষেতে এই যে আগাছা হয়, লাঙল চালাবার সময় তাকে রেয়াৎ করা হয় না। শিকড় থেকে উপড়ে সব ক্ষেতের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়—কিন্তু দশ দিন পরে অন্য কোনো জায়গায় শিকড় গজিয়ে উঠবেই সে।"

একটি দীর্ঘশ্বাস

লস্‌সী নিতে নিতে ঘটিটা অর্ধেকও ভরেনি দেখে করমো বলতে আরম্ভ করে, "আজ বড় সরদারণীকে দেখছিনা। শরীর-গতিক ভালো আছে তো?"

সরদারণী নিহাল কাউর খানিক আগে রান্নাঘরে এসেছিল। উনুনে পায়েসের হাঁড়ির তলায় গনগনে আঁচ দেখে কাঠগুলো বাইরে টানতে টানতে বলেছিল, "ওরে বীরো, মেয়ের কাণ্ড দেখ, এত আঁচে কি পায়েস তৈরী হয়? পায়েসের হাঁড়ির তলায় খুব ঢিমে আঁচ থাকা উচিত।" এই বলে সে উনুনের কাছে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে হাতা নাড়তে শুরু করেছিল। সকালবেলা দইয়ের মটকি নিয়ে নিজে হাতে মাখন তোলার কাজটা সেরে, ঘোল থেকে মাখন বের করে নেবার সময় বীরোকে বলে রেখেছিল, কুলী-কামিন যারা আসবে বীরো যেন তাদের লস্‌সী দিয়ে দেয়।

বোধহয় অন্য কুলি-কামিনরাও লস্‌সী নেবার সময় কথাটা জিজ্ঞেস ক'রে থাকবে কিন্তু নিহাল কাউর শোনেনি কেননা সে ভিতরের ঘরে ছিল। কিন্তু এখন রান্নাঘরে থাকায় দরজার বাইরে বসে-থাকা করমোর কথা শুনতে পেল।

"ভালই আছি করমো। তুই ভাল আছিস তো?" নিহাল কাউর ভিতর থেকে সাড়া দিল।

করমো তাড়াতাড়ি চৌকাঠের পাশে এসে ভিতরে উঁকি দেয় ও ডান হাতটা কপালে ছুঁইয়ে বলে, "সারা জীবন কুশলে থাক সরদারণী। আজ তোমাকে দেখতে পেলামনা তাই ভাবলাম আমাদের সরদারণীর শরীর-গতিক ভালো আছে তো?"

সমস্ত কুলি-কামিনরাই নিহাল কাউরকে উচ্চকণ্ঠে কুশল কামনা করে। ব্যাপার নতুন নয়—তবুও নিহাল কাউরের মনে হল যে, লস্‌সী নেবার সময় যখন ওর তার কথা মনে পড়েছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। নিহাল কাউর যেই করমোর দিকে তাকায় করমো

নিজের ঘটিটা কাৎ করে দেখায়। নিহাল কাউর ব্যাপারটা বুঝে বীরোকে লক্ষ্য ক'রে বলে—

"আমি বলি কি, করমোর ঘটিটা ভ'রে দিও—লস্‌সী খাওয়ার যুগ্যি অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা এর।"

"ভগবান ঢেলে দিক। তোমার হাতের কল্যাণে আমার বাচ্চারা দু'দুবার লস্‌সী খায়"—লস্‌সী নেবার সময় করমো বলে। লস্‌সী দিচ্ছিল অবশ্য বীরো কিন্তু করমো করছিল নিহাল কাউরের হাতের প্রশংসা।

করমো চলে যাওয়ার পর নিহাল কাউর তার আশীর্বচনগুলো ভুলে যায়। শুধু একটা শব্দ তার মনে গেঁথে থাকে, "বড় সরদারণী..."

একদিনেই নিহাল কাউর সরদারণী থেকে বড় সরদারণী হয়ে গিয়েছিল। জানিনা তাকে বড় সরদারণী বলে ডাকবার কথা সবচেয়ে আগে কার মনে হয়েছিল। বোধহয় সবারই মাথায় এক-সঙ্গে ঢুকেছিল। বাড়ির ঝি থেকে নিয়ে কারখানার যত মুন্‌শী, নায়েব ও কুলি-কামিনরা তাকে বড় সরদারণী বলে ডাকতে শুরু করেছে। এমন কি বাড়ির কর্তাও তাকে কাল বড় সরদারণী বলে ডেকেছিল। আপনা থেকেই নিহাল কাউরের হঠাৎ মনে পড়ল, পরশু সে নিজেই ঝিকে বলেছিল, "ছোট সরদারণীকে তার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আয়তো।" তাহলে, ছোট সরদারণী থাকলে আপনা থেকেই আরেক জন বড় সরদারণী হবে। নিহাল কাউর ভাবছিল। আর এই রকম কত কথাই তার মনে দুধের মধ্যে ছোট বড় চালের মত টগবগ করে ফুটতে লাগল।

এ কথাও মনে পড়ে, যবে থেকে বীরো এ বাড়িতে ছোট সরদারণী হয়ে এসেছে রোজ রাত্রে শোবার সময় নিয়ম ক'রে নিহাল কাউরের ঘরে এসে খাটের পায়ের দিকে বসে তার পা টিপতো। নিহাল কাউরের মেয়ে নেই যে, পালকীতে ক'রে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে, ছেলেও নেই যে বউ আনবে, কিন্তু যখন তার এই সতীন, যাকে সে নিজের হাতে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে, তার পা টেপে তার মনে হয়

যেন সে মেয়ের হাতের সুখ পেল, বেটার বউয়ের হাতেরও। নিহাল কাউর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে মনকে বুঝিয়ে বলতো যে বীরো তার মেয়েও বটে আবার ছেলের বউও।

সরদারের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য নিহাল কাউর নিজেই এই বীরো মেয়েটিকে খুঁজে বের করেছিল। অনেক ভালো ঘর থেকেও সম্বন্ধ এসেছে কিন্তু তা' সরদারের জন্য নয় তার বিরাট অট্টালিকার জন্য। সরদারের বয়স দেখে ভয়ে ভয়ে যারাই সম্বন্ধ নিয়ে আসতো তারা সকলেই পাকা কথার আগে চাইতো মেয়ের নামে বাড়িটা লিখিয়ে নিতে। সরদার তার বাড়ির ওয়ারিশের খোঁজেই ছিল, কিন্তু সে তো ভবিষ্যতে কবে মেয়েটির কোলে ছেলে আসবে—এই আশ্বাসেই বাড়িঘর তাকে সঁপে দিতে পারেনা।

সরদার রাজি হয়নি দ্বিতীয় বিয়ে করতে। কিন্তু এই রাজি না হওয়ার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল একটি দীর্ঘশ্বাস। নিহাল কাউর এই দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিলো তাই সে বড় গরীব ঘরের মেয়ে এই বীরোকে খুঁজে এনে সরদারের হাতে দিয়েছিলো—সেই দীর্ঘশ্বাসকে বুকের ভেতর লুকিয়ে তুলে রেখেছিলো।

একদিন সরদার দেওয়ালে গাঁথা লোহার আলমারি খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবতে থাকে। "বড় সরদারণী কোথায় গেছে?" অধীর হয়ে সরদার বীরোকে জিজ্ঞেস করে। বড় সরদারণী বাড়ীতে নেই। সরদার আলমারি বন্ধ ক'রে পকেটে চাবি রাখে। কারখানা যাওয়ার আগে বীরোকে বলে যায় যে, নিহাল কাউর যে সময় বাড়ি ফিরে আসবে তখনি নিচে মুন্‌শীকে ডেকে যেন কারখানায় খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিহাল কাউর যখন ফিরে এলো তখন বীরো বাইরে নর্দমার কাছে বিচলিত ভাবে বসে আছে। একটু আগেই সে একবার বমি করেছে।

নিহাল কাউর বীরোর হাত ধরে কাঁধে একটু চাপ দেয় তারপর তাকে খাটের উপর শুইয়ে রাখে। কিন্তু বীরো উঠে আসে, তার পা কাঁপছে, নুয়ে পড়ে সে নিহাল কাউরের পা জড়িয়ে ধরে।

"সরদারণী! মনে আছে? একদিন বলেছিলি আমিই তোর সবকিছু, তোর মেয়ে বা বেটার বউ ভেবেই আজ আমাকে বাঁচা।" বীরো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে সে নিহাল কাউরকে জানায়, কিছুদিন আগে ওর ভাই যখন দেখা করতে এসেছিল তখন ভায়ের টাকার ভীষণ দরকার ছিল। বীরো তাকে কিছু টাকা দেয় কিন্তু টাকা কম পড়ায় সরদারের পকেট থেকে আলমারির চাবি চুরি করে ও লোহার আলমারি খুলে কিছু রূপোর বাসন নিজের ভাইকে দিয়ে ফেলেছে।

"এ তো তোর নিজেরই বাড়ি, বীরো! তুই যদি নিজের হাতেই নিজের বাড়ির সর্বনাশ করিস..." নিহাল কাউকের কথা শেষ হওয়ার আগেই বীরো গনগনে গলায় উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে, "এ বাড়িকে কখনো নিজের মনে হয়নি আমার না কখনো হবে— যা হোক আমি তোর কাছে দিব্যি করছি সরদারণী, এরপরে এ বাড়ির কুটোটাও কাউকে দেব না। আমি ভুল করেছি। হঠাৎ-ই ভুল ক'রে বসলাম, পরে দুঃখ পেলাম। জানিস তো, আমার বিয়ের সময় বাবা আমার ভাইয়ের ব্যবসার জন্য তোর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা চেয়েছিল। দু'হাজার টাকা তোমরা দিয়ে দিলে। বাবা আমার বিয়ে দিলেন। আমাকে বিক্রী করার বাকী কি রইল? দু'হাজার টাকার বদলে আমাকে এই বুড়ো সরদারের হাতে সঁপে দেওয়া হল। বাপ ভাই-ই আপন হল না...কেন আমি তাদের ঘর ভরাবো কারুর ঘর খালি করে?..."

"বীরো...." নিহাল কাউর ভয় পেয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো।

বীরোর মুখ রক্ষা করলো নিহাল কাউর। সরদারকে বলে দিলো, আলমারিতে রাখা রূপোর বাসনগুলো পুরোনো ফ্যাশনের তাই স্যাকরা ডাকিয়ে আরো কিছু রূপো দিয়ে নতুন বাসন গড়াতে দিয়েছে।

সরদারের দুর্ভাবনা গেল। কিন্তু নিহাল কাউর যখনই বীরোর মুখের দিকে তাকায় তার মনে ভাবনাগুলো জট পাকাতে থাকে।

বীরোর চোখ দু'টো ভ্রমরের মত কালো। রং একটু শ্যামলা কিন্তু শ্যামলা রঙে ঠাসা ময়দার মতো আঁট-সাঁট যৌবন। বাহু দু'টি রুটি বেলবার বেলুনের মত গোল অথচ রোগা, চিমটি কাটার মতও মাংস নেই তাতে। নিহাল কাউরের মনে হয়, যে দীর্ঘশ্বাস সে সরদারের কাছ থেকে নিজে নিয়ে নিয়েছিল, সেই দীর্ঘশ্বাসই বীরো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজে রেখে দিয়েছে।

বীরো পোয়াতী। বাড়ি খুবই বড়ো কিন্তু এত বেশী অভিনন্দন আসছে যে বাড়ির বাইরে উপচে পড়ছে। সরদারের পা যেন মাটিতে পড়তেই চায় না। নিহাল কাউর বীরোকেও মাটিতে নামতে দেয় না। কিন্তু সরদার ও বীরোর চেয়ে সকলে নিহাল কাউরকেই অভিনন্দন জানাচ্ছিল বেশী।

"জন্মালেই আমি বাচ্চাকে আমার ঝুলিতে নিয়ে নেব। পরে কিছু বলিস না কিন্তু। আমি বড় সরদারণী। তুই ছোট সরদারণী। কাজেই প্রথম ছেলে বড়র হবে। পরে যা বিয়োবি সেগুলো তোর ..." নিহাল কাউর হাসতে হাসতে বলে। নিহাল কাউর নিজেও বুঝতে পারে না যে, তার মনে কোথাও কোনো লুকোনো নালিশ নেই কেন। সে নিজের হাতে তার স্বামীকে অন্য এক মেয়ের হাতে সঁপে দিয়েছে আর এখন সে নিজের সমস্ত ধন-সম্পত্তিও সতীনের ছেলেকে দিতে উদ্যত।

"তোর কাছে হার মানছি। জানিনা কোন লগ্নে তোকে আমার মেয়ে কি বেটার বউ বলেছিলাম। সত্যিই আমি মা আর শাশুড়ির মত সুখী। কখনো আমার মনেই থাকেনা যে তুই আমার..." নিহাল কাউরের কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বীরো হাসতে হাসতে বলে ওঠে, "সরদারনী, তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যাই হোক্ না কেন এ আমি ভালো করেই জানি যে আমি তোর সতীন নই।"

ছুতোর ডেকে নিহাল কাউর যে দোলনা তৈরী করায় তাতে রূপোর ঘণ্টা বাঁধা হয়, খাঁটি রেশমের লেপও থাকে দোলনায়।

শহরের এক ইংরেজ অফিসার মাসখানেক ছুটি নিয়ে বিলেত যাচ্ছিল। নিহাল কাউর বলে, "বিলিতি সোয়েটার রেশমের মতই নরম হয়।" তারপর সেই ইংরেজের সঙ্গে পাকা কথা বলে নেয়—বিলেত থেকে সে যেন ছোট ছোট সোয়েটার নিশ্চয় কিনে আনে।

নিজের বেলায় নিহাল কাউর অভিজ্ঞ ধাইদের দেখিয়েছিল। বড় শহরে গিয়ে ডাক্তারদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিল কিন্তু কোনো দেব-দেবীর কাছে মানত করেনি। ক্রমাগত তিন দিন ধরে বীরোর কোমরে যখন ব্যথা হতে লাগল, একদিন অল্প একটু রক্তের দাগও দেখা গেল তখন জীবনে প্রথমবার নিহাল কাউর মানত করল।

সোহাগ আহ্লাদের সময় এটা। বীরো চাইলে দূর-দূরান্তের জিনিসের জন্যও ফরমায়েশ করতে পারতো। সরদার এ সময় তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে তার মুখের একটি কথার অপেক্ষায়। কিন্তু নিহাল কাউর জানে যে বীরো এখনো এত লাজুক যে এক ফালি আচার চাইতে হলেও লজ্জা পেয়ে নিহাল কাউরের মুখের দিকে দু'বার তাকায়। তাই নিহাল কাউরই বীরোর সাধ-আব্দারের খেয়াল রাখে। এরই মধ্যে বীরো একদিন জোরে জোরে একটা কথা বলে ফেলেছিল—যে, উঠোনে দড়িতে বাঁধা শালগমের মালা নামিয়ে কোথাও সরিয়ে রাখা হোক। "এগুলো দেখে আমার মন যেন কেমন করে ওঠে। শুকনো শালগম এমন দেখায় যেন কারো থেঁতলানো মাংস।" বীরো বলেছিল। শুকনো শালগম দেখে তার গা গুলিয়ে উঠেছিল।

তারপর ওর মাথায় আরো কি খেয়াল চাপলো। যখন ন'মাসের পোয়াতি, বীরো জেদ ধরে বসলো যে বাপের বাড়িতেই তার প্রসব হবে। সরদার কিছুতেই এই অহেতুক জেদ মেনে নিতে পারছিল না। নিহাল কাউরও অনেক খোশামদ করছিল কিন্তু বীরোর একই গোঁ—তাদের গাঁয়ে নাকি একজন বুড়ি দাই আছে, বুড়ির খুব খ্যাত যশ। সে শুধু সেই দাইকেই বিশ্বাস করে, আর কাউকে না।

তার মন বলছে যদি সে এখানে থাকে আর শহরের ডাক্তারণীদের হাতে পড়ে তাহলে বাঁচবে না।

"এই ভয়টাই খারাপ।" ডাক্তাররাও সরদারকে পরামর্শ দেন। কিন্তু সরদারের অন্য ভয়। নিহাল কাউকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, "আমার ভয় হচ্ছে সেখানে গিয়ে যদি ওর মেয়ে জন্মায় তাহলে বীরোর বাপ-মা কোনো ছেলের সঙ্গে ঐ মেয়েটিকে বদলে দেবে। এর আগেও আমি এই ধরণের অনেক কথা শুনেছি। তাদের লোভ—যদি ছেলে হয় তাহলে বড় হয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে...।"

"এসব বন্ধ করার একটাই উপায়—যদি আমিও ওর সঙ্গে যাই। আমি ওখানে থাকলে ওরা এসব গণ্ডগোল পাকাতে পারবে না," অনেক ভেবে চিন্তে নিহাল কাউর বলে।

সরদার রাজী হয়। বীরোও কোন ফ্যাকড়া তোলে না। সেবা-শুশ্রূষার জন্য নিহাল কাউর বাড়ির ঝিকে নিয়ে বীরোর বাপের বাড়ি রওনা হয়।

বীরোর প্রসবে গোলমেলে কিছু নেই। ভরা যৌবন, স্বাস্থ্যও ভালো। তার মা ও বৌদিরা ঠাট্টা করে বলে, "এ মিছেমিছিই ভয় পাচ্ছে। বাচ্চা বিয়োনো কি এমন কঠিন ব্যাপার? একবার জোরে চেঁচিয়ে ওঠো আর ছেলে বিইয়ে রেখে দাও।"

বীরোর বাপের বাড়ির কাউকে এতটুকু ঝক্কি পোহাতে দেয়না নিহাল কাউর। সে দু'হাতে খরচ করতে থাকে। সবাই সরদারণী-সরদারণী ক'রে অস্থির। নিহাল কাউর হাসতে হাসতে বলে, "একবার জোরে চেঁচিয়ে ওঠ ও ছেলে বিইয়ে ফেল, কিন্তু যদি মেয়ে বিয়োতে চাস তো..."

বীরোর বৌদি খিলখিল করে হেসে ওঠে, বলে, "দু'বার চেঁচাও আর মেয়ে বিইয়ে ফেল।"

"মেয়ের বেলায় দু'বার চেঁচানী?" নিহাল কাউর হেসে জিজ্ঞেস করে।

"প্রথম চেচাঁনী ব্যথার ও দ্বিতীয় চেঁচানী দুঃখের..." বীরোর বৌদি বলে, "ছেলেদের জন্যই তো যত আনন্দ, মেয়ের জন্যে আবার কে খুশী হবে?"

একবারের জন্য নিহাল কাউর ভিতরে ভিতরে বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে: "আমি সারা জীবনে চেঁচিয়ে দেখতে পেলাম না, না একবার, না দু'বার..."অথচ স্মিত ঠোঁটের তলায় সেই বেদনাটুকুকে এমন ক'রে শুষে নিল সে যে তার দিকে তাকালে মূর্তিমান দুঃখও লজ্জায় মুখ ঢাকবে।

আবার যেদিন রাত্রে বীরোর ব্যথা উঠল সেদিন দাঁত দিয়ে চেপেধরা ঠোঁট দু'টো এমন করে যন্ত্রণা সহ্য করলো যে কেউ তার মুখ থেকে একটা টুঁ শব্দ বেরোতে শুনল না। শুধু একবার তার গলা শোনা গেল তারপরেই বীরোর শিয়রে বসে থাকা নিহাল কাউরের দিকে তাকিয়ে ধাই বলে ওঠে, "সরদারণী! আনন্দ করো! এসো তোমার ঝুলি ছেলে দিয়ে ভরে দিই।"

অভিনন্দনের সঙ্গে নিহাল কাউর ছেলেকেও নিজের ঝুলিতে নিয়ে নেয়। কিন্তু ভোরবেলা যখন সে সরদারকে টেলিগ্রাম পাঠাবার বন্দোবস্ত করছে তখন বীরো নিহাল কাউরকে নিজের কাছে ডাকিয়ে দু'টো হাত তার পায়ের উপর রাখে। "সরদারণী, আমি সমস্ত বিশ্ব-জগতের কাছে মিছেকথা বলতে পারি কিন্তু তোর সামনে মিছেকথা বলতে পারিনা। এ ছেলে তোর ঝুলির যোগ্য নয়।"

"এ তুই কী বলছিস বীরো?"

"ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু ঠাট্টার পরিণাম বোধহয় এমনিই হয়। কিন্তু সত্যি বলছি নিজের জন্য আমার কোনো জলুনী-পুড়ুনী নেই। যদি বা কষ্ট থাকেও তা' তোর জন্যই..."

"বী—রো..."

"তোর মনে আছে আমি একবার বাপের বাড়ি এসে ঘুরে গিয়েছিলাম। গত বছর—তোমাদের মুন্‌শী আমার সঙ্গে এসেছিল

আমাকে বাপের বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখাশোনা করাতে···এখানে সারা গাঁয়েই রটে গিয়েছিল যে আমার মা-বাবা টাকার জন্য আমাকে এক বুড়ো সরদারের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। সরদারজী এ গাঁয়ে কখনো আসেননি। আমার বাবাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের শহরে গিয়েছিলেন আর গুরুদ্বারায় মন্ত্র পড়ে তোমাদের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন····আমি যখন গাঁয়ে ফিরলাম তখন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, সরদার কতখানি বুড়ো। আমার মাথায় কী চাপল, বললাম, আমার বিয়ে তো কোনো বুড়োর সঙ্গে হয়নি। তোমাদের মুন্‌শী জোয়ান লোক—দেখতেও বেশ সুপুরুষ। তাদের আমি মুন্‌শীকে দেখিয়ে দিলাম আর বললাম যে, ঐ আমার বর। মেয়েরা সবাই আমার ভাগ্যি দেখে থ' হয়ে গেল। আমি এ কথাটা মুন্‌শীকেও জানালাম। সেও ভান করতে লাগল। আমার সইরা যেই তার কাছে 'কলিচড়িয়াঁ'* চাইলে ও স্যাকরার কাছ থেকে 'কলিচড়িয়াঁ' কিনে সবাইকে ভাগ ক'রে দিল। পাঁচ-ছ দিন আমি এখানে ছিলাম। রোজ হাসি-ঠাট্টা করতে করতে আমিও অনুভব করতে লাগলাম যেন আমার বিয়ে তার সঙ্গেই হয়েছে —অন্য কারুর সঙ্গে নয়।"

"আমাদের মুন্‌শী মদন সিং..."

"আমি আর সরদারের বাড়ি ফিরে যাবনা, এ ছেলেও যাবেনা। সেই জন্যেই জেদ ক'রে আমি এখানে এসেছি। হাতেই আমার কাজের ফলাফল। আমি তোর কাছে আর কিছুই চাইনা সরদারণী। শুধু একটা জিনিসই ভিক্ষে চাইছি, সরদারকে মুন্‌শীর নাম বলোনা, তাহলে মুন্‌শীকে সে চাকরী থেকে বের করে দেবে।"

"কিন্তু মদন সিং বিবাহিত। শোনো, বাড়িতে তার দুটো বাচ্চাও আছে।"

* পাঞ্জাবের গ্রামে মেয়েরা তাদের জামাইবাবুর কাছ থেকে রূপোর আংটি চায়, তাকেই 'কলিচড়িয়াঁ' বলে।

"এই জন্যেই তো তার ভয় যে, যদি সরদার জানতে পারে তাহলে চাকরী যাবে। তার সঙ্গে তো আর সংসার পাততে যাচ্ছিনা যে, চাকরী ছাড়াবো—যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক··· আর কিছুই নয়, জীবনে অন্তত একবার আমি জানলুম, জোয়ান পুরুষ কেমন!..."

ভয় পেয়ে নিহাল কাউর চোখ বোজে। পরে যখন চোখ খোলে দেখতে পায় কোলের ছেলেটা দুধ খাবার জন্য বীরোর বুকে ঢুঁ মারছে।

নিহাল কাউরের মনে হল—সরদারের যে দীর্ঘশ্বাস সে নিজের জন্য তুলে রেখেছিল, তারপর যে দীর্ঘশ্বাস বীরো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে এতদিন, আজ সেই দীর্ঘশ্বাস আবার ছেলেটা বীরোর বুক থেকে শুষে নেবার চেষ্টা করছে।

সকাল হওয়ার আগে

অনেক রাত পর্যন্ত, চন্নন জাঠ, পাকা কুয়োর পাশের ক্ষেতে লাঙল চষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিটা খরিফ শস্যের বীজ বোনার কাজ এগিয়ে দিয়েছে। মাটি এ সময় ভিজে। কখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, বা দীর্ঘ দিন হয়তো অনাবৃষ্টি থেকে যাবে, আর তখন ফলনই পিছিয়ে যাবে।

বলদদের জাবনা দিয়ে সে হাত-পা ধোয়, ছাদে এসে রুটি খায় ও এক ঘুম দেবার জন্য চারপাইতে শুয়ে পড়ে। খুব ভোরে গিয়ে বেলে জমিতে জোয়ার ছিটিয়ে দিতে হবে, তারপর সন্ধ্যেবেলা বাঁধানো কুয়োর ক্ষেতটায় দু-একবার জল দিয়ে মক্কার বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।

পাদুটো আরামে ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের জ্বলজ্বলে তারাগুলো দেখতে দেখতে তন্দ্রায় তার চোখ বুজে আসে, এমন সময় পাশের ছাদে চারপাই বিছিয়ে ঘুদ্দা বলে, "মনে হচ্ছে তুই বাঁধানো কুয়োর সমস্ত ভুঁইটা চষে এসেছিস। চন্ননা, আমি বলি কি...তুই কথা বলছিস না কেন? খুব খাটুনী গেছে, না?"

চন্নন চারপাইতে শুয়ে শুয়েই বলে, "আমি বলি কি শত্তুরের শেষ রাখতে নেই—কসে লাঙল চালালাম—একটা বলদ শালা চলতেই চায়না। দাঁড়িয়েই রইল।"

"কোনটা? মীনা?"

"না অন্যটা, লাখা—সমান তালে পা চালায় না। এই জন্যেই এত দেরী হয়ে গেল।"

"ভাই, সমস্তটাই খোরাক যোগাবার ব্যাপার..." ঘুদ্দা পষ্টাপষ্টি বলে।

"খোরাক তো দিই যতটা আমার মুরোদ...।" চন্ননের গলায় অসহায় স্বর।

"হ্যাঁ—তা তো বটেই," ঘুদ্দা চারপাইতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারা-ভরা নীল ছাদের দিকে দেখতে দেখতে চন্ননের চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। এক ঝাপটাতেই ঘুম তাকে কাবু করে ফেলে। তার চোখে তারাগুলো ধূলোর কণা হয়ে যায় ও কুয়োর ধারের জমির কেয়ারীগুলো ঢেউয়ের মত তার স্বপ্নে দুলতে থাকে।

গাঁয়ের অন্য দিকে কুকুরের চিৎকার অস্পষ্ট হতে হতে তার চেতনার বাইরে চলে যায়। বাটিতে দুধ নিয়ে বচনোঁ, চন্ননের খাটের কাছে আসে। "নাও, এক চুমুক দুধ খেয়ে নাও।"

চন্ননের চোখের উপর ঘুম তখন বেশ চেপে বসেছে।

"আমি বলি, ও সীবোর বাপ, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি...?" সে চন্ননের কাঁধ ধরে নাড়া দেয়।

"হ্যাঁ···হ্যাঁ..." চন্নন ধড়মড়িয়ে বলে ওঠে।

"নাও, উঠে গরম দুধটা খেয়ে নাও।"

চন্নন উঠে খাটের উপর বসে ও ঢুলতে ঢুলতে দুধের বাটিতে চুমুক দেয়। মনে হচ্ছিল ঘুদ্দার চোখেও ঘুম নেমে এসেছে। বচনোঁ খাটের পায়ের দিকে বসে পড়ে। ভীষণ গুমোট। এই সময় জলো হাওয়ার একটা ঝপটা এলো। দূরে, পাহাড়ের কোলে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, ভিতর থেকে বিদ্যুৎ মাঝে-মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে। বচনোঁ মৃদুস্বরে বলে, "মনে হচ্ছে, আজও মেঘ-বৃষ্টি আমাদের চারপাইগুলো নিচে নামিয়ে ছাড়বে।"

খালি বাটিটা বচনোঁর দিকে এগিয়ে সে হুঙ্কার দেয়, "পুরো ঘুম কি আর ভাগ্যে আছে—দু'রাত্তির এমনি করেই তো কেটে গেল।"

ঘুমে অচেতন চন্নন খাটের উপর আবার এলিয়ে পড়ে। পায়ের দিকে রাখা চাদরটা টেনে পা ঢাকা দেয়। বচনোঁর খাটে ছোট মেয়েটা কেঁদে ওঠে। সে উঠে গিয়ে তার কাছে শুয়ে পড়ে। অর্ধেক প্রহর যেতে না যেতে চন্ননের শরীরে কে যেন একটা ছুঁচ ঢুকিয়ে দেয়। সে পাশ ফিরে শোয়। তারপর আরেকটা ছুঁচ ঢোকে আর তার ঘুম ভেঙে যেতে থাকে।

"বিষ্টির ফোঁটা পড়ছে...।" তার কানে শব্দ ভেসে এলো, যেন ঘুদ্দা তার চারপাইতে নড়ে চড়ে উঠলো।

"আমি বলি, ও সীবোর বাপ...।" বচনোঁ ঘোষণার সুরে বলে, "চারপাইগুলো তো নিচে নামাতেই হবে।"

"না! আমি বলছি, সবাই শুয়ে থাকো, প্রলয় তো আর নেমে আসছেনা।" চন্নন চাদর টেনে ভালো ক'রে মুড়ি দিয়ে শোয়।

"আবার হৈ-হুল্লোড় লেগে যাবে..." বচনোঁ অসোয়াস্তিতে ধড়ফড় ক'রে ওঠে।

"লাগবেনা,...তুই শো তো...।"

চন্ননের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল—বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা চারিদিকে হঠাৎ-ই হল্লা জুড়ে দেয়। আশেপাশের সমস্ত ছাদগুলিতে হড়বড় শুরু হয়ে যায়। চারপাই, দোলনা, চাদর ও ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে গভীর ঘুমে অচেতন শিশুরা খলবলিয়ে ওঠে।

চন্নন হড়বড়িয়ে চারপাইতে বিছানো শতরঞ্চি গোটাতে শুরু করে। বচনোঁ হঠাৎ উগ্র হয়ে বলে, "এখানে দাঁড়িয়ে কোন্ নামতা পড়ছ? নেমে গিয়ে চারপাইগুলো ধর। আমি উপর থেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছি।"

বৃষ্টির ছাটে ভয় পেয়ে কাঁচা ঘুমে জেগে বাচ্চাগুলো কাঁদতে শুরু করে।

গলিতে দাঁড়িয়ে চন্নন ছাদের কার্ণিশ থেকে চারপাই ও বিছানা ধরে। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বচনোঁ তাড়াতাড়ি এক এক ক'রে এই সব জিনিস নিচে ঝুলিয়ে দেয়। না জানি কোত্থেকে এই শুকনো আকাশে বন্যা নেমে এলো। দেখতে দেখতে জায়গায় জায়গায় জলের নালা বয়ে যেতে শুরু করে।

প্রদীপ জ্বালিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা বাচ্চাদের চন্নন চারপাইয়ের উপর শুইয়ে দেয়। দালান ও কুঠরীর ছাদের ঘুলঘুলিগুলো ঢেকে বচনোঁ নিচে নেমে আসে। তার কাপড় থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। জামার ঝুল নিংড়োতে নিংড়োতে সে রাগে ও বিরক্তিতে ফেটে

পড়ে, ‘‘সেই কখন থেকে বলছিলাম, মাথার উপর মেঘ আর বৃষ্টি, আর এর কোনো হুঁশই নেই, মাথাই তোলেনা...।’’

সবাই দালানে, চারপাইতে, মেঝেতে, চাদরের উপর যেখান হোক শুয়ে পড়ে। বৃষ্টির ছাট যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বড় বড় নালা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, এখন তা সরু হয়ে গেল। ভিতরে ভীষণ গুমোট। ক্রমে হাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। প্রদীপের শিখা সোজা দাঁড়িয়ে। কামড়ে খেয়ে ফেলা মশাগুলো কানের কাছে ভন ভন করছে। ঘুমন্ত বাচ্চারা ঘামে জবজবে হয়ে ওঠে। গরম হল্‌কায় ঘরটা উনুনের মত গনগনে। থাকতে না পেরে চন্নন শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, “ঘুলঘুলি তো খোলা রাখতে পারতে ?”

‘‘বৃষ্টি তো বেশ তোড়জোড় করেই নেমেছিল—দ্বিতীয়বার উপরে আবার কে যেত ?’’

“ভিতরে তো মনে হচ্ছে যেন আগুন জ্বলছে। মশাতেও ছিঁড়ে খাচ্ছে,’’ চন্নন গা চুলকোতে চুলকোতে বলে।

ঘামে জবজবে কৈলো দোলনায় হাসফাঁস করতে শুরু করে। ঘ্যানঘেনে ছোট মেয়েটা এক মূহূর্তের জন্যও বচনোঁর কাছ ছাড়া হতে চায় না। বচনোঁ পাখার হাওয়া দিয়ে মেয়েটিকে চুপ করাতে চায়। বড় মেয়ে সীবো ভিজে কাপড়ে নিজের খাঠে উঠে বসে, “বাবা...ঘুম আসছে না যে... ।”

“ও মা বাত্তিটা নিবিয়ে দে না... ।’’ ছোট ভিন্দর সীবোকে বললো। ওর ধারণা বাত্তির আলো থেকে গরম বেরুচ্ছে।

চন্নন উঠে গলিতে বেরিয়ে আসে, “বৃষ্টি তো থেমে গেছে—মেঘও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।”

“পুতখেকো, আজকালকার বিষ্টি খামোকা অশান্তি সৃষ্টি করে।’’ বচনোঁ ভিতর থেকে শুয়ে শুয়েই বলে।

“ও মা গলিতে চারপাইগুলো বের করে নে না...” সীবো উতলা হয়ে বলে।

"হ্যাঁরে খুকি, গলিতেই চারপাইগুলো পাতা যাক"—চন্নন ভিতরে এসে বাইরে পাতার জন্য চারপাই ওঠাতে শুরু করে।

বচনোঁ উঠে দরজার কাছে এসে আকাশের দিকে তাকায়, "কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন—আকাশ একেবারে পরিষ্কার।"

প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কেসরী ছুতোরণী বলে ওঠে, "ও পিসী, এক একটা তারা আলাদা করে গুনে নে—বৃষ্টি যখন আসে তখন ঝমঝমিয়ে আসে, একেবারে বিপদে ফেলে দেয়।"

"বাবা, মালিককে কে কী বলতে পারে..." নিজের নিচু আলসেতে চারপাইয়ের পায়া আটকাতে আটকাতে ঘুদ্দা বলে ওঠে।

"আমি বলি কি এখন চারপাইগুলো উপরেই ওঠানো যাক। গলিতে আর শোবোনা..." বচনোঁ চন্ননকে বলে। চন্নন তখন গলিতে চারপাই পাতছে।

"ওগো এখন ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য কে আবার এসব ওঠাবে-নামাবে। আদ্দেক রাত কখন কাবার হয়ে গেছে। ছাখো তো সপ্তর্ষি সরে কোথায় পৌঁছেছে।"

"বেশ, গলিতে তুমি কার কার চারপাই পাততে পারবে? তার উপর গরু-মোষ...চলো তুমি উপরে যাও, আমি চারপাই ধরিয়ে দিচ্ছি হাতে—কিছুক্ষণ তো শান্তিতে কাটুক।"

"ঠিক আছে, তাই হোক। সীবো, বাচ্চাগুলোকে তুলে নিয়ে আয়। ওরে ভিন্দর, ওঠ। চারপাইগুলো বের কর বাইরে।" বলে চন্নন মইয়ে চড়ে আলসের উপর গিয়ে বসে।

বচনোঁ চারপাই ও বিছানা উঁচু করে ধরে। চন্নন বাচ্চাদের শুইয়ে দেয়। বচনোঁ প্রদীপ নিভিয়ে তালা লাগায় তারপর মইয়ের সবচেয়ে উপরের ধাপে উঠে এসে বলে, "ওহ্ ওয়াহ গুরু, নিচে থেকে উপরে এসে অন্তত নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।"

বাচ্চাদের চারপাইতে শুইয়ে বচনোঁ যখন ঘুলঘুলি খুলতে গেলো তখন তার পা কুঠরীর ছাদে বসে গেলো, আর ফিরবার সময় আলসের কাছে পা হড়কে পড়লো। পড়তে পড়তে অনেক কষ্টে সে

সামলিয়ে নিলো ও বিড়বিড় ক'রে বললো "কতবার এই ড্যাকরাকে বলেছি যে কাঁহুনে জমির বাবলা কাঠ এনে কুঠরীর উপরের ছাদে ফেলে দে। ঘরের কড়ির কাজও হয়ে যাবে। কিন্তু এই জাঠ, কে কার কথা শোনে। সবাই মজা লুটছে আর এখানে হু'বেলা..."

"ওরে এ সময় আমি..."সে কলাগাছের মত ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠা মেয়ের বিয়ের বিষয়ে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কাছেই শুয়ে থাকা যুবতী মেয়ের জন্য মুখ সামলে নেয়।

"আরে ওখানে গিয়েই বা তোমার কি হবে?" ঝগড়া করার জন্য মুখিয়ে সে চারপাইয়ের দিকে এগিয়ে এলো।

"আচ্ছা, এবার গিয়ে চুপ ক'রে ঘুমিয়ে পড়। মিছিমিছি ঘ্যান-ঘ্যান করছিস। তার চেয়ে যাদের অবস্থা খারাপ, তাদের দিকে তাকিয়ে দিন গুজরান করতে হয়।"

"হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, চন্নন বলেছে বটে হক্ কথা," পাশের বাড়ির নিচু ছাদ থেকে করমসিং-এর মা তার কথার সমর্থন করে।

গুমোটে আবার নিঃশ্বাস আটকে আসছে, মনে হয় বৃষ্টি যেন কখনো হয়ই নি। অতরী বিবির উঠোনে বাবলা গাছ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে চন্নন প্রকৃতির রাজ্যের বিরুদ্ধে বলে, "কোনো অভিশপ্ত পাপী বসে আছে পাহারায়। আজ একটা পাতাও নড়ছেনা।"

"গরীবেরই যত দুঃখ আর কষ্ট...।" নিচে গরু মোষের গোয়ালের হাতা থেকে আঙিনার মঙ্গল বলে ওঠে। সে হাতার বাইরে গলিতে চারপাই পেতে শুয়ে ছিল। নিজের জায়গায় সেও মাছের মত ছটফট করছিল।

"ও মা! মশা কামড়াচ্ছে"—চারপাইয়ের দড়িতে পা চুলকোতে চুলকোতে ভিন্দর বলে।

অতরী বিবির বাবলার ডালগুলো শিরশির ক'রে ওঠে। মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করে—তার সঙ্গে ভিজে ছাদের উষ্ণ গন্ধ। আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘুদ্দা তার চারপাই থেকে বলে, "ও ভাই চন্ননা, পাহারা বদলে গেছে রে, কোনো ধার্মিক লোক এসে বসেছে।"

"হ্যাঁ বাবা..." দূর থেকে করমসিং-এর মা বলে ওঠে, "ধার্মিক লোকের কি কমতি আছে পৃথিবীতে?"

"এতো নিশ্চয়ই আর এক ধ্রুব, বুঝলে মা।" হাওয়ার ঝাপটা আরামে উপভোগ করতে করতে ঘুদ্দা বলে। চন্নন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে ঘুদ্দা জোরে ডেকে বলে, "চন্ননা, ওরে চন্না!"

"এঁ্যা..." চন্নন আধোঘুমে।

"ঘুম পাচ্ছে?"

"হ্যাঁরে।"

"আচ্ছা তাহলে ঘুমো।" বলার পর ঘুদ্দা নিজেও পাশ ফিরে শোয়।

হালকা হালকা হাওয়ার ঝাপটা এসে সবার দুঃখ মুছে দিয়ে যায়। সোহাগভরা আলতো হাতে প্রকৃতি সবার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম-পাড়ানি গান গাইছে। ধীরে ধীরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। মাথার তলায় হাত রেখে পাশ ফিরে শুয়ে চন্নন ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

হঠাৎ ক্ষুধার্ত বাঘের মত গ্রামের আকাশে মেঘ গর্জে ওঠে। ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ মেলে চায় চন্নন। গাঢ় ধূসর রঙের মেঘ চাঁদকে ঢেকে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। হাল্কা মেটে অন্ধকার ছেয়ে আছে। চন্নন উঠে চারপাইতে বসে পড়ে ও পা দিয়ে জুতো হাতড়ায়।

শাদা আলোর একটা তার চীনোঁদের চিলেকোঠার উপর কেঁপে উঠল ও পরক্ষণেই বাজ পড়ার শব্দ এলো। ভয় পেয়ে বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে ও কুকুরগুলো চেঁচিয়ে ওঠে। সবাই রাম রাম করতে থাকে। চন্ননের ঝলকানি খাওয়া চোখের সামনে অন্ধকারে কোনো হল্‌দে, সবুজ ও লাল তার তখনও কাঁপছে। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা যেন বাবলার ডালে কোথাও নিজেকে জড়িয়ে বসেছে।

"মেঘের নিকুচি করি..." বচনোঁ আঁতকে উঠে ছোট মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে নেয়, "অলপ্পেয়ে যেন ক্ষেউ লেগেছে আজ—জানিনা

কোত্থেকে উঠে এলো…।" তারপর চিন্তাভরা জোরালো আওয়াজে বলে ওঠে, "বসে বসে ভাবছো কি, চারপাইগুলো নিচে নামাতে হবে কি না।…"

"কেমন ক'রে নামাই নিচে…" চন্ননের হাড়ে হাড়ে ব্যথা।

"নামাবে না তো করবে কি? দেখছ না, মেঘ তো ঢালবার জন্যই মুখিয়ে রয়েছে। ওঠো তাড়াতাড়ি।"

"ঘণ্টাখানেক আগে কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছিল না। এর মা…" ঘুদ্দা তার চারপাইতে বসে বলে।

বাতাস অচল হয়ে যায়। চীনোঁ, লম্বড় ও চিলেকোঠাওআলা অন্য লোকেরা নিজের নিজের চিলেকোঠার তলায় জানলা খুলে আরামে ঘুমিয়ে আছে। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে চন্নন বলে, "বাচ্চাদের চারপাইগুলো ছাউনির তলায় রেখে দিচ্ছি। তুই সীবোকে নিয়ে নিচে যা, আমি এখন এখানেই…"

জলের ফোঁটা ঝরতে শুরু করে।

বচনোঁ ভাবনা-চিন্তায় ছটপটিয়ে বলে ওঠে, "উহ্, তোমার তো মাথাই খারাপ হয়ে গেছে—করছই বা কি। ছাউনির তলায় কার কার চারপাই পাতবে? চলো, নিচে গিয়ে চারপাই ধরো।

"আচ্ছা বাপু…।" তিক্তবিরক্ত হয়ে সে তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

বচনো আর সীবো তাড়াতাড়ি বিছানা কাপড় সামলে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে নিচে নেমে আসে। কেলো আর ভিন্দী আধজাগা অবস্থায় মইয়ের বাঁশ হাতড়ে হাতড়ে নামে। চন্নন সেইখানেই চারপাইয়ের পায়ের দিকে রাখা সতরঞ্চিটা গায়ে জড়িয়ে নাক ডাকতে শুরু করে।

বৃষ্টির ফোঁটা ক্রমাগত পড়ছেই।

"আজ ঘুমোতে দেবেনা রে চন্নন!" ইলশেগুঁড়িতে বিরক্ত হয়ে ঘুদ্দা বলে।

"আরে আমার তো ভাগ্যই খারাপ—না দিনে আরাম, না রাতে ঘুম।" চন্ননের চোখে যেন বালি করকর ক'রে ওঠে।

"মজা তো চিলেকোঠা ওআলাদের ··।" চীনেঁাদের চিলে-কোঠায় বাতি জ্বলছে দেখে ঘুদ্দা ঈর্ষায় বলে ওঠে।

"ভাই সবই মালিকের ইচ্ছে···" চন্নন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "সংসারে অভাব জিনিসটা বড় খারাপ বুঝলি রে ঘুদ্দেয়া। রাত আর কত বাকী রে?"

"অনেক বাকী।"

"এতো নয় যে মেঘের দরুণ অন্ধকার হয়ে আছে?"

"না রে—বোধ হয় আদ্দেক রাত মাত্র পেরিয়েছে—এখনো শুকতারা ওঠেইনি। মেঘের জন্য দেখাই যাচ্ছে না। গাই-বলদ নিয়ে চরাতে যেতে হবে বুঝি?"

"হ্যাঁরে।"

"আরে শুয়ে থাক···অনেক দেরী····মানুষ একটু বিশ্রাম করবে তো।"

"আরে জাঠের ভাগ্যে বিশ্রাম কোথায়?"

"তোর কথাও ঠিক।" ঘুদ্দা এই বলে চুপ হয়ে গেল।

ছোট ছোট বৃষ্টির কণা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ঘোলাটে মেঘের তলায় গোঁ ধরে ·একে থাকা গুমোটকে বাতাসের এলো-মেলো ঝাপটা ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয়। ঘুদ্দা ও চন্ননের বার্তালাপ মিষ্টি ঘুমের তরঙ্গে হারিয়ে যায়। চন্ননের চোখ বন্ধ বইকি কিন্তু তার মনে এক নতুন ধুকধুকি: "কোথাও ঘুমোতে ঘুমোতে দিন না হয়ে যায়।" ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে গলির শব্দগুলির দিকে কান পেতে দেয়। বৃষ্টির জ্বালাতন, শরীবের ক্লান্তি ও ঘুদ্দার কথাগুলো ভুলে গিয়ে যখন সে মারুদের গোলাঘরের দিকে চলে তখন সূর্য উঠছে। গরু-মোষের খোরাকির ফসলের চারা চারিদিকে হালকা হাওয়ায় কাঁপছে। মোঠ, মাসকলাই, গোয়ার ও মুগের চারাগুলো কান খাড়া করে আছে। দূরে টিব্বীর উপর জীতে লম্বড়ের লাঙল চলছে। ঘণ্টার মৃদু মন্দ ধ্বনির সঙ্গে মির্জার* গান সপ্তমে চড়ছে···।

* পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ প্রেম কাব্য, মির্জা সাহিবান।

ধরমড়িয়ে উঠে বসে সে। ছাদের কার্ণিশে উঠে মোরগ কোকড় কোঁ করছে। গলি থেকে বলদের গলায় ঘণ্টা টুনটুন বাজছে ও মেঘের পিছন থেকে সূর্যের আলো ফুটে বেরুতে চাইছে।

উঠোন থেকে বলদ খুলে চন্নন টিব্বীর দিকে রওনা হওয়ার সময় বলে যায়। "ও বচন কাউর, সীবোর হাতে নাশ্‌তা তাড়াতাড়ি পাঠিও। চা একটু কড়াই পাঠিও...।" তার গলা যেন চেরা বাঁশের মতন।

টাঙ্গির মরশুম

গনগনে জ্বলন্ত কয়লায় ভরা হাপরের সামনে একটু নুয়ে দাঁড়ানো দীনা কামারের লোহাপেটা শরীরে কাঁসার দীপ্তি। একজন স্বাস্থ্যবান শ্রমিকের ছাঁচে ঢালা কাঁসার মূর্তির মত মনে হয় তাকে। হাতের জোরালো হ্যাঁচকায় যখন সে হাতুড়ি ঘোরায় তার ব্যায়াম করা পেশল শরীরের প্রত্যেটি পেশী ফুলে ওঠে আর নেহাইয়ের উপর রাখা লাল লোহার উপর ভীষণ জোরে ঘা এসে পড়ে।

অবিশ্রান্ত ঘা পড়তে থাকে। দীনা কাজে এত মশগুল যে দীন দুনিয়ার আর কিছুর তার হুঁশ থাকেনা। চুল্লীর আগুনের মতো ভাদ্রের রোদ্দুর যখন জানালা দিয়ে ঢুকে হাড়-মাস চাটতে আরম্ভ করে, তখন তার হুঁশ হয়। থতমত খেয়ে সে জানালার বাইরে তাকায়। সূর্য মাথার উপর। এত তাড়াতাড়ি দুপুর হয়ে গেছে আর এখনো তার আদ্দেক কাজ শেষ হয়নি। রোদ্দুরের তাত থেকে বাঁচার জন্য সে জানালা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু জানালা বন্ধ করায় তার দম আটকে আসে, চটচটে ঘামে ভরে যায় কপাল। রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, আকাশ থেকে ধারা নেমে এসেছিল, সকালবেলায় ইলশেগুঁড়ি নেমেছে, কিন্তু এখন, সূর্য উঠে আসার পর ভীষণ গুমোট। জানালা খুলে দিয়ে আবার সে হাপরের দিকে ঝুঁকে বসে। ঘাম এখন তার কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে তার পিঠের উপর সুতোর ধারায় চুঁইয়ে পড়ে। পেশল বাহু তুলে সে কপালের ঘাম মোছে। হাপরের আগুনে ঘামের বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। ছুঁ-উঁ ক'রে একটি শব্দ শোনা যায়—হয়তো ক্ষণেকের জন্য একটা কয়লার জীবন একটু সহজ হয়ে ওঠে।

রোদ্দুর ও হাপরের সম্মিলিত তাতে গা ভীষণ তেতে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, আগুন যেন তার রক্তে মিশে গেছে—এই তাপ তার হাড়-মজ্জা সব ভেজে ফেলছে। হাপরের তীব্র ফুলকিগুলোতে তার চোখ জ্বলে ওঠে। তার মনে হয় তার শরীরের প্রত্যেকটি

রোম যেন পলতে হয়ে যাচ্ছে। সে স্পষ্ট অনুভব করে যে, এখুনি কোনো পলতেতে আগুন ধরে যাবে আর তার শরীর একটা বড় পতঙ্গের মত ফটাস ক'রে ফেটে যাবে।

নিজেরই অজান্তে সে হাপর ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ভাদ্দ্‌রে রোদে বাইরে সারা আকাশ ঝলমল করছে। রোদ্দ্‌রে অনভ্যস্ত চোখ দু'টো ধাঁধিয়ে যায়। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হলে সে সামনে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ক্ষেতগুলির দিকে, তারপর ক্ষেতগুলোর মাঝখান দিয়ে সেই বালিভরা অংশের দিকে তাকায় যা জ্যোৎস্নার রেখার মতো দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আখের ক্ষেতের বাঁ ধারে কাপাসের ক্ষেত ও কোথাও কোথাও আখের ক্ষেতে জল রূপোর পাতের মতো ঝকমক করছে। বাঁ দিকের জমিগুলোতে লাঙল চালিয়ে পাটা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে—তারা এখন বীজ ছিটোনোর অপেক্ষায় রয়েছে। সবে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ তার বড় ভালো লাগে আর বুকে কেমন একটা ব্যথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, ক্ষেতে লুটোপুটি খায় ও ভিজে জমির আর্দ্রতা নিজের প্রতিটি লোমকূপে ভরে নেয়।

জোত-জমি চাষ-আবাদ ভালবাসতো সে। বীজ বোনা ও ফসল কাটার দিনগুলিতে টগবগিয়ে উঠতো তার রক্ত, হাড়গুলো চ্যাটালো হয়ে যেত। সে ছিল গাঁয়ের কামার, কিন্তু গাঁয়ে কামারের জন্য কতটুকুই বা কাজ থাকে, তাই বেশীর ভাগই সে চাষাদের চাষ-আবাদে সাহায্য করতো। ফসল কাটায় তার জুড়ি সাত গাঁয়ে কেউ ছিল না। তার মতো বোঝাও কেউ বইতে পারতো না। হঠাৎ তার হাত কাস্তে ধরার জন্য নিস্‌পিস ক'রে ওঠে।

কাস্তে, ফসল কাটা, জ্যোৎস্নায় মাথা দোলানো আখের ক্ষেত, মাইলের পর মাইল সোনালী শীষের সরদারণী, মাটির কোল থেকে জন্মানো গানের সুর তার মনে পড়ে। সে ভুলে যায় যে, তার

পিঠের পিছনে দোজখের আগুনের মতো হাপর জ্বলছে এবং গত বিশ দিন ধরে সে টাঙ্গি, কাটারি আর বল্লম তৈরী করা ছাড়া কিছুই করেনি। হ্যাঁ, কাস্তে খুরপী বানাবার মরশুম গেছে। এ হল টাঙ্গি ও বল্লমের মরশুম। এবার যেমন কাটাকাটি হয়েছে তাতে গমের ফসল কাটার বদলে, গমের ফসল ফলানো চাষা-ভুষোরাই বেশী কাটা পড়েছে।

সে ভাবছিল, এ কোন আপদ সে গলায় জড়িয়ে এই ধরণের বেগার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কাজকর্মে সে এত ব্যস্ত থাকে যে, মনে হয় এই সবে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের সমস্ত মুজাহিদদের জন্য হাতিয়ার বানাবার জিম্মা তারই ঘাড়ে এসে পড়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু পাকাপাকি পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তান-নিবাসী সমস্ত হিন্দু ও শিখদের জঞ্জাল পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যদিও দীনা এ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছেনা কিন্তু সবাই এই এক কথাই বলছে। গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বী থেকে নিয়ে জামা মসজিদের ইমাম পর্যন্ত একই কথা বলছে। আর এ জেহাদ তখনই সফল হতে '''রে যদি তার হাপর জ্বলতে থাকে ও টাঙ্গি ও বল্লমে গড়া মৃত্যুর লেলিহান জিভগুলো ওগরাতে থাকে।

পিছন ফিরে তাকায় সে। কয়লার মধ্যে রাখা লোহার ধারালো টুকরোগুলো জ্বলন্ত কয়লার চেয়েও বেশী লাল হয়ে গেছে। ওগুলোর দিকে তাকাতেই তার মাথা ঘুরে যায়—সে জোরে নিজের পেট চেপে ধরে। কোনো গরম ও ধারালো জিনিস যেন তার পেট চিরে দিচ্ছে। অনুভব করল ভয়ানক খিদে পেয়েছে তার। সকাল থেকে সে এক ঢোঁক জল পর্যন্ত খায়নি। এখন খিদেতে পেট জ্বলছে, নাড়ি-ভুঁড়িগুলো তাতাচ্ছে, ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে সে জোরে হাঁক দেয়, "ও বশিরের মা, তাড়াতাড়ি জল দে তো।"

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের একটি মেয়েলোক কাঁসার বাটিতে ক'রে

জল নিয়ে আসে। তার নাকে নথ, কানে রূপোর ঝুমকো। মরদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে—তেষ্টায় ধুঁকছে সে। সকাল থেকে তিনবার এসে রুটি জলের কথা জিজ্ঞেস ক'রে গেছে কিন্তু দীনা তার কথায় কান দেয়নি—নিজের হাপরে কাজ করে গেছে। আর এখন হঠাৎ কেমন ক'রে তার খিদে-তেষ্টার কথা মনে পড়ে গেল। বউটি হাপরের নারকীয় আগুনের দিকে তাকায়, লোহার সেই টুকরোগুলির দিকে তাকায়, যেগুলি কুষ্ঠের কালো ক্ষতের মতো মেঝের চারিদিকে ছড়ানো, কোণের দিকে জড়ো করা পোড়ামুখো বল্লম ও টাঙ্গির স্তূপ। কতবার তার দৃষ্টি তার মরদের মুখের উপর আনাগোনা করে, যেন সে লোকটাকে চিনতে পারছে না।

দীনা বাটির জলটুকু এক চুমুকে শেষ ক'রে দেয়।

"আরো!" হাঁপিয়ে ওঠা গলায় সে বলে। তার জল খাওয়া দেখে বউ বাটি ভরে জল আনে।

"ব্যস!" দীপু বলে। তার পেট ও মাথার ফুলে ওঠা শিরা-গুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। হাঁপানি কমে যায় কিন্তু ঠিক তখুনি তার মুখে ফুটে ওঠে অপ্রতিভ ভাব, অসোয়াস্তি। সে বলে ওঠে:

"আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন? কথা বলছিস না কেন আমার সঙ্গে? এমন ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে আছিস যেন আমার গায়ে প্লেগের ফোসকা।"

বউ জবাব না দিয়ে ভিতরে গিয়ে চুপচাপ খাবার বেড়ে আনে।

"আরে—আমি তোর কাছেই রয়েছি" দীনা তার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দেয়। "কথা বলছিস না কেন আমার সঙ্গে, মুখে কি সেদ্ধ করার জন্য ঘুঘনি বসিয়েছিস?"

বউ তবুও চুপ ক'রে থাকে।

দীনা রুটি ছিঁড়ে বড় একটা গরাস তোলে। কিন্তু গরাস নিচে নামতে চায় না। কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে রুটির ডালাটা সরিয়ে

বলে, "আমার সঙ্গে কথা বলছিস না,. তাকিয়েই আছিস যেন আমার মাথায় জিন ভর করেছে।"

"বালাই-ষাট, আল্লা যেন এমন না করেন," বউ বলে, "কিন্তু দেখাচ্ছে তোমাকে সেই রকমই।"

বিস্ময়ে দীনার ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়। সে আশা করেনি যে, বশিরের মা কথা বলবে ; এতক্ষণের জেদী নীরবতা সে এমনি করে ভাঙবে।

কিছুক্ষণ ধরে বিস্ময় তাকে হতবাক ক'রে রাখে। একটু সুস্থির হয়ে সে বলে, "তোর মনের কথা আমি বুঝি, কিন্তু কি করব বল, তোর ছেলেরাই আমাকে বাঁচতে দেবেনা। এখুনি বশিরা বলে গেছে যে, কাল সন্ধ্যে অব্দি পঞ্চাশটা টাঙ্গি যেন তৈরী থাকে। যদি আমি একটুও টালবাহানা করি তাহলে সে আমার ঘাড়ে চেপে বসবে। তুই বলছিস মোটেই তা নয়, কিন্তু এই আমি বলে রাখছি যে যদি আমি ওদের কথা না শুনে একটু এদিক-ওদিক করতে যাই তাহলে ওরা আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে রাখবে—আমার গলা টিপে ধরবে।"

"ওরা তোমার ছেলে না আর কেউ?" বশিরের মা জিজ্ঞেস করে। তারপর মনে মনে এই প্রশ্নের জন্য সে লজ্জা পায়।

"আমারই", দীনা বোকার মতো বলে।

"তাহলে তাদের উচিত তোমাকে ভয় করা, তা না তুমি তাদের ভয় করছ।"

"তোর পক্ষে কথার জাল বোনা সহজ", দীনু বলে, "যেন তুই জানিসই না যে, তোর ছেলেরা কেমন রাক্ষস। আমার সাধ্যি কি যে, তাদের সামনে টুঁ শব্দটি করি। জ্যান্ত আমার ছাল-চামড়া খসিয়ে নেবেনা তাহলে?"

"আমারও ছেলে ওরা", বউয়ের গলার স্বর নরম হয়ে এসেছে, "দেখতে পাওনা, কথায় কথায় আমার উপর কেমন করে ঝাঁপিয়ে

পড়ে, সব ব্যাপারে যেন কামড়াতে আসছে, কিন্তু আমি তাদের জন্য টাঙ্গি তৈরী ক'রে বেড়াই না।"

দীনু বলে, "তাতে কি হয়েছে? আমি তো শুধু টাঙ্গিই তৈরী করি। মানুষ কেটে বেড়াই না তো?"

বউ বলে, "কাজটা তো মানুষ কাটার চেয়েও খারাপ। যে গলা কাটে সে দু'একজন, বড়জোর পাঁচজনের গলা কাটবে। তোমার হাতে তৈরী টাঙ্গি তো বিশ-চল্লিশের মাথা কাটে।"

দীনা শিরদাঁড়ায় একটা শিরশিরে কাঁপুনি অনুভব করে। তার প্রতি লোমকূপ শিউরে ওঠে। অনেকক্ষণ অবধি তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। জিভে সাড় এলে সে বলে, "আমাকে বলিস। নিজের ছেলেদের আটকাতে পারিস না যারা সেনাপতি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক-এক রাতে দু-দু'টো গ্রাম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে।"

"আমার কথা ওরাই বা কতটুকু শোনে আর তুমিই বা কতটুকু শোনো?" বউয়ের বলার ধরণ আরো নরম হয়ে আসে। "আমার বলার অধিকারই বা কতটুকু। সবাই নিজের নিজের পাপের জবাব দেবে। আমার কিছু বলার দরকারই বা কি।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ মেঝের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে।

তারপর হঠাৎ বউটি বলে ওঠে, "রুটি কেন খাচ্ছ না? না খেয়েদেয়ে শুকোতে চাও?" সে রুটির ডালাটা সরিয়ে দীনার সামনে রেখে দেয়।

বাইরে দরজায় একটা মৃদু শব্দ হয়। দীনা চমকে উঠে ধড়মড়িয়ে বসে। সে জানে বশির বা তার সঙ্গীরা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তারা নিশ্চয়ই তাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছে। হুড়কোয় হাত রেখে সে ইতস্তত করে। হাপরের দিকে তাকায়। হাপর দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সব জিনিস ঠিকই আছে। হুড়কো খুলে দেয় সে। শ্রাবণ ভাদ্রের বৃষ্টিতে দরজার জোড়গুলো আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

ঘাবড়ে গিয়ে দীনা ভিতরে পালিয়ে আসে ও হাপরের সঙ্গে হোঁচট খেতে খেতে সামলায়। তার গিন্নীর রং পেঁজাতুলোর মতো শাদা হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে স্বতই একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো। দরজায় ঠাকুর-বাড়ির বুড়ি পুরুত-গিন্নী দাঁড়িয়ে। তার বিবর্ণ হলদে মুখে বলিরেখার জাল ছড়ানো, শাদাচুলভরা মাথাটা কাঁপছে। দীনা আর বউ ত্রস্ত চোখে বুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে জীবন্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু এখন তো সে প্রেতিনী ছাড়া কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত দীনার বউ সাহসে বুক বেঁধে বলে, "ও পুরুত—চাচী, তুমি এখনো বেঁচে আছ? বুড়ি কোনো জবাব দেয়না। তক্ষুনি দীনার বউয়ের মনে পড়ে যে, পুরুত-গিন্নী কানে কম শোনে। বোধ হয় মরার পরেও তার বধিরতা দূর হয়নি। বুড়ির আরো কাছে গিয়ে সে উঁচু গলায় নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে।

কথাগুলো বুঝতে পেরে বুড়ির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, "দেখতে পাচ্ছ না যে আমি এখনো বেঁচে আছি? সাতদিন থেকে আমি পালাজ্বরে ভুগছি। ভিতরের কুঠরীতে একা একা শুয়ে পুড়ছি। কেউ এসে এক ঢোঁক জল দেয়নি। অনেকদিন হল তুলসী বাইরে গেছে। হয়তো তার যাওয়ার পর আমি শেষ হয়ে যেতাম। মানুষের কি ঠিক আছে কিছু। আজ আমার জ্বর ছেড়েছে। দাঁড়াতে পারছিলাম না. কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে এ্যাদ্দুর হেঁটে এসেছি। তোমরা এমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখছ কেন?"

কথা বলতে বলতে বুড়ি ঘেমে নেয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দু'পায়ে ভর দিয়ে মেঝের উপ'র বসে পড়ে সে। তার চোখের তারা নিষ্প্রাণ, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসই যেন অন্তিম নিঃশ্বাস।

দীনা ও তার গিন্নী পরম সান্ত্বনায় একে অন্যের দিকে তাকায়। সত্যি সত্যিই পুরুত-গিন্নীই, পুরুত-গিন্নীর প্রেত-প্রেতনী নয়। পালাজ্বরই তাকে সেই অমোঘ নিয়তি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যা

এই গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। বধিরতার দরুণ তার কানে সেই ট্রাজেডির কোনো কথাই ঢোকেনি যা গত পরশু জুমেরাতের (বৃহস্পতিবার) দিন এই গ্রামে অভিনীত হয়েছিল। সে এখনো জানেনা যে, তার গ্রাম পাকিস্তানে চলে গেছে, গ্রামের হিন্দু বা শিখদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই—কিছু মেয়ে ছাড়া। কারণ দাঙ্গা-বাজরা এদের নিয়ে চলে গেছে।

হঠাৎ পুরুত গিন্নী-বলে ওঠে, "কী রে দীনু, আমার ছাগলটা দেখেছিস?"

ছাগল? দীনা ভাবে, আজকের এই দিনে যখন হামলাবাজরা গরু-বাছুর কেটে সাবাড় করে রান্না করে খেয়ে ফেলছে, পুরুত-গিন্নী তার ছাগলের কথা বেশ বলেছে।

বুড়ি বলতে থাকে, "কি জানি কোথায় পালিয়ে বেড়ায়। এদিকে ও বিয়োবার সময়ও হয়ে এসেছে। নিজেকেই সামলাতে পারিনা আমি। কোথায় খুঁজে বেড়াই ওকে। তারপর আমাকে ধরাও তো দেবেনা। রব্ব (ঈশ্বর) তোর ভালো করবেন, যদি কোথাও দেখতে পাস বেঁধে রাখিস। ছ্যাখ না বিয়োবার সময় হয়েছে ওর। আমি বলি কোথাও বাইরেই না বিইয়ে বসে।"

দীনা বলে, "মাঈ, তোর ছাগল কোথাও নেই। খেয়ে ফেলা হয়েছে তাকে। তাকে খেয়ে লোকে ঢেকুর তুলছে এখন।" কিন্তু বুড়ি কিছুই শুনতে পেল না। দীনা উঁচু গলায় এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চায় কিন্তু তার বউ তাকে ইঙ্গিতে বারণ করে দেয়।

"আর এই দেখনা," পুরুত গিন্নী বলে "এই শিকল ঠাকুরবাড়ির দরজার কাছে পড়ে ছিল, পেয়েছি। জানিনা হতভাগী শিকল ছিঁড়ে কেমন করে পালিয়েছে। ছ্যাখ তো, যে আংটায় শিকলটা আটকানো থাকে সেই আংটাই ভেঙে গেছে। ভাবলাম দীনুকে গিয়ে বলি আমার শেকলটা মেরামত করে দে।"

দীনা দেখে, বুড়ির হাতের শেকলটা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে

গেছে। ছাগলের পিঠে যে তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি আছড়ে পড়েছে সেটাই শিকলকে কেটে দু'টুকরো ক'রে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ ধরে দীনার গিন্নী একদৃষ্টিতে বুড়িকে দেখছিল। মনে হচ্ছিল তার বুকে ভীষণ তোলপাড় চলেছে। শেষ পর্যন্ত তার নিশ্ছিদ্র ভাবনার মধ্যে একটা জানালা খুলে যায়, সে বলে, "পুরুত-চাচী, তুই আমাদের বাড়িতেই থেকে যা। ঠাকুরবাড়িতে একলাই তো বসে থাকিস, তারপর আজ তোর জ্বর ছেড়েছে। এখানেই রান্নাবান্না করে নে, ওখান থেকে নিজের বাসন-কোসন নিয়ে আয়, হিন্দুঘরে জন্ম! তুলসী আসুক, তারপরে যাস' খন।"

মনে হয় পুরুত গিন্নীর বধিরতা আগের চেয়েও বেড়ে গেছে। বোধহয় পালাজ্বর তার কানে ধাপা দিয়েছে। এতগুলো কথার মধ্যে সে শুধু তুলসীর নাম শুনতে পায়।

"তোমাকে বললাম তো যে তুলসী বাইরে গেছে। রামেশাহের মেয়ের গায়ে হলুদ নিয়ে সে বেয়াই বাড়ি নয়েপিণ্ড গেছে। আশ্বিনের পয়লা তারিখে প্রীতোর বিয়ের লগ্ন ঠিক করা হয়েছে। আমি শাহকে বললাম, এবার দানে একটা গরু দিস। তা নাতো কি, শাহদের বাড়িতে কি আর নিত্যদিন বিয়ে হচ্ছে। তারপর তোমার ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তুলসীর আবার খরার ধাত, বাড়িতে দুধ-দইয়ের সুবিধা হবে।" বুড়ির কথায় কান না দিয়ে দীনার বউ দীনার চোখে চোখ রাখতে চাইছিল। সে কিছু বলতে চায়, পরামর্শ করতে চায় কিন্তু তার কিছু বলার আগেই দীনা বলে ওঠে:

"আমি তোর মনের কথা বুঝি, কিন্তু এসব আমাদের দিয়ে হবে না। আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু একে কোথায় কোন হাঁড়ি কলসীতে লুকিয়ে রাখবি। এখুনি তোর পেটের রত্নরা 'হাউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ' বলে এসে দাঁড়াবে। আর তুই তো জানিস ওদের অজানা কিছুই থাকে না। আজই তারা জানতে পারবে। তারপর আমাদের সেই দুর্দশা হবে যা কখনো কারু হয়নি।"

দীনার বউ মিনতি করে, "বুড়ো মানুষ। আমাদের গাঁয়ের খত্রীদের একমাত্র চিহ্ন। পুরুত-গিন্নী ঠাকুর বাড়িতে আল্লার নাম নেয়। দু'চার দিনের ব্যাপার, তারপর এর ছেলে ফিরে এলে এদের অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।"

"কোন গ্রামে পাঠাবি একে?" দীনা চেঁচিয়ে বলে, "কোন গ্রাম বাকি রয়ে গেছে যেখানে ও বেঁচে থাকতে পারে? আর এর ছেলে এবার আর ফিরে আসবেনা, সে যেখানে গেছে সেখান থেকে কেউ ফিরে আসেনা। নতুন চকের সমস্ত খত্রীদের মেরে ফেলা হয়েছে। একটা প্রাণীও বেঁচে নেই।"

বউয়ের মুখে আঁধার নেমে আসে। কাঁপা আঙ্গুল ঠোঁটের উপর রেখে সে বলে, "একটু আস্তে কথা বলতে পারোনা তুমি—ওকে শুনিয়েই ছাড়বে যে ওর ছেলে মরেছে?"

এ পর্যন্ত তারা ফিসফিস করে কথা বলছিল কিন্তু তার কোনো দরকার ছিলনা। তারা যত জোরেই কথা বলুক কিচ্ছু শুনতে পাবেনা।

বুড়ি জ্বরে লাল টকটকে চোখে ওদের দু'জনের মুখের দিকে তাকায়, বিরক্তিভরা সুরে বলে "তোমরা দু'জনে কি কানাকানি করছো? এই দীনু, আমার দিকে তুই তাকাচ্ছিস না কেন? ওরে হতভাগা, এটাকে মেরামত করে দে। এটা এমন কিছু বড় কাজ নয়।"

"কালকে আসিস মাঈ" বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দীনা চেঁচায়, "আজ আমার ফুরসৎ নেই। আর যা, এবার তোর বাড়ি যা।"

"আচ্ছা" হাঁটুতে হাত রেখে বুড়ি উঠে দাঁড়ায় ও কেঁকিয়ে বলে, "উঠছি। তুই বলছিস কাল। কালই সই। আমার ছাগলের কথা কিন্তু মনে রাখিস। নে, আমি বলে যাচ্ছি, ছাগলীটা দেখলেই বেঁধে রাখিস। জানিনা হারামজাদী কোথায় কোথায় পালিয়ে বেড়ায়।"

দীনার বউ তাকে আটকাবার আগেই বুড়ি টলতে টলতে বাইরে গলিতে বেরিয়ে যায়।

এই বুড়ি তার কতখানি সময় নষ্ট করে গেছে। কাজে ক্ষতি হওয়ার দরুণ দীনার খুব খারাপ লাগছে। এতক্ষণে সে পাঁচখানা টাঙ্গি তৈরী ক'রে ফেলতো। কোন ঝঞ্ঝাটে সে নিজের মাথা খারাপ করছিল বশির তা জিজ্ঞেস করবেনা। সে তো গুনে গুনে পঞ্চাশটা টাঙ্গি নেবে।

দীনা চাইছিল সে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু পারেনা। তার বুকে একটা আতংক জমাট বাঁধছে। শাদা চুলের নড়বড়ে গোছা ও জ্বরে তপ্ত ছ'টো চোখ বারে বারে তার মনে পড়ে যাচ্ছে। আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ ছ'টো তার মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। বুড়ি কিছুই জানেনা। এটাই তাকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত ক'রে তুলেছে। জানেনা যে তুলসী আর ফিরে আসবেনা, প্রীতোর বিয়ের লগ্ন আর আসবেনা, প্রীতোকে তার বাপের অট্টালিকা সমেত বশির গ্রাস করেছে।

এটা ভীষণ খারাপ করল বশির।

মা বোনের ইজ্জৎ সবার কাছেই সমান। পরের মেয়ের ইজ্জৎ নিজের মেয়ের ইজ্জতেরই মান আর এমন কে আছে যে নিজের বেটির বেইজ্জৎকে সবাব (পুণ্য) বলবে?

অকস্মাৎ দীনার স্মৃতিতে ভয়ংকর একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে। বাপের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে প্রীতো ডাক ছেড়ে কাঁদছিল, বশির তার চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রীতো আকুলি-বিকুলি ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছনে ঘষটে ঘষটে চলেছিল। তারপর হঠাৎই সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যেমন কোরবাণীর একটু আগেই ভেড়া চুপ করে যায়।

এদিকে দীনা, বশিরের বাপ দরজায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ এই বীভৎস দৃশ্য দেখছিল। সে বশিরকে বারণ করেনি, তাকে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলেনি, নিজের বেটির ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য সে কিছু করেনি।

প্রীতোর পাণ্ডুর শিশুর মত মুখের আদল দীনার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, তার কান্নাকাটি তখনো তার কানে বাজছিল। সহসাই তার শরীর অদ্ভুত এক কাঁপুনিতে থরথর ক'রে ওঠে—ভীষণ কাঁপুনি। তার মনে হয় এই কাঁপুনি দূর করার একমাত্র উপায় হাপর থেকে জ্বলন্ত লোহাগুলো উঠিয়ে যদি সে বুকে চেপে ধরে কিন্তু তার মাথা এত তেতে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন সমস্ত চুল্লী তার মাথায় ঢুকে পড়েছে। মাথাটা সে দু'হাতে চেপে ধরে। তার হাত দু'টো যেন গরমে ঝলসে যায়।

তার মনে হয় সে পাগল হয়ে যাবে। কিছু ক'রে বসবে। তার উচিত ছিল দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়া—এসব থেকে অনেক দূরে। সে নিঃশব্দে জানালাটা খোলে ও লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে সে মাঠে মাঠে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। বিকেল সন্ধ্যায় গড়ায়। দিগন্তে কেউ সূর্যকে খুন করেছে। সমস্ত আকাশ নিরপরাধের খুনে লাল। এ রক্ত কুয়োর পাশের চৌবাচ্চা ও ক্ষেতের নালার জলেও মিশে রয়েছে। কে চুষবে সেই আখ যাতে রক্তের ছিটে পড়েছে, কে পরবে সেই কাপাসের কাপড় যাকে রক্ত মেশা জল সেচ করা হয়েছে আর শোণিত-সিক্ত ক্ষেতে গমের ফসল কি ধরণের হবে ?

তার হাতে তৈরী টাঙ্গি দিয়েই চারদিকে রক্ত ছিটোনো হয়েছে। তার হাতে তৈরী বল্লম ও কাটারি দিয়ে হাড়-মাংসের এই ফসল বোনা হয়েছে আর দু'-চারটে গাঁয়ে যারা বাকি আছে তাদের জন্য সদ্য সদ্য সে টাঙ্গি তৈরী ক'রে এসেছে। কাল রাত পর্যন্ত সে সব গাঁও সাফ হয়ে যাবে।

সে গুনাহ করেছে, ভীষণ পাপী সে। বশিরের মা ঠিকই বলেছিল যে নতুন তৈরী টাঙ্গিগুলো বশির ও তার সঙ্গীদের হাতে তুলে দেওয়া তার উচিত হয়নি। এ করলে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারতোনা। কিন্তু এখন সে আর কি করতে পারে ?

সে ঊর্দ্ধশ্বাসে গাঁয়ের দিকে দৌড়োয়। বশিরের লোকদের পৌছোনোর আগেই সে বাড়ি পৌছে যেতে চায়, টাঙ্গিগুলো কোনো কুয়ো বা পুকুরে সে ফেলে দিতে চায় যাতে কেউ আর তাদের খোঁজ পেতে না পারে।

যখন সে গাঁয়ের কাছে গিয়ে পৌছোয় রাত নেমে এসেছে— চাঁদের স্নিগ্ধ ম্লান আলো গলির বাড়িগুলোর উপর অস্পষ্ট ছায়া ফেলছে। রাত্রে বৃষ্টিতে গলিতে কাদা হয়েছে। বার বার তার পা দু'টো কাদায় ডুবে যায় কিন্তু সে দ্রুতবেগে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অল্প দূর থেকে একটা কিছুর শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দগুলো তারই বাড়ি থেকে আসছে। তাহলে কি তারা এসেছিল? বড় খারাপ সময়ে সে এখানে এসে পৌছেছে। বশিরের নোংরা হাসি শোনা যাচ্ছে। বাড়ির বাইরে কোনো ভারী জিনিষে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। উঠতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলনা, বরফের মত কোনো ঠাণ্ডা জিনিস তার পায়ে জড়িয়ে গেছে। পা ছাড়াবার চেষ্টা করলো তবু পায়ের কাছে সেই বন্ধন যেন আরো আঁকড়ে ধরলো। হঠাৎ সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। একটা ভুতুড়ে ভয়ে তার বুক হিম হয়ে যাচ্ছে ও তার কপাল থেকে ঠাণ্ডা ঘাম চুইয়ে পড়ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল। জ্যোৎস্নায় শাদা চুলের কিছু গোছা উড়ছিল। বুড়ির বলিরেখা কুঞ্চিত কপালে টাঙ্গির একটা লম্বা ঘা এবং তার ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটো যেন ভর্ৎসনা করছে। দীনু নিজের পায়ের দিকে তাকাল। বুড়ির হাতের শেকল তার পায়ে জড়িয়ে গেছে।

তার মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। সেদিন রাত্রে তার ভীষণ জ্বর এলো। রাত ভোর সে বিকারের ঘোরে খাট থেকে দু-দুহাত উঁচু লাফিয়ে লাফিয়ে

উঠছিল। গ্রামের নির্জন স্তব্ধতায় সমস্ত রাত তার প্রলাপ প্রতি-ধ্বনিত হতে থাকে, "আমাকে মেরোনা, আমাকে টাঙ্গি দিয়ে মেরোনা। আমার কোমর থেকে শেকল খুলে নাও। আহা, আমার বেটি। আমার বেটিকে কিছু বলোনা। প্রীতোকে কিছু বলোনা। উফ্, এই শেকলগুলো। আল্লার দোহাই, আমাকে টাঙ্গি দিয়ে কুপিওনা। আমাকে মেরোনা।

ভাগ্যের সুতো

সারা গ্রাম প্রতীক্ষা করছে পরতাপী সাধুর জন্য—কখন তার চরণধূলি গ্রামে পড়বে আর কখন সে এখানকার গরু-মোষদের মন্ত্রবলে রোগমুক্ত ক'রে দেবে। তেজু মজহবীর* মনে হয় তার ভাগ্যের সুতো সেই সাধুর হাতেই আছে। ক্ষেতখামারের লোকেদের লংকা গাছে ফুল ফুটেছে। কেউ নিজের আখের ক্ষেত নিড়োচ্ছে কেউ বা ধানের ক্ষেত থেকে আগাছা উপড়ে ফেলছে। কিন্তু তেজুর কাছে তার বিল্লো ছাড়া আর কিছুই নেই।

গ্রামে প্রতিদিন কিছু গরু-মোষের কান শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তারা সবুজ চারা খাওয়া বন্ধ করে, তাদের চোখ পিচুটিতে ভরে যায় তারপর কিছুক্ষণ পরেই তাদের মুখ হা হয়ে যায়, মুখ থেকে গাঁজলা বেরুতে থাকে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মনে হয় গলায় কিছু আটকেছে। লোকেরা কত কি উপায় বের করলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। গ্রামের অনেক গরু-মোষ মারা গেছে।

সবচেয়ে সর্বনাশ এই যে, গ্রামের দুধ দেওয়া ও সেরা জানোয়ার গুলোই এই অসুখে পড়ছে। জানোয়ারদের দলে যে পশুটা সবচেয়ে সুন্দর মনে হয় তারই মাথায় এই রাহু ভর করে।

গ্রামের কিছু লোক বলে, সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়ো, এবার ব্লকের কর্তাদের কাছে দরখাস্ত ক'রে সমস্ত পশুকে টিকে লাগিয়ে নাও।

বুড়োর দল এ পরামর্শ মানে না, "ও সব টিকে—ইন্‌জেক্‌শনে কিছুই হবে না।"

"সরকারী কাজে আঠারো মাসে বছর—সেই কচ্ছপ-গতির কথা সকলে জানে।"

"প্রথমে সমস্ত গ্রামকে দিয়ে সই করাবে তারপর দরখাস্ত পাঠাবে ?"

* মজহবী—মেথর

"না জানি কতদিন ধরে এ দরখাস্ত আপিসে আপিসে ঘুরে বেড়াবে তারপর চাই কি গত বছরের মতো পশু-ডাক্তার মাথা নেড়ে বলবে —টিকে লাগাবার ওষুধই নেই।"

শেষ পর্যন্ত যারা টিকের রব তুলেছিল তারাও সাধুর শরণ নিতে রাজী হয়ে গেল। সে সাধু বড়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। এখন বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু শোনা যায় যৌবনকালে তার ডেরায় যাতায়াত করতো এমন এক যুবতীকে জড়িয়ে ধরে তার বদনাম হয়েছিল। এই গোলমালের অব্যবহিত পরেই সাধু নিজের ইন্দ্রিয় কেটে ফেলেছিল....

আজ গ্রামের মোড়ল মুরুব্বিরা এই সাধুকেই নিয়ে আসতে গিয়েছিল।

আগে লোকেরা সাধারণতঃ নিজের জানোয়ারদের গালাগালি দিত, "তোর মাথায় বাজ পড়ুক" কিন্তু কিছুদিন থেকে কারুর মুখে এ কথা শোনা যায়না।

তেজু মজহবী আগেও কখনো নিজের মোষের বাচ্চাকে এ গালাগালি দেয়নি। সে নিজের বিল্লোকে পালন-পোষণ ক'রে বড় মহিষী ক'রে তুলেছে। যখন সে রুটি খেতে বসে বিল্লো তার দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসে। তেজু তাকে ছোট ছোট গরাস খাইয়ে বাচ্চার মতই বড় ক'রে তুলেছে। যেখানেই থাকুক না, বিল্লো তাকে দেখলেই হাম্বারবে স্বাগত জানাতো। মনে মনে বিল্লো যেন জানতো যে, চেতেশাহ ধার শোধ করার জন্য তেজুকে বড় জ্বালাতন করছে তাই সে সাড়ে তিন বছর বয়সেই একটা ছানা প্রসব করলো।

চেতেশাহ খুব চাপ দিয়েছিল যে, তেজু তার হাতে বিল্লোকে সঁপে দেয় এবং তার বদলে ঋণের খাতায় সেই পাতার সব হিসেব সে শূন্য করে দেবে। কিন্তু তেজু বিল্লোর গায়ের একটি লোমও কাউকে দিতে প্রস্তুত নয়। বিল্লোর বাচ্চা হতেই সে জোউলে গোয়ালার কাছ থেকে একশো টাকা আগাম নিয়ে চেতের ধারের

একটি কিস্তি শোধ ক'রে দেয়। বছর খানেকের মধ্যেই সে তার ধার কর্জ সব শোধ ক'রে দিতে পারবে, এটাই আশা ছিল।

কিন্তু এখন গ্রামে কারো মাদী বাছুর মারা গেছে, তাদের মোষ দুধ দিচ্ছিল না; কারো কারো মোষও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তেজুও বড় ভয় পাচ্ছিল—কিন্তু পরতাপী সাধুর উপর তার খুব বিশ্বাস।

যারা সাধুকে ডাকতে গিয়েছিল নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। তাদের সঙ্গে একজন সাধু এসেছে কিন্তু সে পরতাপী নয়—তার বড় চেলা। এদের পৌঁছোনোর পূর্বেই অন্য কোনো গাঁয়ের লোকেরা পরতাপী সাধুকে নিয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত গ্রামে ক্যানেস্ত্রা বাজিযে ঘোষণা ক'রে দেওয়া হোল:

"ভাই সকল, পশুদের চিকিৎসার জন্য সাধু এসে গেছেন। পঞ্চাযেতের আদেশ: রাত্রি দশটা থেকে সকাল পর্যন্ত, যতক্ষণ গাঁয়ের সমস্ত পশুর চিকিৎসা না হযে যায় কেউ বাতি জ্বালাবে না আগুন জ্বালাবে না। কূয়ো থেকে জল ভরবে না, হ্যাণ্ড পাম্প চালাবে না, কেউ গাঁ ছেড়ে বাইরে যাবে না, কেউ বাইরে থেকে গাঁয়ে ঢুকবে না। যে এ নিয়ম ভাঙবে সে সমস্ত গাঁয়ের কাছে অপরাধী। তার মুখ কালো ক'রে গাধায বসানো হবে ও তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে।"

চেতেশাহের দোকান থেকে সাধু আধ গজ হলোয়ান (লাল-কাপড়) নারকেল ও হোম করার জিনিসের কৌটো নিল। শাহ দু'সের খাঁটি ঘিয়ের বন্দোবস্তও করলো। এ সমস্ত জিনিস প্রায় পঁচিশ টাকার কিন্তু চেতেশাহ হাসিমুখে ধার দিয়েছে। সকাল পর্যন্ত সাধুর কাছে গমের পাহাড জড়ো হয়ে যাবে।

সাধু একটা আনকোরা নূতন কলসী আনায়—তার নিচে একটা ছেঁদা ক'রে নেয়। তারপর একটা বাটলোইতে মন্ত্র পড়ে জল ও দুধ ঢালে। চার পাঁচটি যুবক বাটলোই ও কলসী ওঠানোর জন্য সাধুর কাছে দাঁড়ায। সাধু পবিত্র জল ও দুধ বাটলোই থেকে

কলসীতে ঢেলে দেয় এবং সেই কলসী গাঁয়ের বাইরে ঘুরিয়ে এনে একটি সীমারেখা এঁকে দেওয়া হয়।

এই রেখার ওপারে কেউ যেতে পারবেনা, ভিতরেও কেউ আসতে পারবেনা এর ভিতরে যে ভূত-প্রেত্ত আছে, সাধু তুকতাক ক'রে তাদের পুড়িয়ে মারবে। কোনো ভূত বা প্রেত এই রেখা নিজে থেকে ডিঙোতে পারবেনা। কিন্তু যদি কোনো মানুষ এই রেখা ডিঙোয় তাহলে তার সঙ্গে ভূতপ্রেতের ভিতরে চলে আসার ভয় আছে। আজ যাদের ক্ষেতে জল দেওয়ার কাজ আছে—মাঝরাতেই হোক্ বা শেষ রাতে—তারা সবাই আগে থেকেই গাঁয়ের বাইরে চলে গেছে।

সাধু ধূনি জ্বালিয়ে নিয়েছে। মন্ত্র পড়ে খাঁটি ঘি ও অন্যান্য সামগ্রী আগুনে ফেলছিল। গ্রামের গুরুদ্বারার 'ভাই' ও মন্দিরের পুরুত নিকটেই বসে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করছিল। 'ভাই'রা জপজী সাহেবের একশোবার পাঠ করবে।

চটপটে-চালাক লোকদের পাঁচটা দল বানানো হলো, প্রত্যেক দল নিলো এক একটা পাত্র। সাধু হোমকুণ্ড থেকে কিছু আগুন বের করে পাত্রতে রাখে ও তার উপর ধুনো ছিটিয়ে দেয়। সুগন্ধ ছড়ানো পাত্র হাতে নিয়ে দলগুলো গ্রামের জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

সবাই আগে থেকে দরজা খুলে রেখেছিল নিজের নিজের বাড়ির। কোনো দরজা বন্ধ থাকলে লোকেরা তা খুলিয়ে পশুর নাদায় ধুনো দিয়ে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এদিকেও নজর রেখেছিল—পঞ্চায়েতের হুকুম কেউ অমান্য করেনি তো।

বশির চামারের উপর সবাই কড়া পাহারা দিতে বলেছিল। জানোয়ার মরলে তার লাভ। যখন ধুনো দেওয়া দল তার বাড়িতে পৌঁছোয়, দেখে তার দুটো দরজাই খোলা ও সে জেগে রয়েছে। সে বলে, "ভাই, আপনারা যখন ইচ্ছে এসে নিজেদের মনের সংশয়

দূর করতে পারেন—আমি গাঁয়ের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে পারিনা।”

ওদিকে সারা রাত ধরে চলে হোম ও পাঠ। । এদিকে এই দলগুলো সারারাত ধরে গ্রামের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত পর্যন্ত সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেল।

ভোরবেলা সাধু মঙ্গলাচরণ পাঠ করলেন তারপর সারা গ্রামের সমস্ত পশুকে রোগশূন্য করার সময় হল।

সাধুর সামনে দুধে-জলে মেশানো একটা বড় কড়াই। যে বড় বাঁক দিয়ে সমস্ত গরু-মোষ এখানে আসবে সেখানে গলির এপার ওপার প্রায় কুড়িটা নতুন মাটির সরা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

প্রত্যেকেই উতলা। প্রথমে তার পশুর কাজ হয়ে গেলে ছুটি। প্রত্যেক জাতের মোষ সেখান থেকে বেরোয়। প্রথমে বোলী মোষ, তারপর বিল্লিয়াঁ, তারপর একে একে পঞ্চকল্যাণী, সিউয়ারী ও কুণ্ডিচূর। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কারুর মোষ হারালো তো কারো বাছুর। চারিদিকে ধূলোয় ধূলোময়। প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন ক'রে লোক নিজের মথানী, ঘটি এবং লেজ-প্রতি এক পোয়া গম কাপড়ে বেঁধে আনছে।

যখন পশু সাধুর কাছে গিয়ে পোঁছোয় তখন সাধু ও তার রাত্রের সঙ্গী 'ভাই' ও 'পণ্ডিত' সামনের কড়াইয়ের জলে কুশ ভিজিয়ে পশু ও মথানীর উপর ছিটোয়। একটা লোক সবার উপর একটু পবিত্র জল ছিটোচ্ছিলো। সেই জল নিয়ে সবাই নিজের কোঁচড়ে বাঁধা গম একটা স্তূপের উপর ঢেলে দিয়ে চলে যায়।

গমের এই স্তূপ একজন সাধারণ কৃষকের সম্বৎসরের ফসলের স্তূপের আকারের হ'ল।

যখন সমস্ত গ্রামের যাবতীয় পশুকে পবিত্র করা হয়ে গেল তখন গিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে উনুন জ্বালানো হল, দই মথন করা শুরু হল ও কুয়ো থেকে জল তোলা। এর পূর্বে যেখানে সাধু বসেছিল

সেখানেই মেলার ভিড় হয়েছিল। সমস্ত গ্রামটা জনশূন্য ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল যেন কোনো দৈত্য সেদিক দিয়ে হেঁটে গেছে।

সাধুর কাছে প্রায় মণ তিরিশেক গম জমা হয়েছে। চেতেশাহের কাছ থেকে আনা ঘি ও সওদার দরুণ তাকে দু'মণ গম দিয়ে দেওয়া হল। বাকী গম দু'টো গরুর গাড়ীতে বোঝাই ক'রে সে নিজের আস্তানার দিকে রওনা হল।

একটা দল ধরে আনলো হরনাম মহরাকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে পঞ্চায়েতের আদেশ অমান্য করেছে। সমস্ত পশু মুক্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই সে স্নান ক'রে ফেলেছে।

"না, এ একেবারে মিথ্যে কথা। আমার মোষদের মুক্ত হবার পরই আমি চান করেছি। সাধুর কাছেই না হয় জিজ্ঞেস ক'রে নাও।"

"সাধু চলে যাওয়ার পর ব্যাটা মিথ্যে ভান করছে।"

"সাধু আবার কি জানে? হাজার হাজার পশু ও মানুষ তার সামনে দিয়ে গেছে। সে আবার কাকে চিনবে?"

"বেশ আমরা মেনে নিচ্ছি যে, তোর জানোয়ার মুক্ত হবার পর তুই চান করেছিস কিন্তু সে সময় পর্যন্ত কি গ্রামের সমস্ত পশু মুক্ত হয়ে গিয়েছিল?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হরনাম দিতে পারলো না।

একটা গাধা আনা হল।

একজন দৌড়ে গিয়ে ভুষোকালি নিয়ে এলো।

ওরা হরনাম মহরাকে গাধায় চড়িয়ে বোধ হয় দু'-এক চক্কর লাগিয়েছে ইতিমধ্যে আর একটা দল দৌড়োতে দৌড়োতে এলো।

"গাধাটাকে এখানেই আটকে রাখো। মোটা আসামী ধরা পড়েছে।"

"রামসুন্দর রাত্রে বাতি জ্বেলেছিল।"

"বাতি নয়, বিজলী বাতি।"

রামসুন্দর গ্রামের জামাই—এখানে সে মুদিখানা খুলেছে। বড়

ভালোমানুষ ও লেখাপড়া জানা লোক। কংগ্রেসী মতে বিশ্বাসী হওয়ার দরুণ কৃষকরা তাকে সরকারী দালাল মনে করে ও তাদের শত্রু। খদ্দরের শাদা কাপড় পরে সে কোথাও যাচ্ছিল—বন্তার দল তাকে ধরে ফেলেছে।

ঘামে নেয়ে উঠে রামসুন্দর সবার সামনে দাঁড়িয়ে কাকুতি করে, "আমায় গাধায় চড়িও না, আর যে কোনো সাজা দিতে চাও দাও।" কাঁপা হাতে সে পাঁচটা দশ টাকার নোট গোনে।

"একে ছাখো, বলে কিনা গাধায় চড়িও না। এ কি পীর না পয়গম্বর?"

ছ'পাশে ভিড় জমে যায়। যাদের পশু মারা গেছে, তাদের খুব রাগ হচ্ছিল।

"কি দিনকাল পড়েছে! গ্রামের কোনো আচার-বিচার নেই?"

"আচার-বিচার গোল্লায় গেছে। তাই তো রোগ ব্যাধি বাড়ছে।"

"পাতানাড়া বামুন ও কুকুর মাহারারাই যত অকাজ-কুকাজ করে। হাজার হাজার টাকার মোষ মরে যাচ্ছে কিন্তু এদের কোনো কিছুরই পরোয়া নেই।"

ছেলে ছোকরাদের দল কখনো গাধাকে কখনো রামসুন্দরকে হুশ্ হুশ্ করতে থাকে। ভিড়ের মধ্যে লোকেরা তাকে এমনিতেই ঠেঙিয়ে দিত।

ছ'জন বুড়ো লোক মাঝখানে পড়ে বলেন, "বাবারা এ হলো গাঁয়ের জামাই, একে মাফ করে দাও।"

"এ্যাঁ, বলে কিনা গাঁয়ের জামাই। জামাই এ লুভায়া বামুনের। আমাদের সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই।"

"হ্যাঁ, থাকলেও শালা হতে পারে।"

"পঞ্চাশের বদলে ষাট টাকা উশুল ক'রে নাও কিন্তু গাধায় বসিও না।"

"হরনামা কি মানুষ নয়, ওকেও তো আমরা গাধায় বসিয়েছিলাম?"

"আমরা এই শাদা পোষাকের রেয়াৎ করা চলতে দেবনা। রব্বের (ঈশ্বর) সামনে সবাই সমান।" কমরেড বলে। বন্তা জাঠ পূর্বে কমরেডদের পার্টিতে ছিল। একবার কৃষক আন্দোলনে জেল খেটেও এসেছে। তারপর পাকিস্তান হওয়ার সময় মুসলমানদের জিনিস লুট করার জন্য সে কমরেডদের পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে ছিল। এখন সে বর্ডারে ব্ল্যাক করে কিন্তু গ্রামের সবাই তাকে কমরেড বলেই ডাকে।

"বেশ এই করি—হরনাম মাহারাকে জিজ্ঞেস করছি। যদি সে মাফ ক'রে দেয় তাহলে মনে করে নাও আমাদের তরফ থেকেও ও মুক্ত।"

হরনামকে ডাকা হল। তার মুখ থেকে এখনো ভুষোর কালি পুরোপুরি মুছে যায়নি। লোকে হাসতে থাকে।

হরনাম ঝাঁজিয়ে বলে ওঠে, "ভাই সকল, যদি আমার ইজ্জৎ এর থেকে অধম হয় তাহলে একে মাফ করে দাও। কিন্তু যদি আমার আর ওর ইজ্জৎ তোমরা সমান মনে কর তাহলে একে সেই সাজাই দাও যা আমাকে দিয়েছ।"

সবাই রামসুন্দরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেলে ছোকরারা খুব হুড়্দুম করে। গাধার পিঠে আবার গদি বাঁধা হয়।

এই বলে যে রামসুন্দর গ্রামের জামাই বুড়ো ছ'জন ছোকরাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয় যে, মুখে কালি মাখানো হবেনা।

কমরেড ও তার সঙ্গীরা রামসুন্দরকে ধরে গাধায় বসিয়ে দেয়।

"এর মুখে ভুষো মাখাবার দরকার নেই, ছাখ এর মুখ এমনিতেই কত কালো হয়ে গেছে।"

"কি ভাই লালাজী, বাজার দর কেমন?"

"এবার খবরের কাগজের কোনো খবর শোনাও! কেমন মিঠে মিঠে বুলি ঝেড়ে নিজের সরকারের গুণ-কেত্তন করে।"

ছপুর নাগাদ এ উৎপাত শেষ হতে হতে খবর আসে গ্রামের ছ'টো মোষ মারা গেছে।

চৌকির উপর বসে সবাই পরামর্শ করতে শুরু করে।

"এই যে নিয়ম অমান্য করে যারা, তারা চিকিৎসাই হতে দেয়না। ব্যাধি যাবে কেমন করে?"

"আমি আগেই বলেছিলাম। সাধুকে ছাড়, ডাক্তারকে দিয়ে টিকে লাগাও।"

"ও তো ছিল ভণ্ড সাধু। সাধুদের বদনাম করে তো এরাই। পরতাপী সাধুর জুড়ি কেউ নেই।"

"রাত্তিরে এ সাধু একটু একটু পিনিক নিচ্ছিল। আমার বাড়ির কাছে যে 'ভাই' থাকে সে বলছিল।"

"ভাই, তুমি তো নিজের মাথায় পাপ নিচ্ছ"—যারা সাধুকে ডেকে এনেছিল তাদের মধ্যে একজন বলে।

"কিন্তু দান করা গম থেকে সে দু'মণ গম চেতেশাহকে ঘি ও অন্যান্য সওদার বদলে কেন দিয়ে গেল? গ্রামের দান করা জিনিসের যদি এক কণাও গ্রামে থেকে যায় তাহলে পুণ্যি কোথায়?"

"এতটুকু বুদ্ধি তো ওই ছোটলোক চেতুর ঘটে থাকা উচিত। কেন সে ওই গম নি ? পয়সা তো আর পালিয়ে যাচ্ছিল না, কাল পরশু ওর আস্তানা থেকে নিয়ে আসতো—ওর আস্তানা বিলেতে নয়।"

"এই দোকানদারদের কথা আর ব'লনা। এরা শুধু পয়সা চেনে, অন্য লোক সর্বস্বান্ত হয়ে যাক—এরা নিজেদের হিসেব বুঝে নেবে।"

"আমি তো আবার অন্য এক কথা শুনেছি। ঠাকুরবাড়ির চৌরাস্তায় রাত্রে ষাঁড়ের মাথা রেখে কোনো মেয়েলোক চান করে গেছে।"

"কোনো সাধু হয়তো ছেলে হওয়ার বিধি—বিধেন বুঝিয়েছে। যদি কোনো মেয়েলোককে কেউ গুণ ক'রে থাকে তাহলে ভাগাড়ে হাড়ের ডাঁই থেকে ষাঁড়ের মাথা উঠিয়ে এনে...।"

হঠাৎ কারো করুণ বিলাপ শোনা গেল। কাছে এলে বোঝা

গেল তেজু মজহবী শোকে পাগল হয়ে 'আমার বিল্লো—আমার বিল্লো' এই বলে চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে সে তার পুরো কথা বলে। "বাইরে থেকে চরে ফিরেছিল। কান ঢিলে...চোখে পিচুটি...কাঁদুনে মুখ।...আমার হাত থেকে রুটিটুকু খেলো না...গলা বাড়িয়ে দিলে। ওকে খাঁটি ঘিও দিলাম কিন্তু ও লাফিয়ে একদিকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—কত জবর মোষ ছিল। আমি আমার বিল্লোর একটা চুল পর্যন্ত....।"

সবাই তেজুকে সহানুভূতি জানায় ও বোঝায় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা সে যেন মেনে নেয়।

"আমার মনে হয় পরতাপী সাধু না এলে এ গাঁয়ের বিপদ দূর হবে না। তাঁর অপার মহিমা। যে নিজের ইন্দ্রিয়ই কেটে ফেলেছে....।" পঞ্চায়েত প্রধান বেশ ভারিক্কী চালে বলে।

"আমার কথা যদি শোনো তাহলে বলি, পরতাপী সাধুকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দাও। সকাল পর্যন্ত যদি এ ব্যাপার মুলতবী রেখে দাও তাহলে কালকের মত কেউ এসে ওকে আগে থেকে ডেকে নিয়ে যাবে।"

সমস্ত গ্রাম পরতাপী সাধুর প্রতীক্ষায়—কখন তার পায়ের ধুলো গ্রামে পড়বে ও সে পশুগুলোকে রোগমুক্ত করবে। কিন্তু তেজু মজহবী এখন আর কারো প্রতীক্ষায় নেই—তার ভাগ্যের সুতো ছিঁড়ে গেছে...।

মোতি

“নে, তোকে মোতি দিচ্ছি।” বিষণ্ণ দিত্তা ধীরে ধীরে নিকটে এসে বউয়ের পায়ের দিকে একটা দশ দিনের কুকুরছানা এগিয়ে দিলো।

রকৃখী পিঁড়ির উপর বসে ছিল—একেবারে কুঁকড়ে গেল, “মোতি...?” তার চিৎকারে প্রকাশ পেলো বহুদিনের ঘৃণা।

তারপর যখন সে বাচ্চাটির চোখের দিকে তাকাল তার মনে হল, চোখ দুটো যেন টলটলে মদির পেয়ালা বা মিছরি ভরা গেলাসের মতন। পর মুহূর্তেই সে কুকুর ছানাটাকে কোলে চেপে ধরল।

দেশ বিভক্ত হবার সময় যখন মারামারি কাটাকাটির সর্বনেশে খবর ছড়াতে সুরু করল ও লোকেরা নিজের বাক্স-প্যাটরা নিয়ে দিগ্বিদিকে পালাতে লাগল তখন অন্তরঙ্গ এক বন্ধু এসে দিত্তাকে পরামর্শ দিল “তুইও পাকিস্তান চলে যা।” কিন্তু দিত্তা কাঁধ শক্ত ক'রে ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকালো যেন বাবলা কাঁটা বিঁধে যাওয়ার মত কোনো গালাগালি শুনেছে। তার বাপ, দাদু, ঠাকুদার ঠাকুরদাও এখানে ছিল। তাঁদের শরীর মাটি হয়ে গম ফলেছে, জোয়ার জন্মেছে, আখ হয়েছে এবং কে বলতে পারে সেই মাটির কতটুকু অংশ বধাওয়াসিং-এর রক্তে আছে আর কতটুকু জগনার কলিজার।

শিশু গাছের গুঁড়ির মতো ছ-ফুট লম্বা তার এক ছেলে কোনো পুলিস অফিসারে সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে—গান্ধী মহারাজের নামে বাজে গালাগালি সে সহ্য করতে পারেনি—আর কোন বেজায়গায় চোট লাগায় কে জানে কোথায় মারা গেল। তার ফুলের (হাড়ের) যদি একটা টুকরো সে কোথাও পেত তাহলে তাবিজ বানিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতো। কিন্তু ফুলের গন্ধ পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছয়নি। তার মেজ ছেলে ছিল ভদ্র ও সভ্য, তার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন। নতুন লুঙ্গী জামা পরে সে মামাবাড়িতে দেখা করতে

গিয়েছিল—সেখান থেকে আর ফিরে আসেনি। বচিওর দিব্যি দিয়ে বলেছিল সে তার লাশ সরহিন্দের খালে ভেসে যেতে নিজের চোখে দেখেছে। হয়তো কোনো শিখদের দলই তাকে কেটে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কোনো মোমিনই বা তাকে হালাল করেনি কেমন করে বলবে? তখন কারই বা ছিল ধর্ম কারই বা খোদা। এখানে কাহলাসিং শুধু সম্পত্তির জন্য দাওয়ায় শুয়ে থাকা নিজের ভাই পোর গলা কেটে ফেলেছিল—ভেবেছিল, লোকে ভাববে কোনো মুসলমানেরই কীর্তি।

মানুষ বেঁধে নেবে নিজের বোঁচকা-বুচকি, উঠিয়ে নেবে নিজের বাক্স-প্যাটরা কিন্তু স্থানে স্থানে ঘুমিয়ে থাকা তাদের আত্মীয় স্বজনদের আত্মার বিষয়ে কি করবে?

"এঁরা বলেন, আপনি পাকিস্তান চলে যান", দিত্তা হাসতে হাসতে করুণ হয়ে ওঠে। "কার কাছে যাব পাকিস্তানে! সেখানে কি আছে আমার?"

তারপর চারিদিকে যখন আগুন বেড়ে উঠলো তখন গ্রামের বিচক্ষণ লোকেরা আল্লাদিত্তাকে ডেকে বললো, "আর কিছু নয় তো নিজের নামই পালটে ফেল। কে বলতে পারে কখন বাইরের গুণ্ডারা এসে হামলা ক'রে বসে। তোর পূর্বপুরুষরাও তো আগে নথু, ভোলু এই সবই ছিল, মক্কা থেকে তো কেউ আসেনি। এতে কী যায় আসে?"

"এ জানোয়ারের মাংস কি ওই জানোয়ারের মাংস—তোর কি সম্বন্ধ এর সঙ্গে—খাস তো নুন দিয়ে রুটি—বড়জোর পেঁয়াজ দিয়ে। খুবই সামান্য ব্যাপার।"

দিত্তা নিজের মনে শলা করে, এত লোকের কথা মেনে নেয়।

পরে সে অনুভব করে যে, নাম বদলানোয় কিছুই তফাৎ হয়নি। আগে লোকেরা আল্লাদিত্তাকে দিত্তা বলে ডাকতো, এখন হরদিও সিং বলে ডাকতে শুরু করেছে। বউয়ের নাম আগে ছিল রক্‌খী, এখনো রক্‌খীই রয়ে গেল।

কিন্তু গ্রামের কয়েকটা কুঁড়ুলে ছোকরা দিত্তা হতভাগা, দিত্তা হারামজাদাকে এভাবে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেওয়াতে গররাজী ছিল। বলত, আমরা এই দীন-ধর্ম বদলানোর ব্যাপার জানিনা। হয় এ কুমোর সোজা এখান থেকে বিদায় হোক্ নইলে আমরা বুঝবো আর আমাদের হাতিয়ার বুঝে নেবে।

কোনো বিচক্ষণ লোক এসে দিত্তাকে ইঙ্গিত দিয়ে যায়, তুই নিজের কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র সব নিজের কাছে রেখে নে, শুধু ঐ চারটে গাধা ওদের দিয়ে দে। এরা জেদ ধরেছে যে, আমরা তোর ভাই হওয়ার খুশীতে, আমাদের দেশে থেকে যাওয়াতে একটু আনন্দ-উৎসব করবো। দিত্তা আনন্দে মত্ত। "বাহ-ভাই, আমাকে সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ও ভাই বানাবার যদি এদের এতই উৎসাহ তো শালার গাধা তো গাধা আমি আমার চার হাত-পা কেটেও এদের দিয়ে দিতে পারি।"

বোঝা বইবার ভাড়া থেকে যা' দু'টাকার আমদানি হত তা' গাধার সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু দিত্তা বেকার রইলনা। ভদ্র-লোক নতারাসিং তাকে ভাত-কাপড়ের বদলে নিজের গরু-মোষগুলোর দেখাশোনার ভার দিল। এমন কি নগদ পনেরো টাকাও দিতে রাজী হল—ফসল কাটার পরে—টুকিটাকি খরচের জন্য।

পঞ্চান্ন পেরিয়ে আসা রক্‌খী এ বাড়িতে তুলো ধুনে দেয়, কারো গম পিসে দেয়, ধান ভানে, দেয়াল লেপে দেয়। এত সব করার পরেও পোয়াটাক আটা তার হাঁড়িতে থাকে কি থাকেনা। এ সব নিয়ে সে খুব কমই রাগ করত। কিন্তু মনকে শত-সহস্র ব্যাপারে ভুলিয়ে রাখার পরেও হারিয়ে যাওয়া মানিকদের মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারতোনা, রাত কে রাত ওড়নায় মুখ লুকিয়ে কাঁদতো। যখন কোনো জায়গা থেকে কোনো কাজ যোগাড় হতনা—দিনের বেলাও কাঁদতো।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জঙ্গীর ভঙ্গু তাকে ডাকতে এলো। তার

বউয়ের ছেলে হবে। গ্রাম থেকে নিয়ামৎ ধাইয়ের যাওয়ার পর কাছেপিঠে কোনো ধাই খুঁজে পাওয়া যেতনা। রক্‌খী কিছু জানুক বা না জানুক দিত্তার চারটে বাচ্চা সে নিজেই প্রসব করেছে। কিন্তু সে দিনগুলোতে দুঃখকষ্ট সয়ে ভালোভাবেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। জঙ্গীরা ছিল সম্পন্ন জাঠ। ষাট বিঘে জমির মালিক। নিজের প্রথম ছেলের মুখ দেখে সে পলাশ ফুলের মতো উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বউ বলেছিল, "ও রক্‌খী, পরে বলিসনা যে তুই ইতস্তত করেছিস। যা'মন চায় চেয়ে নে।" আর রক্‌খীও কিছু না ভেবেই বলে বসলো, "বেঁচে থাকো, আমাকে শুধু একটা গাধা কিনে দাও।"

রক্‌খীর কথা শুনে জঙ্গীর ও তার পরিবারের আর সবাই হেঁসে লুটোপুটি। কিন্তু তার পরের দিন সকালে তার প্রায় তিন মাসের একটা গাধার বাচ্চা তার উঠোনে নিয়ে এসে দাঁড় করালো।

দিত্তা তার বউয়ের মোটা বুদ্ধি দেখে চটে গেল, "ওরে অভাগী, চাইতেই যখন বলেছিল, কোনো ভালো জিনিষ চেয়ে নিতিস। এই শালার বেটা জানিনা কদ্দিন ধরে আমাদের গাঁটের কড়ি খাবে। তারপর একটা গাধায় কি হয়? না ইট বইতে পারবে, না ফসল।" অনেক চেঁচামেচি করলো সে কিন্তু রক্‌খী গায়ে মাখলোনা।

গাধার বাচ্চাটা তুলোর মত শাদা ধবধবে। রক্‌খী কখনো তাকে রোদ্দুরে দাঁড় করিয়ে গা ডলে ডলে চান করায় আবার কখনো তার চুল আঁচড়ে দেয়। তার শরীরে তুলোর সলতে আর মেঁহেদী দিয়ে কখনো লতা-পাতা আঁকে আবার কখনো ফুলের আলপনা করে। দূরের কোন কিছুর আশায় দিত্তা দড়ি পাকাতে বসে। কিন্তু রক্‌খী তার দড়ির লাটাই ছুঁড়ে দিয়ে বলে, "যদি মাল বাঁধার দড়ি পাকাও ক্ষতি নেই। কিন্তু বইবার কাজ নিজের কাঁধে করতে হবে। আমার মোতিকে আমি এক তোলা ওজন বইতে দেব না। কখ্‌খনো না।"

রক্‌খী গাধার নাম রেখেছিল মোতি। লোকেরা জানতো—

কারণটা কি? বাচ্চাটা ছিল ফুটফুটে সুন্দর। কিন্তু রক্‌খীর ভাবনা-চিন্তার ধারা ছিল একটু অন্যরকম। মামদীন ছিল তার বড় ছেলে ও ছোট ছেলে ছিল তৌফিক। 'মোতি' শব্দে দু'জনেরই নাম পাওয়া যায়। একজনের 'ম' অন্যজনের 'ত'। যখনই সে মোতি বলে ডাকে তার ঠোঁট দুটো যেন মধুর ছোঁয়ায় ভিজে যায়।

তারপর টাইফয়েডে দিত্তা একেবারে মাটিতে মিশে গেল। ক্রমাগত কুড়ি দিন ধরে জ্বর লেগে রইলো, চারদিন ছাড়ান দিয়ে আবার চেপে ধরলো। রুক্‌খী তার মুখে জল দেয়, হাত-পা টিপে দেয় ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ খুঁজে বেড়ায়। পুড়ি, পাঁচন, গুড়ের ড্যালা, চা ও ছাগলের দুধের একটুখানি—সবই কিনতে হয়। একদিন যার কাছ থেকে ও পাঁচ টাকা ধার নেয় সাতদিন পরে সে আট টাকা ফেরৎ চায়। দশ জন অসহিষ্ণুর মুখ বন্ধ করার জন্য সে গিদ্ধামলের কাছে যায়। বাড়ি বয়ে এসেছে বলে তার কথা সে শুনল কিন্তু মাস পুরবার আগেই তার ছেলে লছমন এসে মোতির গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

বাড়িতে ঢুকতেই রক্‌খী গিদ্ধাকে অনেক শাপ-মান্য দিল। তার বংশের বিগত ও আগামী সবাইকে বেছে বেছে গালাগালি দিল। দিত্তা বোঝাতে থাকে 'গিদ্ধার বংশের সঙ্গে আমাদের বংশের অনেক পুরোনো বন্ধুত্ব। যদি সে গ্রামে থাকতো তাহলে দেখতে পেতে। বাইরে থেকে লছমনকে নিষ্ঠুর মনে হয় কিন্তু আসলে তা নয়। জানো তো সে তোমার বাঁসন-কোসন ছোঁয়নি। যদি সে সুদ উশুল করার জন্য তোমার বাড়ির সব জিনিসপত্র জড়ো করে নিয়ে যেত তাহলে আমরা কি করতে পারতাম?"

কিন্তু রক্‌খী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে-কামড়ে একাকার ক'রে দেয়।

গাধাটা দিত্তার বাড়িতে আসার আগে তার মালিক তাকে আঁস্তাকুড়েতে ছেড়ে দিত—সমস্ত দিন সে নোংরা জঞ্জালের মধ্যে চরে বেড়াত। কিন্তু যেদিন থেকে রক্‌খীর কাছে এসেছিল বাড়ির

বাইরে সে তাকে বেরোতে দেয়নি। সোনার মত সুন্দর নরম গাছের পাতা ছিঁড়ে নিজের হাতে ধরে খাওয়াত, তাতে ছোলাও মিশিয়ে দিত—প্রাণ ভরে খাক। একটুও নাদি পড়লে নিজের আঁচলে জড়ো ক'রে নিত। মোতির শরীর এমন চকচকে, মনে হত কেউ চোখের পাতা দিয়ে তা' পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। রকৃখী এ দিক দিয়ে এলে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতো, ওদিক দিয়ে এলে মুখ দিয়ে আদর করা চুকচুক শব্দ করতো। লালদের পাকা বাড়ি মোতির কাছে শ্মশানের থেকেও খারাপ জায়গা মনে হয়। কয়েকদিন পর্যন্ত সে ঘাস-খড় কিছুতে মুখ দিলনা। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো আর নিজের নসীবের জন্য কাঁদতো।

জুম্মাবারের রাতে রকৃখী স্বপ্ন দেখে যে, কেউ তার দু'টো ছেলেকেই মাথা নিচু ক'রে ঝুলিয়ে দিয়েছে আর তাদের মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা চর্বি নিচে টগবগ ক'রে ফুটন্ত তেলের কড়াইতে পড়ছে। আঁতকে সে বিছানায় উঠে বসে, দিত্তাকেও জাগায়। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আর সে কিরাড়োদের*মুখ পর্যন্ত দেখবেনা কিন্তু এই অবস্থায় সে কেমন ক'রে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। বড় কষ্টে সে অন্ধকারের প্রহরগুলি কাটায় ও সকাল হওয়ামাত্র সে গিন্ধার বাড়ির দিকে ছোটে।

খিদে হাতির অহংকারও চূর্ণ ক'রে দেয় ও ছেলেবেলার খিদে মুনি-ঋষিও বরদাস্ত করতে পারেনা। কয়েকদিন পর্যন্ত মোতির পা-গুলো পাঁচ-পাহাড়ের বোঝার তলায় থরথর ক'রে কেঁপেছে। তার মাথায় লম্বা লম্বা পেরেক ঢুকেছে ও পেটের মধ্যে জালা জালা এসিড টগবগ করেছে। প্রতিমুহূর্তের অসহ্য বেদনা তার হঠাৎই হয়ে যায়। যখন রকৃখী সেখানে পৌঁছোয়, তখন দেখে মোতি নোংরা পেচ্ছাব ইত্যাদির মধ্যে হাঁ করে পড়ে রয়েছে। প্রাণ যেন তার শরীরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি অঙ্গকে বিদায় জানাচ্ছে।

*হিন্দু দোকানদার কিংবা লালা

রকৃথীর সমস্ত গা শিউরে ওঠে। পালিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে এসে পিঁড়ির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

"নে তোকে মোতি দিচ্ছি" বিষণ্ণ দিত্তা ধীরে ধীরে নিকটে এসে তার পায়ের দিকে দশ দিনের দুধের মতো শাদা কুকুরছানা এগিয়ে দেয়।

"মোতি...!" ঘৃণার ঝাপটা মেরে রকৃথী চেঁচিয়ে ওঠে। একটা বাউণ্ডুলে কুকুরছানার সঙ্গে একটি অতি পবিত্র শব্দ যোগ করে দিত্তা যেন তার মাথায় বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়।

"এর চোখের দিকে তো চেয়ে দেখ..." দিত্তা কুকুরছানার পিঠে লোমের উপর হাল্‌কা ভাবে হাত বুলিয়ে বলে।

রকৃথী একদৃষ্টে কুকুরছানার মুখের দিকে তাকায়—সে ঠোঁট চাটছিল ও লেজ নাড়ছিল। রকৃথী সেই চোখ দু'টোতে তৌফিকের মাতাল করা চোখ দু'টো ও মামদীনের মিছরির গেলাসের মত দু'টো চোখ খুঁজছিল। তারপর তার পেটের মধ্যে মুখ গুঁজে সে ককিয়ে ওঠে, "আমার বাবাধনরা।"

কুকুরছানা কিছুই বুঝতে পারেনা ও রকৃথীর দিকে এমনভাবে তাকায় যেমন ক'রে অজানা এক আগুন্তুক সম্পূর্ণ অচেনা লোকের দিকে তাকায়।

রকৃথী আরো কয়েকবার চেঁচিয়ে ওঠে। আগের চেয়ে বেশী জোরে। কুকুরছানা ভয়ের চোটে কুঁই কুঁই করতে থাকে। এমন করে ছটপটিয়ে সে হাত-পা নাড়ায় যেন তার তলায় কেউ আগুন বিছিয়ে দিয়েছে।

খুব জোরে একটা চিৎকার ক'রে রকৃথী যেন তার ডাইয়ে বাঁয়ে ছড়ানো সমস্ত শোক জড়ো ক'রে বুকে পুরে নেয় আর তারপর যখন সে ছানাটার মুখে চুমো খেতে থাকে তার হাসিভরা চোখে মমতা উপচে পড়ছে।

বাজারের শোকসভা

তারপর সে মরল।

ধরতে গেলে অর্ধেক রাতও হয়নি। এখনো ফ্যাশনেবল্ বাজারের শো কেসের বাতিগুলো দপদপিয়ে জ্বলছে। নিয়ন আলো ঝলমলিয়ে জৌলুস ছড়াচ্ছে আর এই জগবুঝের বাজারে হতভাগার মরবার সাধ হল। ওরে ভালোমানুষ, এখনো সিনেমার রাতের শো শেষ হয়নি। সড়কে রিকশাঅলাদের কিউ দাঁড়ায়নি। পানের পিক ছিটোয়নি। বেলফুলের মালা দোলেনি কোথাও। এখনও সিলিয়া জুয়াড়ি মদ খেয়ে টলমল পায়ে ফেরেনি আর তোর মাথায় কোন ভূত চাপল যে এই জমজম দৃশ্য ছেড়ে ভরাভরন্ত পৃথিবী থেকে কেটে পড়তে চাস। বাজারের ফুটপাতে এমন ক'রে শুয়ে পড়লি যেন তোর মা ওখানে বিছানা পেতে রেখেছে। একেবারে টুপ করে মরে যেতে পারলি। এত অনায়াসে জুয়াড়ি সিলিয়াও তোকে পয়সা দেয়নি বোধহয়।

তার মরা শরীর একটু শিউরে উঠল। আর নিয়নের আলোয় মুখের শিরাগুলোয় যেন টান ধরলো।

না, আজ আর আপনি আমার মুখের দিকে এমন ক'রে তাকাতে পারেন না। এখনো আমাকে সমবেদনা দেখাবেন না। এখনো আমার মধ্যে একটু প্রাণ রয়েছে। এখনো আমার চোখে আপনার প্রতিচ্ছবি। আমি এখনো আপনার গলা শুনতে পাচ্ছি। জুয়াড়ি সিলিয়ার টলমলে পায়ের শব্দ এখনো চিনতে পারবো। আমি আপনাকে বলে দিতে পারি আজ ও হেরে এল, না জিতে এল। যদি জিতে থাকে তাহলে আমার পোয়া বারো, হেরে থাকলে ফক্কা। সিলিয়া তো এই রকমই। আসলে বড় খেলোয়াড় তো এরা। এই বাজারের বড় ব্যবসাদার যারা কখনো ফিরেও দেখেনি আমার দিকে—বেঁচে আছি কি মরেছি।

আর আজ সে মরে গেছে।

তার বেখাপ্পা ন্যাংটো শরীরটা পড়ে আছে ফ্যাশনেবল্ বাজারের ফুটপাতে। তার গায়ে একটুকরো কাপড় নেই। অথচ ফ্যাশনেবল্ বাজারের শো-কেস গুলো রেডিমেড কাপড়ে ঠাসা। ঠাণ্ডায় তার শরীর কাঁপছিল। সমস্ত আবহাওয়ার হালকা কুয়াশা ছড়ানো। দূরে কোথাও এক সাধু ধুনি জেলে বসে আছে, ধুনিতে ভিজে কাঠ জ্বলছে। কুয়াশায় মিশে রয়েছে ধোঁয়ার গন্ধ। সে সারাজীবন ভিজে কাঠের মতো জ্বলেছে আর ধোঁয়ায় জ্বালাধরা চোখে ছিল জল—হাওয়ায় সাধুর গমগমে সুর ভাসছে, "পানী বিচ মীন পিয়াসী মোহে শুন শুন আবে হাসি।" হ্যাঁ, অঞ্জনের মধ্যে নিরঞ্জন হয়ে থাকা সাধু, আয়, দেখে যা, আমি জলেতে মাছের মতই তেষ্টায় ঠা ঠা করছি। কাপড়ে ঠাসা বাজারের ভিতর উদোম খোলা গায়ে মরছি। আমার খোলা শরীরের আত্মাও উদোম আর সেই উলঙ্গ আত্মা শিগগিরই বসন বদল করতে উৎসুক...

নিয়ন আলো জ্বলছে নিভছে। বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো আলোয় থেকেও ওর আত্মা ঘুপসি অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছে। আঁধার গলি যার চারিদিকে খাড়া পাঁচিল তোলা। উঁচু উঁচু দেয়াল। আর ওর আত্মা ছাড়া পাবার জন্য অন্ধকারে হোঁচট খেয়েছে বার বার। দেয়ালে মাথা ঠুকেছে। ঢং—ঢং—দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজে। মনে হয় আওয়াজটা ওর ভেতর থেকে গম গমিয়ে উঠছে। সময় হয়ে গেছে। সকলেই সময় চেনে। সবাই নিজের নিজের সময়ের খোঁজে ঘোরে। ওদিকে ঘড়ি বাজে ঢং—এদিকে আওয়াজ আসে।

"এই তো সময়, ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

টং-টং-এক ফকিরের গান,—

"গাফিল তুঝে দেতা হ্যায় ইয়েহ ঘড়িয়াল মুনাদী
গরছুঁ নে ঘড়ি উম্র কী ইক আউর ঘটাদী।"*

*হে গাফিল, এই ঘড়ি তোকে ঘোষণা করছে যে তোর আয়ু থেকে আরেকটি ঘণ্টা কমে গেল।

আত্মা ছটফটিয়ে ওঠে। সেও ঘড়ির শব্দ চেনে। ঘড়িতে বার বার ঘা পড়ে। ও তো নির্দোষ। আমরা, যারা দোষী—তাদের কী হবে? ছাড়ুন মশাই, এ সব হল সাধু ফকিরের বাক্যি। আপনি ধুনি ধরান—ধুনিতে ভিজে কাঠ হয়ে জ্বলতে থাকুন। কথাটা ভেবে সে মুচকি হাসল আর খসে পড়ার আগের হাসি তার ঠোঁটে ঝুলে রইল। মনে হচ্ছিল, সে হাসতে হাসতে, এক্ষুনি জগতের অস্থায়িত্ব নিয়ে কিছু বলবে। কিন্তু তার বোবা স্বর গলায় আটকে গেল। খোলা চোখ খোলাই রইল। কাচের মত নিষ্প্রাণ ঔজ্জ্বল্য চোখের তারায় থমকে আছে। তার চোখে এক ফোঁটা কান্না আটকে আছে নড়বার নাম নেই। রঙ বেরঙের নিয়ন রোশনাই তার চোখে জ্বলছিল নিভছিল। একবার লাল আবার হলদে। এক্ষুনি সবুজ ফের শাদা।

খট খট শব্দ। বোধহয় কেউ দোকানের তালা ভাঙছে। চোরেরা রাত্তিরে কেন আসে? ভয় পায়? ধুত্তোর যম তো কাউকে ডরায় না। সারা ঘর-দোর ভেঙে ঢুকে পড়ে। সময় অসময় নেই, ধীরে ধীরে পা ফেলে সে আসছেই। কিন্তু তেমন পলকা পায়ের শব্দ তো এটা নয়। এ যে ভারী মোটা বুট, কাঁটা বসানো বুট। হ্যাঁ, এই খটখট আওয়াজ ফৌজাসিংএর লোহা বাঁধানো লাঠি থেকে উঠছে। ফ্যাশনেবল্ বাজারের চৌকিদার, হাবিলদার ফৌজাসিং। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানদের ম্যাজিনো লাইন পার হবার সময়ও আমরা কখনো এত তোড়জোড় করিনি। শালা, যে যমকে দেখছে তার আবার ভয় কিসের? কিন্তু কি আর বলব মশাই, এই চৌকিদারী কাজে বড় তক্কে তক্কে থাকতে হয়। ভয়ে ভয়েও। কি জানি কখন এসে পড়ে। কথায় বলে, চোর আর খদ্দেরের কোনো ঠিক নেই। দুনিয়াটাও এক বাজার হে। দিনে খদ্দের আসে রাত্তিরে চোর।"—তবু হাবিলদার ফৌজা সিং কেবল খদ্দের আর চোরই চিনতে পারে। মৃত্যুর পরিচয় তার চোখেও নেই। এখন লোকটা ওর পাশ দিয়ে চলেছে।

"ওরে কোথায় শুয়ে আছিস, চৌরাস্তার মোড়ে—আজ মেয়েটা আসে নি? সেই যে কে যেন হয় তোর...?" ফুটপাতে চিৎপাত মড়াটা চোখ মিটমিট ক'রে ছাখে। ওর ঠোঁট হাবিলদার ফৌজা-সিংকে ডাকতে থাকে কিন্তু ধ্বনি যেন গলায় জমে যায় মনে হয় ফৌজাসিং সেখান থেকে তাড়াতড়ি চলে গেছে, তার চোখ কোনো জার্মান সৈন্যকে খুঁজছে। ভাই এটা বাজার নয়, এ হল যুদ্ধক্ষেত্র। কিছুই ঠিক নেয় এখানে, কখন কী ঘটে যাবে। হ্যাঁ ফৌজাসিং তুই ঠিক বলেছিস। জার্মান ফৌজের তবু একটা না একটা জায়গা আছে কিন্তু এ শালার কিছুই ঠিক নেই।

ফ্যাশনেবল বাজারের ফুটপাতে পড়ে ওর শরীর শক্ত হতে থাকে। রঙ বেরঙের নিয়ন লাইটগুলো পলে পলে রঙ বদলায়—প্রতি মূহূর্তে রঙ পালটানো জগৎ। গিরগিটির বাচ্চা। আর তারপর পৃথিবীটা যেন ল্যংড়ী হয়ে গেল। ধীরে ধীরে লেংচে লেংচে পা টেনে টেনে সে ওর দিকে এগিয়ে আসে। খোঁড়া মেয়েটা। তামাকের ধোঁয়া তার সারা শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। হি-হি-হি-সে রোজকার মতই নোংরা হাসি হাসছে। ও চেনে মেয়েটাকে। লেংড়ী ঠাকরী। এই বাজারে সবাই চেনে। কেউ বলে ভিকিরী, কেউ বলে পাগল। মেয়েটা দিনভোর সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে বেড়ায়। রাতে ওর পাশে বসে সিগারেট টানত—হরদম সিগারেট টেনে যেত।

ঠাকরীকে দেখে তার দৃষ্টি উপরে উঠে গেল। মুরলী মনোহরের মূর্তির পাশে একদিকে একটা কাঠ বেরিয়েছিল। রোজ ও এখানেই রুটির পুঁটলী টাঙিয়ে রাখে। ও হামেশাই ঠাকরী আসার আগে পুঁটলীটা টাঙ্গিয়ে দিয়ে এখানেই অপেক্ষা করেছে। তারপর তারা দু'জনে মিলে রুটি খেত। অথচ আজ ওর খিদে পায়নি। পেট শুকিয়ে কাঠের তক্তা হয়ে গেছে।

"শুয়ে পড়েছিস?" ঠাকরী জিজ্ঞেস করে।

কোনো উত্তর নেই। মেয়েটা ওর পাশে বসে পড়ে। একটা

নোংরা হাসি হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ওর শরীর তেমনি শক্ত হয়ে থাকে। ওর কাচের মত নিথর চোখ অবাক চেয়েই থাকে। ঠাকরী ওর গা ছুঁয়ে ছাখে। হঠাৎ তার সিগারেটের ধোঁয়া আগের চেয়ে গাঢ় হয়ে ওঠে। চোখের মণিদুটি ভয়ে আরো বড় হয়ে ওঠে। সেই মণি থেকে এক গাঢ় কালো ছায়া নিয়ন আলোতে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঠাকরী আবার ওর গা ছুঁয়ে ছাখে কিন্তু ও আগের মতই পড়ে থাকে। উদোম ন্যাংটো। নামমাত্র একটা কোপনি ছাড়া তার শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। কোপনি। এখন পর্যন্ত সারা জীবনের রোজগার ও নিজের কোপনীতে লুকিয়ে রেখেছে। একটা থলিয়ায়। একটানে ঠাকরী তার কোপনি খুলে ফেলল। কিন্তু থলেটা নেই। দু'ই ঠোঁটের ফাঁকে একটা নোংরা গালাগালি বিড়বিড় করল, দারুণ ঘেন্নায় ওর অনড় পড়ে থাকা শরীরটাকে দেখে থুতু ছেটাল তারপর হি হি করে হাসতে লাগল নিজের মনে। আর হাসতে হাসতে হঠাৎ তার পেটে খিঁচ ধরে গেল। লোভী চোখে সে উপরে পুঁটলীটার দিকে তাকাল। তার হাত পুঁটলী অবধি পৌঁছয় না। সে মড়াটাকে দেয়ালের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর ওর বুকে পা রেখে খানিক ডিঙি মেরে পুঁটলী নামিয়ে ফেলে, তারপর পিছন দিকে আর না তাকিয়ে হি হি ক'রে হাসতে হাসতে চলে যায়।

এক এক ক'রে নিয়ন বাতিগুলো নিভতে থাকে। প্রাতঃ ভ্রমণ বিলাসীদের আনাগোনা শুরু হয়। দু'ই বুড়ো পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওকে ঘুমন্ত ভেবে বলে, "কেমন দুনিয়া নিলামে তুলে ঘুমোচ্ছে দেখো।"

"এরা কেমন ঘুমোয়, কোনো ভাবনাই নেই। আমার তো সারারাত ঘুমই হয় না।"

আস্তে আস্তে দিনের আলো ফোটে, লোকের আনাগোনা বেড়ে চলে। আর একজন কেউ বলে, এঁ হে এ তো দেখছি কে মরে পড়ে রয়েছে।"

"আমাদের বাজারের পাগলটা।"

শেঠ ধনীরামের গলা। মুরলী মনোহরের মূর্তি বসানো দোকানের বারান্দার কাছে যেখানে মড়াটা পড়ে আছে তার থেকে দু'টো দোকান ছাড়িয়ে শেঠ ধনীরামের দোকান। ও এই শেঠকে ভালো ক'রেই চেনে! নীচ, ইতর। আজ সমবেদনা দেখাচ্ছে। বহুরূপীর মতন এই পৃথিবী খালি রঙ বদলায়। এখনো সেই ঘটনাটা ওর মনে আছে। প্রচণ্ড গরমের দুপুর। তেষ্টায় ওর জিভ টাকরার সঙ্গে আটকে যাচ্ছিল। ও দু-ঢোঁক জলের জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে ধনীরামের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শেঠ দোকানের ভিতরে রাখা মেসিন থেকে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল ঢেলে খাচ্ছিল।

সে বলেছিল, "শেঠ, দু'ঢোক ঠাণ্ডা জল।"

"ঠাণ্ডা জল! ভাগ্ এখান থেকে। এলেন আবার গুরু ঠাকুর। ঐ তো সামনে মেসিনে ঠাণ্ডা জল বেচছে। দু'পয়সা গেলাস…হি হি ছোটলোক কোথাকার!"

যখন সে ঠাণ্ডা পানিঅলার কাছে গিয়েছে, লোকটা তেড়ে উঠেছিল, "যা এখান থেকে। আমি দানছত্তর খুলেছি নাকি জল খাওয়াবার। দেখছিস না কি রকম গরম পড়েছে—আর তুই চাইছিস ঠাণ্ডা জল! চলে যা, আমার খদ্দের আসার সময় এখন।"

"হ্যাঁ, খদ্দের আর যমের কোনো ঠিক নেই, ইতর। এরা একই রকম বুলি আওড়ায়। সবাই নিজের খদ্দের চেনে। এরা কখনো নিজের খদ্দেরের হাত থেকে ছাড়ান পাবে না।"

কিছুক্ষণ পরে ওর চার পাশে লোকজন জড়ো হয়। মদ্দী আর ভোলা যখন হাতে ডিবে ঝুলিয়ে মুরলী মনোহরের মূর্তি লাগানো দোকানে পৌঁছয় দোকানের দরজা তখনো বন্ধ। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। তারা আসার আগেই দোকান খুলে যায়। ভোলা চুপিচুপি বলে, "মদ্দী, আজ বোধহয় লালার বাড়ির অবস্থা ভালো

নয়। এই যে দোকান খোলেনি দেখছিস এর পেছনে কোনো গণ্ডগোল আছে।”

“হ্যাঁরে দোস্ত, বড় শাহজীর কদিন থেকে শরীর খারাপ। কে জানে .....”

দু’জনে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়। দু’জনের নজর আপনা থেকেই সামনের দেয়ালে লাগানো একটা সিনেমার পোষ্টারের উপর পড়ে। আর চোখে চোখে কথা হয়ে যায় যদি আজ বাজার বন্ধ থাকে তাহলে তারা ঠিক সিনেমা দেখবে।

“কিন্তু দোস্ত, আজ তো একটা দোকানও খোলেনি।” তারপর তাদের চোখ সেই ভিড়ে আটকে পড়ে, যেখানে তাদের মালিক আর বাজারের অন্য দোকানদাররা ঘোরাফেরা করছে। যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে সকলের। সবাই মিলে মড়ার খাট সাজাচ্ছে। শুকনো নারকেলের মালা আর ছুহারার ঝালর তার চারপাশে ঝুলছে। রঙ বেরঙের কাগজের পতাকা ঝিলমিল করে। ভালো ভালো শাল-দোশালার ডাঁই কুতুবমিনারের মত উঁচু হয়ে ওঠে—সব দোকানদাররাই সাহায্য করতে পুরোদমে এগিয়ে আসে। কুতুবমিনার যত উঁচু হয় ব্যবসাদারদের বুক গর্বে তত ফুলে ওঠে।

“কে মারা গেছে?” ভালো একজনকে জিজ্ঞেস করে।

“আমাদের বাজারের একজন লোক। আজ বাজার বন্ধ থাকবে।” এই বলে সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও তাড়াতাড়ি খাট সাজাতে থাকে।

এরই মধ্যে মন্দী মরা লোকটার খোঁজখবর নিয়ে এসেছে।

“শালা! এতদিন লোকটা ছিল পাগল, আর আজকে মানুষ হয়ে গেছে। ছোটলোক ইতর যত!”

দু’জনে হাতে ডিবে ঝুলিয়ে কোম্পানী বাগের দিকে পা বাড়াল।

“দোস্ত, শুনেছি কেউ মরে গেলে আগের রান্না খাবার খেতে নেই।” গলাটা বিষণ্ণ শোনায়।

"আরে রাখ তোর...রুটিতে আবার কিসের ছোঁয়া লাগবে?"

তারপর যখন ফ্যাশনেবল বাজারের রাস্তার উপর দিয়ে ব্যাণ্ড বাজনার আওয়াজে খুব ধূমধামে শবযাত্রা আরম্ভ হয়, মন্দী আর ভোলাও সেই ভিড়ে জুটে যায়। খাটের উপর ক্রমাগত পয়সা ফেলা হচ্ছিল। একমুঠো পয়সা এসে ভোলার ঝুলিতে পড়ে। সে হাঁক লাগায়, "আমাদের বাজারের পাগল—"

"জিন্দাবাদ।" মন্দী সাড়া দেয়।

পয়সা কুড়োবার পর দু'জনে ম্যাটিনী শো দেখতে যায়।

করীলের শুকনো ডাল

বলন্তোর শ্বশুর ও দেওর মাঘী কসে মদ টেনেছিল ও রাত্তির ভোর গালাগালি করেছিল। বলন্তোর বয়সী মেয়ে ওদের কাছে শুয়ে আছে (কিন্তু বাপ-বেটার তাতে একটুও লজ্জা-শরম নেই), তাদের ছোট ছেলে হু'টো ভয় পেয়ে চাদরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে তিতিরের মত ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল আর গিয়ালা 'মেয়েদের মতো' পাশে শুয়ে শুনছিল। কিন্তু বলন্তোর মেজাজ ঠিক ছিলনা। গিয়ালাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাও তার মনে পড়েছিল কিন্তু আগেকার মত "ছাড়ান দাও, যা হচ্ছে হোক" বলতে পারেনি। (গত কয়েক মাস ধরে সে এই ভাবে বলতে পারেনি।)

তার শ্বশুর বা দেওর গালাগালি দিয়েছে—এই প্রথম বার নয়। বারো তেরো বছর ধরে যখনই তাদের মাথায় ভূত চেপেছে তখনই তারা বলন্তোকে গালমন্দ করেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় কারো বিষয়ে কখনো খারাপ কথা বলেনি কিন্তু তারা হু'জন এতই ইতর যে, গালাগালি না দিলে যেন তাদের মদ হজম হয়না। যতদূর সম্ভব বলন্তো কোনো জন্তু জানোয়ারকেও কখনো গালাগালি দিতনা—ওরা আবার এ কথাটা উল্টে তার ঘাড়ে না চাপিয়ে বসে। আগে সে সব কিছু সহ্য করেছে কিন্তু পাশে শোওয়া সোমত্ত মেয়ের সামনে বিনা দোষে সে কারো নোংরা বকুনি সহ্য করতে রাজী নয়।

রাতভোর বলন্তোর চোখে ঘুম এলোনা। কে যেন তার ভিতরে মুঠোভর্তি বাবলা কাঁটা ভরে দিয়েছে। সে পাশ ফিরতেও পারছেনা। মাঝরাত অব্দি তার চোখহুটো শ্রাবণ-ভাদ্রের আব-হাওয়ার মতো ভিজে ছিল, তারপর শুকিয়ে তারাহু'টো ধীরে ধীরে তেতে উঠলো। এই উত্তাপে তার চোখ আপনা থেকেই বুজে এলো। চোখ খুলতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

করীল—এক প্রকারের কাঁটা-ঝোপ যাতে পাতা হয়না।

বেলা হয়েছে। জিয়ালা বলদগুলোকে জাবনা দিচ্ছিল, বড় মেয়ে আগুনে চায়ের জল চাপাচ্ছিল। সে এদিক ওদিক তাকায়। ঘুম না হওয়ায় চোখ করকর করছে—সে চোখে প্রত্যেকটা জিনিস অচেনা-অজানা মনে হয়। নিজের থেকেই তার চোখদু'টো বুজে আসে। হাতের চেটো দিয়ে সে চোখ ডলে কিন্তু হঠাৎই সে দু'টো হাত সামনে রেখে তেলোর দিকে এমন করে তাকায় যেন তাতে কাঁটা গজিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে হাত ঝেড়ে সে আবার চোখ রগড়াতে থাকে। (গত দু'বছর ধরে যখনই সে নিজের চোখ ডলেছে তখনই তার মনে হয়েছে যে বাজরার শিষের শেষ ফালিটার মতো নিজের রূপকে ডলছে আর প্রত্যেকবারই তার মনে হয়েছে তার রূপের সমস্ত কণাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে—বেঁচে থাকছে শুধু ভুসো, অন্তঃসারশূন্য ভুসো যা' পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।)

বিয়ের পর বলন্তো যখন এখানে এসেছিল, তখন তাকে দেখতে এসে মেয়েরা ভেবে পায়নি, কি ভাষায় তার রূপের প্রশংসা করবে। গাঁয়ের সব সেরা নঘোচন* সোধাঁ নয়নাও কোনো খুঁত খুঁজে পায়নি, সে তার রূপের কোনো উপমা দিতে পারেনি। 'পরীর মতো' 'প্রতিমার মতো' ও 'ফুলকুমারী' এ সব শব্দও তার কাছে জোরালো মনে হয়নি। তারপর সে বলেছিল, "ন্যাংটো জাঠরা মাটিতে মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছে।" তার চোখদুটো সত্যি সত্যি মাণিকের মতই জ্বলজ্বল করছিল সেদিন। কিন্তু আজ—চোদ্দ বছর পার হতে না হতে তার সেই মাণিকের মত চোখ দু'টো ময়লা কড়ির মতো হয়ে গেছে। সেই মাণিক থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হত তা এতই স্তিমিত হয়ে এসেছে যে তার অন্ধ পারে কিছুই দেখা যায়না—ভিতরের কোনো জিনিসের আকৃতিও নয়—বাইরের কোন জিনিসের প্রতিবিম্বও নয়—যেন তার দু'টো দিকেই চোদ্দ বছরের ধুলো একটা মেটে রঙের আস্তরণ বিছিয়েছে।

* খুঁতখুঁতে

বলদদের জাবনা দিয়ে গিয়ালা উনুনের সামনে এসে বসে। বড় মেয়ে জীতা বাটিতে চা ঢেলে তার সামনে রাখে। গিয়ালা যখন চায়ের বাটি তুলে মুখে দেয় জীতা চোখ উঠিয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়। জীতার চোখের সে ঝলক গিয়ালা সহ্য করতে পারেনা। সে চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু জীতা তারই দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনো বাপের গভীর চোখের দিকে কখনো বা তার কাঁচাপাকা দাড়ির দিকে।

বাপ-বেটির এই চোখে না জানি কি ছিল—বলন্তোর কান্না পায়, সে তার দোপাট্টার আঁচল মুখে পোরে। সেই কাঁটাগুলো বলন্তোর ভিতরে ফুটতে থাকে আর ব্যথায় তার প্রতি রোমকূপ টনটনিয়ে ওঠে। বসা থেকেই সে চারপাইয়ের উপর পড়ে যায়। (ওর দিকে পিঠ থাকার দরুণ গিয়ালা ও জীতাঁ কিছুই জানতে পারেনি।)

চা খেয়ে গিয়ালা কাপাসের ক্ষেতে নিড়োতে চলে গেল। জীতা বাড়ির সমস্ত গোবর ও নোংরা জঞ্জাল পরিস্কার করে, রান্না-বান্না করে তার পর ক্ষেতে খাবার পৌঁছে দিতে যায়। বলন্তো অসাড় হয়ে চার-পাইতে শুয়ে থাকে। খাবারও খায়নি। ছোট বাচ্চা দু'টো কে জানে কখন নিজেরা ইস্কুলে চলে গেছে। খালি বাড়িতে বলন্তোর প্রাণ আইঢাই ক'রে ওঠে। কোনো কাজে নিজেকে ভোলাবার জন্য উঠে বসে। কিন্তু চারপাই ছেড়ে দাঁড়াতেই সামনে মাঝখানের দেয়ালের উপর শ্বশুরের পাগড়ি দেখতে পায়—দেখেই বলন্তোর ভিতরে কাঁটাগুলো বিঁধতে থাকে। সে আবার চারপাইতে গড়িয়ে পড়ে। গিয়ালাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সে ভুলে যাচ্ছে।

বিয়ের পর যেদিন থেকে সে এ বাড়িতে এসেছে তার শাশুড়ি তাকে গঞ্জনা দিতে শুরু করেছিল। সবচেয়ে বড় গঞ্জনা তার যৌতুকের বিষয়ে। "আমরা কি বেদে না সিকলীগর * যে পুতখেকোরা রূপোর চুড়ি পরিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল ....বৌয়ের রূপ কি মধু মাখিয়ে চাটবো।" হয়তো অনেকদিন

* তলোয়াব ইত্যাদি অস্ত্রে যারা শান দেয়।

পর্যন্ত বলন্তোর মুখের উপর এই ধরণের গঞ্জনা সে দেয়নি, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশিনীদের কাছে বলন্তোর যা নিন্দাবাদ করতো তা বলন্তোর অজানা থাকতোনা। নিজের দিক থেকে বলন্তো কখনো কোন অভিযোগ করার কিছু সুযোগ রাখেনি। অক্লান্ত-ভাবে সে বাড়ির সব কাজ করেছে। বাড়ির দশটি মানুষের রান্না-বান্না, সাত আটটা পশুর দেখাশোনা – সব সে করেছে। বাড়ির কাউকে ময়লা জামা-কাপড় পরে থাকতে দেয়নি। বাড়িটা পরিস্কার ঝকঝকে ক'রে রেখেছে। তবু শাশুড়ির গঞ্জনা শুনে তার মন খারাপ হয়ে যেত। তারপর যখন সে কারণে-অকারণে বলন্তোর মুখের উপর নিন্দা করতে' শুরু করেছে তখন বলন্তোর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে।

একদিন রাত্রে সে গিয়ালাকে সব কথা বলে। কিন্তু গিয়ালা বড় 'মেয়েলী' পুরুষ। বড় নরম সুরে সে বলে, "ছেলেবেলা থেকে আমি কখনো মা-বাবার মুখের উপর কথা বলিনি। যদি তুই কোনো কথা বলিস তাহলে সব কিছুই কুয়োর গর্তে যাবে। তোর যা মন চায় কর শুধু আমার মা-বাবার সামনে মুখ খুলিসনা, সারা জীবনে নয়।

গিয়ালা তার কাছ থেকে মা-বাবার সামনে কিছু না বলার কথা আদায় ক'রে নেয় আর বলন্তোর মনে হয় ক্ষেতের জলসেচের নালীর মুখে করীলের শুকনো ডাল আটকে দিয়েছে কেউ— আর বলন্তোর বুক তেষ্টায় ফেটে যাওয়া ক্ষেতের মতো শুকিয়ে যেতে থাকে। তারপর তাতে ফাটল ধরছে।

পুরো তিন বছর ধরে সে শাশুড়ির কটুকথা ও গঞ্জনা শুনেছে। মদ্যপ শ্বশুর ও উচ্ছৃঙ্খল দেওরের অসহণীয় কথা ও গালমন্দ শোনে কিন্তু গিয়ালাকে দেওয়া কথার সে খেলাপ করেনি (প্রথম দিন থেকেই গিয়ালার উপর তার এত করুণা হয়েছিল যে, সে তাকে শিশুর মতো সবদিক থেকে বাঁচিয়ে আড়াল করে রাখতে

চেয়েছে—সেই করুণা এখন এমন এক মায়ায় দাঁড়িয়েছে যে সে গিয়ালার জন্য সব কিছুই ছাড়তে পারে।)

তার দেওরের বিয়ে হল। হবার পর তার ছোট জা বাড়ির ভিতর বাইরে যৌতুকে ভরে দিয়েছিল। বলন্তোর যেটুকু মান সম্মান ছিল তাও গেল। সে অনেকবার গিয়ালাকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল কিন্তু যতদিন না তার মা-বাবা ও ভাই তার বউয়ের উপর নানান অপবাদ-কুচ্ছো করে তাকে 'বউয়ের ভেড়ো' বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল, ততদিন সে আলাদা হয়নি।

আলাদা হওয়ার সময়েও গিয়ালা মেয়েলী হয়েই রইল। বাপ তাকে তার ভাগের পুরো ক্ষেতও দিলোনা এমন জমি দিল যা সবচেয়ে অফলা আর কাঁটাঝোঁপে ভরা। বাড়ির জিনিসপত্রেরও মাত্র পাঁচ-ছ ভাগের একভাগ দিল। খেটে-খেটে-রোগা হাড় সার দু'টো বলদই তার ভাগে পড়লো। বলন্তোর বাপের বাড়ির বাসন-কোসন, অর্ধেকের চেয়ে বেশী কাপড়-চোপড় ওরা রেখে নিল। গিয়ালা চুপ ক'রে রইল, বলন্তো নিজের প্রতিশ্রুতিতে অটল। দু'জনেই বুকে পাথর বেঁধে মনকে স্তোক দিয়ে রাখলো।

আর এখন পাথর চাপা এগারো বছর কেটেছে, বারো বছরে পড়লো, যে বারো বছরের বিষয়ে অনেক প্রবাদ আছে—বারো বছরে আস্তাকুঁড়েরও ভাগ্য বদলায়। অথচ তাদের যেমন ছিল তেমনি রইল—একটুও বদলালনা। তাদের অর্ধভগ্ন বাড়ি সেই পুরোনো দশায়—পাকা ইঁট তো দূরের কথা, কাঁচা ইঁটও তারা তাতে লাগাতে পারেনি।

জানোয়ারদের নাদা সেই জায়গাতেই রইল যেখানে জ্যৈষ্ঠ আষাড়ের রোদ্দুর পশুদের উপর সোজাসুজি এসে পড়তো, নাদের উপরে যে ছাউনি ছিল রোদ্দুর দেখে পশুদের ছায়া দেওয়ার পরিবর্তে নিজেই হাঁপাতে শুরু করতো। পিছনের কুঠরী বর্ষায় জলে ভরে যেত (বলন্তো প্রাণপাত ক'রে বাড়িঘর সব সময় ছিমছাম

রাখতো কিন্তু নিছক তার হাতের পরিশ্রমে পঞ্চাশ বছরের পুরানো দেয়াল-কাঠ নতুন হয়ে উঠতে পারেনা।) আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তারা কোনো বড় মোষ বা তাগড়া বলদ কেনেনি। গরুর গাড়িতেও কোনো নতুন ছাউনি পড়েনি, বার বার জোড়াতাড়া লাগিয়ে সে এই গাড়ীটাকে চুপ্‌সে যাওয়া জুতোর মত ঘসটে টেনে চলতো (লোকেরা ঠাট্টা ক'রে তার গাড়িটাকে 'গিয়ালার নাগোরী*বলদের গাড়ী' বলতে শুরু করেছিল।)

এই এগারো বছর ধরে সে শ্বশুর শাশুড়ি ও দেওরের ভালোমন্দ কথা শুনে এসেছে এবং গিয়ালাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কাঁটা-ডাল ভাঙতে দেয়নি। এই ডালের সঙ্গে আরো অনেক ছোটখাটো জিনিস এসে জড়ো হয়েছে...তার বুক এতদিন ধরে শুকনো থাকার দরুণ আকন্দের ফলের মত ফাটতে আরম্ভ করেছিল—আজ জল কখনো কখনো এত জোরে ঠেলা দিত যে করীলের শুকনো ডাল ভেঙে পড়তে চায়···

অন্য সকলে যা বলে তা বলুক কিন্তু তার ভাজও অকারণে তাকে ঝাঁঝালো কথা শোনাতে কসুর করতোনা। কি জানি কোন্ বাড়ি থেকে সে এসেছিল—বলন্তোর অবস্থা যতই খারাপ হয় ততই সে তাকে কথা শোনায়। যখন বলন্তোর কোনো বাচ্চা কোনো জিনিসের জন্য কান্নাকাটি করে, তার খুব ফুর্তি হয়। গিয়ালা ও বলন্তো যখন তীব্রস্বরে কথা বলে তখন তার বুক ঠাণ্ডা হয়। দেয়ালে কান পেতে ও সেকথা শোনে তারপর তিলকে তাল বানিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে শোনায়।

প্রথম প্রথম বলন্তো বুঝতে পারতোনা যে তার ছোট জায়ের সঙ্গে তার শত্রুতা কিসের? একদিন অকস্মাৎ ছোট জায়ের বাবা এসে নতুন বিয়োনো মোষ দিয়ে গেল। যখন তার প্রতিবেশিনী বচিন্তির বউ এসে অভিনন্দন জানালো তাকে সে দেয়ালের অন্য

* নাগোরের বলদ শ্রেষ্ঠ জাতির বলদ

দিকে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলন্তোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—"ঈশ্বরের দেয়া সব কিছুই আছে—হাতির মতো সাত-সাতটা মোষ বাঁধা, বাবা বলতেন, "মা, তোর যে মোষটা চাই নিয়ে যা।"...লোকেদের মতন হাতে ভাঁড় নিয়ে দরজায় দরজায় ঘোলের জন্য তো আর ঘুরে বেড়াবনা..."

আসল কথাটা বলন্তো তখনই বুঝতে পেরেছিল। বাপের বাড়ি বড়লোক বলেই ছোট জার যত গুমোর। শ্বশুর বাড়িতেও তাই ওর এত ঠাট-ঠমক। এই জন্যেই ও বলন্তোকে পিঁপড়ের মতো ছোট ক'রে ছাখে।

সেই প্রথম বলন্তো ভাবল, যদি আমিও পয়সাঅলা ঘরের মেয়ে হতাম তাহলে আমিও ভাজের মতো দরজায় মোষ বেঁধে রাখতুম আর তাহলে আমাকে এত খোয়ার সইতে হতনা কিন্তু তার গরীব বাপ-মার তো তিনজোড়া কাপড় দেবার মত অবস্থা ছিল না। (আর সে সময় তার কাছে এই দারিদ্র্য বড়ই অভিশপ্ত লাগে।)

তারপর দিন দিন জলের টান বাড়ে। করীলের ডালকে নিজের ক্ষমতায় চাইতে বেশী জোর দিতে হয় কিন্তু ডালের চারিদিকে জড়ো হওয়া জিনিসগুলোই প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে দেয়না। আর বলন্তোর অন্তরের মাটিতে আরো ফাটল দেখা দেয়, ঘাসের শিকড়ও ঝলসে যেতে থাকে...

সারাটা দিন বলন্তো নিঃসাড় শুয়ে রইল। বিকেলবেলা গিয়ালা যখন বাড়ি ফিরে এলো বলন্তোকে চারপাইয়ে শোয়া দেখে তার বুক ছাঁত করে উঠল (বলন্তোর অবশিষ্ট সমস্ত রূপ-রঙ যেন ফুরিয়ে গেছে। চোখ কোটরে ঢুকেছে আর গালের কোলে যেন কালি লেপে দিয়েছে কেউ। মুখ হাত-পা হলুদের মত হলদে।)

মনমরা হয়ে গিয়ালা নাদার উপর বসে পড়ে। তার মাথায় পিঠে ব্যথা। মাথা নিচু ক'রে বেলচার হাতলে সে ঠেকায়। মাথা ঘুরছিল। স্বপ্নের মতই মনে পড়লো বলন্তোর সেই চোখ-মুখ—আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে যে জৌলুসের দিকে কেউ চোখ তুলতে

পারতোনা (দুধ সাদা মোম কাগজে তৈরী পুতুলের মত ঐ মেয়েটার শরীর জোরে চেপে ধরতেও তার ভয় করত কোথাও ময়লা না লাগে ...কোথাও কুঁচকে না যায় ।...)

গিয়ালা যখন মাথা তুললো, দেখতে পেল সামনে মাঘী উস্‌কো-খুসকো চুলে পায়চারী করছে। পেট ভরে মদ খাওয়ার পর সে মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। গিয়ালাকে নাদার উপর বসে থাকতে দেখে সে গোড়ালির উপর উঁচু হয়ে ওদিকে তাকায় ও ব্যঙ্গভরা সুরে চেঁচিয়ে বলে, "শুনছো ওহে বিবির গোলাম, কোন্ ভাব-সমুদ্দুরে ডুব দিয়ে আছে ?" তার স্বর কর্কশ ও নিষ্ঠুর।

গিয়ালা কখনো ওর সঙ্গে খারাপ ভাবে কথা বলেনি। আজ এগারো বছর হল তারা আলাদা। তার এই নেশাখোর ভাই এর মধ্যে কতবার তাকে কড়া কথা বলেছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে কিন্তু গিয়ালা কখনো উত্তরে এ্যাই পর্যন্ত বলেনি—সমস্ত কথা জলের মত গিলে সে ঘরের ভিতর চলে গেছে—আজও সে আগের মতই নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। কুঠরির দাওয়ায় শুয়ে বলন্তো যখন গিয়ালাকে এমনি ক'রে ভিতরে ঢুকতে দেখল তখন তার তেরো বছর ধরে শুকিয়ে-আসা আকন্দ ফলের মতো ফাটল-ধরা বুক ভিতরে ভিতরে পুড়ে খাক হয়ে গেল—যেন সূর্যের মস্ত আগুন তারই উপর ঝরে পড়েছে।

বলন্তো উঠে বসে কিন্তু দেওরের বদলে সে দেখতে পেল মদের নেশায় চুর তার শ্বশুরকে (মাঘী হেসে অন্যত্র সরে গিয়েছিল।) মুমূর্ষু চোখ মেলে সে শ্বশুরের দিকে এমন ক'রে তাকাল যেন সে যমরাজের দূতের দিকে তাকাচ্ছে যে তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। (অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার খেয়ালই নেই যে সে তার শ্বশুরের সামনে খোলা মাথায় বসে আছে। চারপাইতে উঠে বসার সময় মাথা থেকে খসে পড়া দোপাট্টা সে এখনো মাথায় তুলে দেয়নি।)

...এতদিন পরে গিয়ালাকে দেওয়া কথা—করীলের শুকনো ডাল মটাৎ ক'রে ভেঙে গেল। জলোচ্ছ্বাস ভাঙা ডাল ও তার চারদিকে জড়ো করা জঞ্জাল, দশ বছর ধরে পিপাসার্ত নালাগুলোকে বন্যার

মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় ও বলন্তোর দগ্ধ-হৃদয়ের পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়া ফাটলগুলি ভিজে আরো চিড় খেয়ে যায়...।

"তোর..." শ্বশুর তাকে খোলা মাথায় এমনি ভাবে বসে থাকতে দেখে উচু গলায় গালাগালি দেয়, "তুই আমাদের শনি। ছেনাল মাগী কোথাকার, তোকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলে এমনভাবে ভিতরে ঠুঁসে দেব যে একটুও হাওয়া বেরোতে পারবে না, কি ভেবে রেখেছিস তুই ?..."

কিন্তু আজ বলন্তো আগেকার মত শ্বশুরকে ভয় পেল না, দোপাট্টা উঠিয়ে মাথায়ও তুললোনা—চোখ নামালো না—মিটমিট ক'রে শ্বশুরের দিকে তাকিয়েই রইল।

"কি হয়েছে ?" বাপকে গালাগালি দিতে শুনে মাঘী কাছে এসে মাতালের জড়ানো গলায় বাপকে জিজ্ঞাসা করে।

"ছাখ না, এই কঞ্জরের* বেটি আমাদের মুখ হাসাল। যত অনাছিষ্টি সবই তো করেছিস, বাকি ছিল শুধু এই, তাও পুরোলে। দেখছিস কি রকম বেদেনীদের মত বেহায়া হয়ে বসে আছে—এদিকে, আমার কাটারীটা আমাকে দে তো, এ জঞ্জালটা আজই দূর করবো, সারা জীবনের কান্নাকাটি আজই শেষ হয়ে যাক...."

"তুই কেন তোর শাদা চুলে এ কলংক মাখবি, আমাকেই এ পুণ্যিটা করতে দে—আমার বেচারা ভাইয়ের অবস্থাটাও শুধরে যাবে—আজই এর গলাটা কেটে নামিয়ে দিই...।" মাঘী তার খোলা চুল জড়ো ক'রে বেঁধে তাল ঠোকে।

তারপর নাদার উপর চড়ে দেয়ালের উপর দিয়ে সে বলন্তোর উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে। বলন্তোর শ্বশুরও গালাগালি দিতে দিতে গলি দিয়ে সেখানে আসে। গোলমাল শুনে গিয়ালাও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার বাপ ও ভাইয়ের রাক্ষুসে মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

*বেদে, ছোটজাতের লোক।

...কিন্তু করীলের শুকনো ডাল ভেঙে পড়েছে।

ওরা দু'জন আসবার আগেই বলন্তো হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোটরে ঢুকে যাওয়া তার চোখ দু'টো টুকটুকে লাল। ঘোমটা খোলা অবস্থাতেই কোনায় পড়ে থাকা মুষলটা উঠিয়ে নিয়ে গর্জন করে ওঠে—

"এসো। কে আছে আমার বাপের শালা যে আমার কাছে আসতে চায়। আমার গায়ে যে হাত দিয়েছে তার পুরো গুষ্টির নাড়ি-ভুঁড়ি ছিড়ে বের করব আমি···।"

এতো জোরে সে চেঁচিয়ে ওঠে যে গিয়ালা তার গলা চিনতে পারে না, বাচ্চারা ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে জোরে জোরে কাঁদতে আরম্ভ করে। তারা বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে তাদের সামনে সেই মেয়েই দাঁড়িয়ে যে আজ বারো বছর ধরে দেওয়ালের মত নীরবে তাদের জুতো খেয়েছে, কটুকাটব্য গালমন্দ শুনেছে —কখনো টুঁ শব্দটি করেনি। কিন্তু আজ সেই বউ সাক্ষাৎ মা কালীর মতন মুষল উঁচিয়ে দু'দুটো মরদের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা তাদের নেশাগ্রস্থ চোখেও অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই নেশা করা চোখগুলো স্থিরভাবে কিছু না ভেবেই ঘোর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'ই বাপ-বেটা এই কঞ্জরী মেয়েলোকটিকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"বলন্তো!" গিয়ালা চেঁচিয়ে উঠে তাদের দিকে ছোটে।

কিন্তু বলন্তো! ...এখন বলন্তো কে? বলন্তো এখন আর নেই ...করীলের শুকনো ডাল ভেঙে গেছে... ।

গিয়ালো পৌঁছবার আগেই মাঘীকে তার দিকে এগোতে দেখে বলন্তো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সে মাঘীর ডান কাঁধে এত জোরে মুষলের ঘা মারে যে তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতটা ভাঙ্গা ডালের মত ঝুলতে থাকে। শ্বশুর এগিয়ে আসছে দেখে বলন্তো মাঘীকে ছেড়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুষলের একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে গিয়ালার বাপও গালাগালি বকতে বকতে লাঠি বা ছড়ি খোঁজার ভান ক'রে উঠোনে নেমে যায়। যখন গিয়ালা দৌড়ে বলন্তোর কাছে গিয়ে পৌঁছোয় সে লেঠেলদের মত পিছলাফ মেরে হুংকার দিয়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই সে তাল ঠোকার মত আওয়াজে বলে—

"এবার কোনো মায়ের ব্যাটা আসুক তো আমার কাছে।... শোনো! ...তোমরা চোদ্দ বছর ধরে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ—মেয়েছেলে ভেবেই তো!...এসো একবার আমার কাছে—যদি রক্ত না খেয়ে নি তো কি বলেছি! ...ডেকে আন তোদের ফুল বউকে যে নিত্যিরোজ তার রাজা বাপ-মার কাছ থেকে হস্তিনী এনে বাঁধে—নোংরা খেকো, মরদপনা দেখায়, একবার এই কাঙালের বেটির সামনে এসে দাঁড়া তো। . . . আরে, চোদ্দ বছর ধরে আমি তোদের কথা শুনে এসেছি, গরীব ঘরের মেয়ে ভেবেই আমাকে খুঁচিয়ে মেরেছ . . . আয়, এবার কাছে আয়—মেয়েছেলের হাতের জোরও দেখে যা বীরপুরুষরা—তোদের রক্ত খেয়ে ফেলবো।" মুহূর্তের জন্য তার মুখ এত লাল হয়ে ওঠে যেন সে সত্যি সত্যি রক্ত খেয়ে এসেছে। ভয়ের চোটে কেউ তার কাছে ঘেঁসেনা।

চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের সব লোক সেখানে জড়ো হয়ে গেল। যখন লোকেরা ঘোমটা খোলা বলন্তোকে সবার সামনে হাতে মুষল নিয়ে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে আবোলতাবোল বলতে শুনলো লজ্জায় অনেকে চোখ নিচু ক'রে নিলো। কিছু লোক যারা গিয়ালার বাপ ও মাঘীকে হিংসে করতো দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। ইন্দর নম্বরদার, যে তার ষাট বছরের জীবনে এ বেহায়া মেয়েছেলে দেখেনি লজ্জায় রাগে মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। এ রকম গালাগালি বকতে থাকা মেয়েলোক যখন আর তার সহ্য হয়না তখন সে এগিয়ে নিজের বয়স আর মোড়লীর রোয়াবে চেঁচিয়ে ওঠে: "চুপ করবি কি না! —কঞ্জরী পেত্‌নী তোর মাথায় কি ভূত চেপেছে!"

সে একটু এগোতেই বলস্তো চেঁচিয়ে উঠলো—"দাদু সাবধান, তোমার পাগড়ী না কোথাও মাটিতে গড়ায়। তোমার মোড়লী নিজের কাছেই রাখ। যখন এরা আমার উপর জোর-জুলুম করতো তখন মোড়ল মশাই কোথায় ছিলে? ...এই গাঁয়েই থাকতে না আর কোথাও।"

নম্বরদার জিভ কামড়ে ফেলে।

আর তারপরেই চাল বদলায়। ইন্দর নম্বরদার গিয়ালার উপর খেঁকিয়ে ওঠে। সে বিমূঢ়ের মত পাশেই দাঁড়িয়েছিল। "শালা, তুই কি মানুষ? এই বাঁদরীটাকে এত মাথায় উঠিয়ে রেখেছিস? এই মেড়ীর জন্য তুই সমস্ত গাঁয়ের অপমান করাচ্ছিস, লজ্জা করেনা তোর? কুকুর কোথাকার?"

চোখের নিমিষে সবাই বলস্তোকে ছেড়ে গিয়ালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইঁদুরের পিছনে ছোটা চিলের মত সবাই গিয়ালাকে ছেঁকে ধরে।

"শালা, তুই কি মানুষ!"

"যদি এর এতটুকু পুরুষত্ব থাকতো তাহলে কি মেয়েলোক এত মাথায় উঠতে পারে?"

"এতো মেয়েদের পরে জন্মেছে, মেয়েছেলের চেয়েও বাজে এ শালা।"

"আমার বউ যদি এমন করতো, কেটে ভিতরে ফেলে দিতাম না শালীকে।"

"আরে মেয়েলোকের সাধ্য কি যে কথা বলে। ঝুঁটি ধরে ঘাড়ে চারটি রদ্দা লাগালেই একেবারে তর্কলির মত সোজা হয়ে যাবে...।"

গিয়ালা এই ধরণের গালাগালি ও কটুবাক্য শুনতে থাকে কিন্তু সবই তার স্বপ্নের মত মনে হয়।" 'মেয়েলোক' শব্দটা শুনে তার এমন অবস্থা হয় যেন হাজার হাজার লোক তার দু'হাত ধরে দড়ির মতো টানাটানি করছে। (বলস্তো সেই 'মেয়েলোক' যে তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়েছে, নিজের শরীরটাও সে ক্ষয় করে দিয়েছে

. . .কখনো কখনো তার মনে হয়েছে বলন্তোর মধ্যেই তার প্রাণ লুকিয়ে আছে—যেমন রূপকথার রাজার প্রাণ অশ্বত্থের ডালে ঝুলোনো টিয়েপাখীর মধ্যে ছিল।) এরা তার বউকে কি বলছে? গিয়ালার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা। সে একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বিচক্ষণ লোক অনেক ভেবেচিন্তে মাঘী ও তার বাপকে জবরদস্তী ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। প্রত্যেক লোক বলন্তো ও 'মেয়েলী' গিয়ালাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল। উঠোনের এই চেঁচামেচি সমস্ত গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কিন্তু বলন্তো হাতে মুষল নিয়ে এখনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়ালা ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। (সে জানতেও পারেনি যে ঘরে ঢোকার সময় কখন তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছিল, তার এই অচেনা হাসি দেখে সন্ধ্যার ধুসর আলোয় তার ক্রন্দনরত বাচ্চারা আরো ভয় পেয়ে চুপ মেরে গিয়াছে।)

...আর তখুনি সে বাইরে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পায়। মনে হল যেন ঝড়ে সিস্যু গাছের শুকনো ডাল ভেঙে পড়লো। সে বাইরে ছুটে আসে। বলন্তো উপুর হয়ে পড়ে গেছে। পাঁজাকোলা ক'রে সে ওকে ভিতরে নিয়ে গেল।

এই ঘটনার সাত দিনের দিন লোকেরা শুনলো—বলন্তো মারা গেছে।

শূলবিদ্ধ মুহূর্তগুলি

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর করুণা বুঝতে পারেনা আজকের দিনটা সে 'লীনুর সঙ্গে কেমন ক'রে কাটাবে। রবিবার। বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না করুণার। অদ্ভুত ধরণের আধো-তন্দ্রা ও শিথিলতা যেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর শ্যাওলার মত চেপে বসেছে।

কত রাত সে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। রোজ সকালে সে যখন বিছানা থেকে ওঠে তার মনে হয় সমস্ত রাত্রি সে মাইল মাইল হেঁটে বেড়িয়েছে। সকালে উঠে সবাই যখন নিজেদের শরীরকে ফুলের মত হাল্‌কা ও স্নিগ্ধ বোধ করে সে অনুভব করে একটা বিরাট ভার ও ক্লান্তি নিয়ে সে যেন জেগে উঠেছে।

গত রাত্রে সে মোটেই ঘুমোতে পারেনি। ভোরবেলা মোরগের ডাক শোনার পর সে নিঃশব্দে উঠে লীনুর খাটে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল ও ঘুমন্ত লীনুর দিকে তাকিয়েছিল। তার ছোট্ট গালের উপর নিজের গাল ছোঁয়ায় তারপর না জানি কখন তার চোখ বুজে এসেছিল।

সকালবেলা যখন করুণ'র ঘুম ভাঙলো সে ভাবতে শুরু করল কেমন করে আজকের দিনটা সে কাটাবে? ঘুমিয়ে থাকবে? শুয়ে থাকবে? না উঠবে? অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে সেইভাবেই শুয়ে রইল। লীনুর শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে লাগলো। তারপর যখন ঝি এসে গরম চায়ের পেয়ালা ছোট টেবিলটার উপর রাখে সে উঠে বসল।

"বিবিজী, কি ব্যাপার আজ? উঠবেনা?"

"কিছু না কটোরিয়া। আজ রবিবার কিনা তাই..."

"আজ রবিবার, কাল সোমবার। সোমবার সকালেই..."

"থাক, থাক, কিছু ভেবোনা! কিচ্ছু ভেবোনা।" তার ভিতর থেকে কেউ চিৎকার ক'রে ওঠে।

চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে সে টেবিলের উপর রাখে।

মনে হয়, তার মাথায় একটা ঝড় বয়ে যাওয়ার শব্দ, ক্রোধের চুল্লী জ্বলছে, দূর থেকে ভেসে আসছে একটি হুঙ্কার, আর কিছু সে দেখতে পায়না, ভাবতে পারেনা।

আজ রবিবার—কাল সোমবার ও সোমবার সকালে...

করুণা ঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে আটটা বেজেছে। কাল দশটার পরে যে কোনো সময়—যে কোনো সময়েই...। হ্যাঁ, সাড়ে পঁচিশ ঘণ্টাই তো বাকি।

লীনুর মুখের দিকে তাকাল করুণা। লীনুর কালো লম্বা রেশম-কোমল পক্ষ্ম তার গোল গালের সীমানায় একটি হালকা ছায়া ফেলেছে। চুলের দু'-তিনটে কোঁকড়ানো গুচ্ছ তার কপালে নেমে এসেছে। করুণার মনে পড়ে মিসেস দেওয়ানের কথা, "তোর মেয়ে যদি অন্তত ছ-সাত বছর বা তার চেয়ে বড়ো হত তাহলে একে আমি ললিতের বউ ক'রে নিয়ে যেতাম। লীনু মা, তুই সাত আট বছর আগে কেন জন্মালিনা?"

লীনু লজ্জা পেয়ে বলে, "জানিনা আন্‌টি, মা নিশ্চয়ই জানে। বলনা মা।"

কি জানি কি ছিল হাসি না কান্না, অশ্রু কি নিঃশ্বাস—করুণার গলায় এসে তা আটকে গিয়েছিল। করুণা একটা ঢোঁক গিলেছিল, গলায় আটকে থাকা কিছু একটা সে গিলে ফেলতে চেয়েছিল।

আনমনা হয়ে করুণা খবরের কাগজের পাতা উলটোয়। সপ্রু হাউসে ছোটদের জন্য দু'টো খুব ভালো ফিল্ম দেখানো হবে। "এই-ই ভালো, লীনুকে নিয়ে যাই। তারপর কি জানি..."

করুণা লীনুকে জাগায়। তাকে তৈরি হয়ে নিতে বলে। লীনু জিজ্ঞেস করে, "মা কোন ফ্রকটা পরি?"

করুণা আলমারি খুলে দেয়। লীনুর ফ্রক, স্কার্ট ও ব্লাউজ হ্যাঙ্গারে টাঙানো। করুণার নিজের কাপড়-চোপড় খুবই কম। সমস্ত কাপড় লীনুরই।

করুণা বলে, "যা তোর খুশী, পরে নে।"

লীনুর মুখের উপর একটা হালকা ছায়া ভেসে যায়। সে তার মার দিকে তাকায়। করুণা চোখ ফিরিয়ে নেয়, দু'পা পিছিয়ে টেবিল থেকে একটা বই অমনি উঠিয়ে সোজা ক'রে রাখতে থাকে। পিছনের খুটখাট থেকে সে অনুমান করে লীনু হ্যাঙ্গার থেকে পোশাক নামাচ্ছে। করুণা দেখতে পেল, সে কাঁচ-বসানো কালো স্কার্ট ও গাঢ় হলদে রঙের হ্যাণ্ডলুম সিল্কের ব্লাউজ নামিয়েছে।

কাপড়গুলো হাতে নিয়ে লীনু চুপচাপ অন্য কামরায় চলে গেল। কিছু দিন থেকে সে করুণার সামনে কাপড় বদলায়না। করুণা ভাবছিল, লীনুও অনুভব করতে শুরু করেছে সে বড় হচ্ছে। পাপলী কোথাকার, মার কাছেও লজ্জা। করুণার কাছে এই মুহূর্তটায় কষ্ট কিছু লঘু হয়ে গেল।

করুণা এখনো সেইভাবেই টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে—লীনু পোষাক বদলে আসে। করুণার আজ লীনুকে আগের চেয়ে অনেক বড় অনেক লম্বা মনে হয়।

কটোরিয়া টেবিলের উপর চা রেখে গিয়েছিল। করুণা বলে, "লীনু তাড়াতাড়ি দু'-কাপ চা তৈরি করো। আমি এখুনি আসছি।" লীনুর কাছ থেকে সে যেন মুখের উপর ঘনিয়ে আসা ছায়া লুকিয়ে রাখতে চায়।

টেবিলের সামনে বসে করুণা তার পেয়ালায় চামচ নাড়ছিল যদিও সে জানতো যে আধ চামচ চিনি কখন চায়ে মিশে গেছে। লীনু পরোটা ও মাখন খাচ্ছিল। হঠাৎ করুণা অনুভব করে লীনু নিজের দিক থেকেও খুব চেষ্টা করছে যাতে তার মুখেও কোনো রকম ছায়া পড়তে না দেখা যায়।

করুণার মনে হয় লীনু কয়েক দিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে, তার মতো বড়। দু'জনেই সমান বয়সের—কিশোরীও বটে—যুবতীও। একটা কথা যা তারা দু'জনেই জানে কিন্তু কেউ

বলেনা এবং দু'জনেই একে অন্যকে সান্ত্বনা দেবার সরলতার অভিনয় ক'রে চলেছে।

"লীনু, আরেকটু মাখন নাও।"

"দাও মা।" শুধু মাকে খুশী করতেই যেন সে মাখন খাচ্ছে।

"লীনু, তোমার দুধের পেয়ালায় ওভালটিন দিই?

"দাও মা।"

কালকে জানিনা... অনেক কষ্টে করুণা আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিল কিন্তু নিজেকে সংযত ক'রে নিল। সেজেগুজে দু'জনে সপ্রু হাউসে পৌঁছয়। হলের অন্ধকারের জন্য করুণা ফিল্মের নিকট কৃতজ্ঞ, ফিল্ম আর অন্ধকার সেই সাড়ে পঁচিশ ঘণ্টার কিছু অংশকে ভরাট করছে।

সিনেমা দেখার পর দু'জনে কুইন্‌স্‌ওয়ে গেল। করুণা লীনুকে মুক্তোবসানো মোটা জয়পুরী চুড়ি কিনে দেয়। একটা গল্পের বইও কেনা হল।

"কি খাবি লীনু?"

"কিছু না মা।"

কিন্তু কথাটা বলেই লীনু তার মায়ের মুখের দিকে তাকায়—কি যেন দেখে লীনু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "মা কোয়ালিটিতে যাবে, ডবল সাণ্ডে খাবো।"

লীনু ডবল সাণ্ডে নেয় ও করুণা এক পেয়ালা কফি।

টেবিলে, টেবিলের চারপাশে এক নির্মম নীরবতা। দু'জনেই অর্থহীন ভাবে এদিক ওদিক অন্য লোকদের দেখে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। কনট প্লেসে জীবনের বর্ণোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছে। অল্প একটু হাঁটার পর করুণা লীনুকে জিজ্ঞেস করে, "এখন বাড়ি যাবি, না কোথাও যেতে চাস?"

লীনু একটু ভেবে উত্তর দেয়, "রজনীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাই মা।"

করুণা চমকে ওঠে, "দেখা করে যাই"...তাহলে কি লীনুও ভয় পাচ্ছে....যদি...যদি....।

করুণা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চল যাই।"

রজনী যখন লীনুকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, রজনীর মা করুণার কাছে একটা মোড়ার উপর বসে বেশ রহস্যময় ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করেন, "শুনতে পেলাম..."

এই ধরণের রহস্যময় গলা আর এমনি সহানুভূতি করুণার দু'চক্ষের বিষ। কারো সামনে নিজের দুঃখের পাঁচালী গাইতে বসাটা করুণার মনে হয় যেন কোনো ভিখিরী নিজের শরীরের কুষ্ঠগ্রস্ত অংশটা পথচারীদের ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে।

করুণার ইচ্ছে হয় সেখান থেকে উঠে চলে যায়। কিন্তু তা হয়না। তাই রজনীর মার কথার মাঝখানেই সে বলে বসে, "হ্যাঁ কালই ফয়সালা হয়ে যাবে।"

"কালকেই তারিখ, না?" রজনীর মা কথাটা শুরু হওয়ার আগেই শেষ করতে চায়না।

"হ্যাঁ কালকেই..." করুণা এমনভাবে কথাটা বলে যে, রজনীর মা এরপরে কিছু বলার সাহস খুঁজে পায়না।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শীতও বাড়ছে। করুণা লীনুকে ডেকে পাঠায়, বলে, "চল মা, এবার ফেরা যাক।"

"হ্যাঁ মা আমিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" লীনু সহসাই নিজের ক্লান্তির বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে।

বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে গেল।

কটোরিয়া জিজ্ঞেস করে 'রুটি সেঁকে দিই বিবিজী?"

"তুই উনুনে চাটুটা বসিয়ে দে, আমি আসছি।"

করুণা নিজের হাতে চাপাতী তৈরী করে—নরম, গোল ফুল্‌কো। তারপর তাতে মাখন মাখায়। চাপাতী তৈরী করার সময় তার ভিতরে কি যেন মুচড়ে ওঠে, ঠিক যেমন তার ছেলেবেলায় বাবা

বাবলার দাঁতন দু'টুকরো করার সময় সেটা মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে দিতেন।

খাওয়া দাওয়ার পর লীনু নিঃশব্দে নিজের লেপের মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

এই নৈঃশব্দ খুব ভারী একটা শিলা, খুব বড় একটা পাথরের চাঙড়া যেন, যার সমস্ত ভার করুণার বুকে চেপে বসেছে।

"লীনু মা, তোর হাতে ক্রীম মেখে নিয়েছিস?" করুণা যেন সেই পাথরের চাঙড়াটা ভেঙ্গে ফেলতে চায়।

"ওমা! আমি ভুলেই গিয়েছি," লীনু তখুনি লেপ থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, যেন সবচেয়ে দরকারি কাজটাই করতে সে ভুলে গেছে।

"দাঁড়া, আমি দিচ্ছি।" করুণা আলমারি থেকে ক্রীম বের করে লীনুকে দেয়। সে যেন এই কাজটুকুর কাছে কৃতজ্ঞ যা এই মুহূর্তগুলির উৎকণ্ঠাকে একটু হালকা করতে পেরেছে।

ক্রীম লাগিয়ে লীনু শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে।

করুণাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

কত সময় পেরিয়ে যায় কে জানে।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

"হ্যালো" করুণা রিসীভার ওঠায়।

"হ্যালো করুণা, কি করছিস?"

"ও তোশী? কিছুই না, শুয়েছিলাম।"

"আমি সন্ধ্যেবেলা একবার রিং করেছিলাম। তুই বাড়িতে ছিলি না।"

"হ্যাঁ আমি ও লীনু একটু বেরিয়েছিলাম।"

"লীনু কোথায়?"

"ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"ও! ব্যস! ভাবলুম জিজ্ঞেস করি...যে...যে...তুই কি করছিস?"

"ওহ্, তোশী!" করুণা চায় যে তোশী তার সঙ্গে কোনো অভিনয় না করে। তোশী তাকে বড় ভালোবাসে—বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু।

"কিছুক্ষণের জন্য আমি আসি করুণা" তোশী যেন মিনতি করছে।

"আয়।" করুণা একটু থেমে বলে। যে কোনো কষ্টের সময় সে একা থাকতে চায়, কিন্তু তোশীর কথা আলাদা।

একটু পরেই তোশী এসে পড়ে।

"কার সঙ্গে এলি?" করুণা জিজ্ঞেস করে।

"ড্রাইভার এসেছে। নিচে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

দু'জনে নিঃশব্দে বসে থাকে।

"এক পেয়ালা কফি খাবি?" করুণা জিগ্যেস করে।

"কোনো দরকার নেই এ সময়," তোশীর গলায় কি যেন দলা পাকিয়ে ওঠে।

"ভাই, আমার প্রাণ চাইছে এক পেয়ালা গরম কফি খেতে।" করুণা যেন কিছু বলার খাতিরেই কথাটা বলে।

"আচ্ছা বাপু, ঠিকই আছে।"

ইলেক্‌ট্রিক কেতলীর প্লাগটা করুণা ওই ঘরেই লাগিয়ে দেয়—এসে ডিভানের উপর বসে পড়ে।

তোশী ক্ষণেকের জন্য করুণার দিকে তাকায় তারপরই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। এ সময় কোন ভাষায় সে কথা বলবে। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে ধীরে ধীরে সেটাকে ছাড়ে যাতে করুণা তার শব্দ শুনতে না পায়।

সেই জমাট ও ভারী স্তব্ধতার মাঝখানে দু'জনেই শুনতে পাচ্ছিল কেতলীতে গরম হওয়া জলের শব্দ। যদিও করুণা জানতো যে, কেতলীর জল এখনো ফুটে ওঠেনি, কেতলীর ঢাকনা উঠিয়ে সে ভিতরে উঁকি মেরে দেখল। জলের ছোটো ছোটো বুড়বুড়ি মুক্তোর দানার মতো দল বেঁধে ওঠানামা করছে। করুণা আবার ঢাকনা বন্ধ ক'রে দেয়।

"ঠাণ্ডায় গরম-গরম কফির পেয়ালা কি আরম যে লাগে," করুণা বলে।

"এবার তো আমারও ইচ্ছে হচ্ছে খেতে," তোশী বলে। হয়তো তার কফির প্রয়োজন মোটেই ছিল না।

করুণা রান্নাঘরে পেয়ালা আনতে যায়। তোশীও তার পিছনে পিছনে আসে।

কফি তৈরী হয়ে গেছে। হু'জনেই নিজের নিজের পেয়ালা নিয়ে চুমুক দিতে থাকে।

"করুণা, কিছু বল"—তোশী যেন তার নীরবতায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সহসাই করুণার হু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে। সে সময় না জানি কেমন করে তার কঠোর সংযম ভেঙে গিয়েছিল।

করুণার হাত কাঁপছিল। সে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে পেয়ালা। তোশী হাত বাড়িয়ে করুণার আঙুল ছোঁয় এবং হালকা হাতে নরম ক'রে সান্ত্বনার থাবড়া দেয়।

তোশী উঠে বাইরে যায়। কার স্টার্ট হওয়ার শব্দ শোনা যায়। ফিরে এসে তোশী বলে, "আমি ড্রাইভারের মুখে বলে পাঠিয়েছি যে, রাত্রে আমি এখানেই থাকবো।"

এ কথায় করুণা একটুও সান্ত্বনা পেলনা—বিরক্তও হল না। শুধু চুপ ক'রে বসে রইল। কোলের মধ্যে জড়ো করা হু'টো হাতের দিকে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

তোশী পেয়ালা তুলে তার হাতে দেয়। নিজের পেয়ালা নিয়ে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে শুরু করে।

"এত বছর ধরে আমি শুধু এই সময়ের এই মুহূর্তটাকেই ভয় ক'রে এসেছি। এই মুহূর্তকে ভয় পেয়ে আমি তেরো বছর ওই বাড়িতে কাটিয়েছি যেখানে রোজ আমি মরেছি—আমার মৃত্যু ঘটেছে প্রত্যেকটি দিন," করুণা তোশীর সঙ্গে ততটা নয় যত নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল।

তোশী চুপ ক'রে থাকে।

"যখনই সেই বাড়ির দরজার বাইরে যাওয়ার কথা মনে পড়ত, লীনুর মুখখানা আমার সামনে ভেসে উঠতো। এই মুহূর্তটার জন্যই আমার পা বাঁধা পড়ে ছিল।

"শোন করুণা, একবার সাহসে বুক বেঁধে তুই যখন এদিকে পা ফেলেছিস তখন মনে মনে হার মানিসনা।"

"না তোশী, আমি মনস্থির ক'রে নিয়েছি।" কিন্তু তার ভিতরে একটা টানা ছেঁড়া চলছে তখন।

সে উঠে কেতলীতে আরো জল ঢালে—প্লাগটা আবার বসায়। উঠে বসে সে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে—বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলোকে যেন সে জড়ো করতে চায়।

"উকিলের সঙ্গে দেখা করেছিস?"

"না, কাল করেছিলাম।"

"কিছু বলছিল?"

"সেই একই কথা—সন্তান মা বা বাবাকে, যাকে হয় দিয়ে দেওয়া যেতে পারে—জজসাহেবের মর্জী—যা সে ভালো বুঝবে।"

"জাহান্নমে যাক আইন-কানুন। সন্তানের উপর মার অধিকার নেই? মা প্রসব করবে, মানুষ করবে, সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে ..." তোশী তেতো গলায় বলে।

আর করুণার সেই সব কষ্টের কথা মনে পড়ছিল যা সে সহ্য করেছে। কেমন ক'রে সে লীনুকে বড় করেছে। কেমন ক'রে সে একাই মা ও বাবার ভালোবাসাও তাকে দিয়েছে। আনন্দের বুকে তার মেয়ের জন্য এতটুকু মায়া ছিল না। বাঘ-সিংহও নিজের ছানাদের ভালোবাসে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে কিন্তু এই আনন্দ...

"এই আনন্দটাও কি অদ্ভুত—ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলার কি পদ্ধতি ধরেছে। আড়াই বছরও হয়নি এই বাড়িটা গড়ে তুলেছিস। এখন

লীনুও বড় হয়েছে। এতদিন পরে একটু সুখের মুখ দেখতে পেয়েছিলি। আর এখন সে দাবী জানিয়ে বসল—আমার মেয়ে আমাকে দিয়ে দাও। কেউ জিজ্ঞেস করুক ওকে, তুই মেয়েটাকে ভালোবাসবি না, ওর প্রতিপালন করবি না, তার জন্য টাকা খরচ করবি না—এ দাবী শুধু দুঃখ দেওয়ার জন্য—না তো কি ?" করুণার মুখ দেখে আনন্দের উপর তোশীর আরো রাগ হচ্ছিল, সে আরো খিটখিটে হয়ে উঠছিল।

কেতলীতে জল ফুটবার শব্দ হয়। করুণা উঠে আরো দু পেয়ালা কফি তৈরী করে। নিজের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে সে ভিতরে ঢোকে। তোশী আস্তে আস্তে উঠে অন্য ঘরে উঁকি দেয়। করুণা লীনুর গায়ে লেপ টেনে দিচ্ছিল। তোশী চট ক'রে ফিরে এসে সোফায় বসে পড়ে। যখন করুণা ঘরে ফিরে এল তার অবরুদ্ধ অশ্রুর বেগ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, তার গালের শিরা তিরতির করে কেঁপে ওঠে। ডিভানে বসেই করুণা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তোশীও এসে ডিভানের উপর বসে পড়ে—নিঃশব্দে করুণার থরথর করা কাঁধ সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

"ভাবছি····যদি·····জজ আনন্দেরই হাতে লীনুকে দিয়ে দেয় ····আর··সে····লীনুকে নিয়ে যায়····তাহলে রাতে····রাতে তার গায়ে লেপ টেনে দেবে কে ?"

করুণা কোথাও লুকিয়ে কাঁদতে চায়। তার গলায় একটা জ্বালা।

করুণা নিজেকে সামলে নেয়।

"তোশ, তুই এখানে ডিভানের উপর ঘুমোতে পারবি তো ?" যদিও করুণা জানে যে তোশী রাত্রে ক্বচিৎ কখনো তার সঙ্গে থাকলে ডিভানের উপরেই ঘুমোয়। তোশী মাথা নেড়ে জানায় হ্যাঁ।

করুণা ভিতর থেকে একটা শাদা চাদর নিয়ে আসে। একটা লেপও। নিজের নাইট স্যুট তোশীকে দেয়, খালি পেয়ালাগুলো ট্রেতে রেখে রান্নাঘরে নিয়ে যায়।

বাতি নিভিয়ে খাটে শুয়ে পড়ে।

করুণা বুঝতে পারেনা সে কি চাইছে—এই রাত্রি হয় এতো দীর্ঘ হয়ে যাক যে কখনো না ফুরোয়, বা চোখের নিমেষে শেষ হোক্, ভোর হোক আর এই দমবন্ধ অবস্থার সমাপ্তি হোক। সে কিছুই চাইছেনা। সে কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না। সে কিছুই ভাবছে না।

রাত অনেক হয়েছে। করুণা ওঠে, উঠে নিঃশব্দে লীনুর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আলতোভাবে সে লীনুর গালে নিজের ঠোট ছু'টো রাখে।

প্রতারণা

আসাম থেকে ছুটিতে নিজের গ্রামে এলেই নসীব জম্মুওয়ালী বেবে*-র সঙ্গে দেখা করবে। বেবেও এক নিঃশ্বাসে এক ঝুড়ি আশীর্বাদ ক'রে ফেলতো। "কবে এলি রে আমার রাজমহলের টিয়ে? তোর চাকরীর এখনো কদ্দিন বাকী? বিদেশে থাকা তো জেল খাটার সমান। কিন্তু এতো এমন কিছু খারাপ নয় কাজটা? পেটের জন্য দুনিয়া অনেক কিছুই করে।"

নসীব হুঁ-হ্যাঁ ক'রে জম্মুওয়ালী বেবের সব প্রশ্নের জবাব দিত। আসলে সে এই ধরণের কথাবার্তা বলতে যেতনা। যেত শুধু কর্তব্যের খাতিরে, বুড়ি মনে মনে ভেবে না বসে যে অমুকের ছেলে চাকরী পেয়ে লোক-লৌকিকতাও ভুলে গেছে।

বেবের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তার মন ঘুরে বেড়াত আসামে, নদীতে পুল তৈরীর গর্তগুলোর চারধারে। কে জানে কোন জাদু জানে ঠিকাদার সন্তরাম—একটা পুল তৈরী হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একটি পুলের ঠিকে পেয়ে যাচ্ছে। ঠিকাদারীর কাজে তাগড়া-তাগড়া জোয়ান মরদের দরকার। সন্তরাম একবার গ্রামে গ্রামে ঘুরে আসে এবং তাগড়া জোয়ান লোকগুলোকে কুড়িয়ে কত শত মাইল দূরে নিয়ে চলে যায়। নসীব তার প্রথম কণ্ট্রাক্টের সময় থেকেই আছে।

নসীব এবার যখন তার বোনের বিয়েতে গ্রামে এলো; খবর পেল জম্মুওয়ালী বেবের অর্ধাঙ্গ পড়ে গেছে। সে শুনল বেবের শরীরের একটা দিক অবশ হয়ে গেছে—শরীরের সেধারটা অন্যের সাহায্য ছাড়া নাড়াচাড়া করতে পারেনা। কড়ে আঙুলের ক্ষমতাই বা কতটুকু কিন্তু বেবের পক্ষে সেই আঙুল নড়ানোও মুশকিল। দিন-রাত সে খাটে শুয়ে থাকে—ছেলেরা সে খাট

---

* বেবে = মা

পেতে দিয়েছে খড় গাদা করা কুঠরীতে। ছেলেরা আগেই তার অবাধ্য ছিল কিন্তু এখন বউরাও তার সুবিধা-অসুবিধা দেখেনা। খড় গাদানো কুঠরীর চারপাইতে শুয়ে শুয়ে বুড়ি ওৎ পেতে থাকে কখন তার চার বেটার বউয়ের মধ্যে কারো বউ সেধারে আসে তাহলে সে মনের ঝাল মিটিয়ে নেয়। বুড়ির মনে হচ্ছে তার অসুখ হওয়ার পর বাড়িতে কোনো কাজই ঠিকভাবে হচ্ছে না। ভাবে গরুকে মোষের নাদার সামনে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং গরুকে ছাগল বাঁধবার খুঁটোতে।

প্রায়ই ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বলতে শোনা যায়, "এই লাফ মারা গুলোকে মুরগীর খুপরীতে কেন ঠুসে দিচ্ছিস? আর এই বড় মোরগটাকে শিকল দিয়ে কেন বাঁধছিস?" আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি সে ভাবতে থাকে ছোট বউ বড় বউয়ের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়েছে এবং বড় বউ মেজো বউয়ের খাটে। কিন্তু সে তো উঠতে পারে না। তাই সব কিছুই সে মনে মনে ভোগ করে।

ছেলেরা বেবের অসুখে কষ্ট পায়। হয়তো কেউ এসে পরামর্শ দিল বেবেকে জংলী পায়রার মাংস খাওয়ানো হোক; তারা আশে-পাশের সমস্ত অন্ধ কুয়োগুলো থেকে এক এক ক'রে সমস্ত পায়রা মেরে আনে। কেউ এসে বলে ইন্‌জেকশন দাও। তারা নিজের সামর্থ অনুযায়ী যতগুলো পারে ইন্‌জেকশন লাগায়। সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে ছোট-খাটো খরচে কী বা এসে যায়। জানতে পারলেই হল যে, কি করলে বাড়ির এই কষ্ট দূর হতে পারে। কিন্তু এখন বেবেও বুঝতে পারে যে তার অসুখ চিকিৎসার বাইরে। হতাশ হয়ে যাওয়ার পরে তার মাথায় আগের চেয়ে বেশী উলটো-সোজা খেয়াল চাপতে আরম্ভ করেছে। যে কথাগুলো নিজের বেটার বউদের সম্পর্কে, আর সত্যি কথা বলতে কি গ্রামের সব বউগুলোর বিষয়ে তার মনের মধ্যেই চাপা থাকতো এখন সেগুলো বিভিন্ন রূপ ধরে বেরিয়ে আসতে থাকে। গাঁয়ের কোনো লোকই তার খোঁজ নিতে আসেনা। ছেলেমেয়েরা খাবারটা তার শিয়রে

রেখে সরে পড়ে। শুধু নসীবের মত কোনো লোকই বসে তার সঙ্গে কথা বলে, যে ক'মাস বাইরে কাটিয়ে কালেভদ্রে ছুটিতে গ্রামে এসেছে।

জম্মুওয়ালী বেবের কথা শুনে নসীবের বড় কষ্ট হয়। একটা ঘুরপাক খেয়ে বেড়ানো জলজ্যান্ত মানুষ, গাঁয়ের প্রত্যেকটি প্রাণীর খোঁজ খবর না নিয়ে যে ঘুমোতে পারতোনা, সারাদিন চারপাইতে কেমন করে শুয়ে থাকতে পারে? নইলে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে কেউ মারা গেলে সে সবচেয়ে আগে গিয়ে পৌঁছয়নি? কোন বাড়ির বে-থাতে তার পরামর্শ নেওয়া হয়নি? এমন কোন দেয়াল আছে যা তার পরামর্শ না নিয়ে গাঁথা হয়েছে? এমন কোন কুয়ো আছে যার দড়ি ছিঁড়তে সে দেখেনি? চকবন্দির সময় সে প্রত্যেকটি জমির টুকরোর দাম জনতো—এমনকি প্রত্যেকটি কুয়ো বা প্রত্যেকটি গাছের যে মূল্য নির্ধারিত করা হয়েছিল, তাও পাকা-পাকি হয়ে তার মাথায় গেঁথে গিয়েছে। এ তারই সাহসের পরিণাম যে, তার ছেলেরা ভালো ভালো জমিগুলো পেয়েছিল। সে জানতো কোন স্কুলমাষ্টার কোন মেয়ের দিকে রাস্তা পেরোবার সময় তাকায় বা গাঁয়ের পাটোয়ারীর কার বাড়িতে আনাগোনা। অসুখে পড়ার আগের কথা—পনেরো বছরের এক জাঠের ছেলে তেরো বছরের ঝীঁবর মেয়ের কলসী উঠিয়ে দেবার সময় বলেছিল যে এত ভারে মেয়েটার কোমর মচকে যাবে তখন আর কেউ জানুক বা না জানুক, জম্মুওয়ালী বেবে জেনে গিয়েছিল যে ঝীঁবর মেয়েটা জবাবে বলেছিল, জাঠেদের ছেলেদের সে কোলে তুলে নিতে পারে। অথচ এই ছ-মাস ধরে বেবে অসুখে শয্যাশায়ী—সে কি জানে—ঝীঁবরদের সেই মেয়েটা জাঠেদের ছেলেকে কাঁকালে নিতে পেরেছে কিনা?

নসীবের মন খারাপ হয়ে গেল। বেবের সঙ্গে যখন সে দেখা করে বেবে তাকে ছ-মাস থেকে মনের মধ্যে আগড় দেওয়া কথা শোনায়। সে বছর আবহাওয়াটাও বড় খারাপ। বৃষ্টি আর

বৃষ্টি। ফলন্ত শষ্য পোকা-মাকড়ে কুরে কুরে খেয়েছে আর কেটে তোলা শষ্য পঙ্গপালেরা। পঙ্গপাল নিমগাছের পাতাও বাদ দেয়নি। সমস্ত গাছ-পালা ন্যাংটো—ন্যাড়া। তার উপর জ্যোতিষীরাও নিশ্চিন্ত বসে থাকতে দিচ্ছেনা। বলে, অষ্টগ্রহ একসঙ্গে মিলিত হবে যা আজ পর্যন্ত হয়নি। ছোটরাও জানে, জল, হাওয়া ও মাটি একাকার হয়ে মিশে যাবে। একথা আলাদা যে রোজকার জীবন আগের মতই অব্যহত। জাঠরা সেই পুরোনো উদ্যমেই পঙ্গপালের কবল থেকে শষ্য বাঁচাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা কুয়োর পাড়ে, চিড়ে-মুড়ির দোকানে, আগেকার মতই, দেখা করে আর অগোচরে চোখে চোখে কথা সেরে বালতি ধরে বা ছোলাভাজা নিয়ে চিবুতে চিবুতে ফিরে আসে।

এসব কথার কোনোটা বেবের কানে পৌছয়, কোনোটা পৌছয় না। হ্যাঁ, একটা গরম গুজব সমস্ত পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়েছে—বেবের কানেও গিয়েছে। লোকেরা বলাবলি করছে, ভাখড়া হ্রদে এতো জল দাঁড়িয়েছে যে, ভাখড়া বাঁধ আর সেটা বেশীদিন ধরে রাখতে পারবেনা। ছোটরাও জানে বাঁধ ভাঙলে কি সর্বনাশ হবে। সারা পাঞ্জাবের রাণীর মত ধরিত্রী বন্যার তোড়ে ভেসে যাবে। বাবলা ও কুলগাছ কেন, অশ্বত্থ ও বটগাছও শিকড় শুদ্ধ উপড়োবে। উর্বর ও অনুর্বর জমিতে কোনো পার্থক্য থাকবে না। জল ও হাওয়া, নদীর পথও বদলে দেবে। বেগবতী জলধারার সামনে ছোট ছোট ডোবাখানাই বা কী? এখন নদী-নালা মহাসড়কের মত সোজা বইবে। মনে মনে সবাই ভয় পায়। কিন্তু বাইরে সবাই হাসে। এই প্রলয়-ভীতির মাঝখানে শুধু শিশুরাই নির্ভীক। কোনো পথিক আখরোট খেলায় মেতে থাকা ছেলেদের জিজ্ঞেস করেছিল তারা এই ঝড়ে এত হট্টগোলে মেতে খেলছে কেমন করে? তাতে একটি ছেলে বেপরোয়া জবাব দিয়েছিল, "খেলবো না তো করবোটা কী? বাবা বলেছে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে।" নসীব দোমনা হয়নি। জম্মুওয়ালী বেবে খুব

খুশী যে, অন্য লোকদের মত ভয় পেয়ে নসীর বোনের বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দেয়নি। তার ভালো লাগছে যে, সে ছেলেদের বলে কয়ে মেয়েটার বিয়েতে গিয়ে বসবে। যদি লোকেরা তার কথা শুনে বা না শোনে তাতে ক্ষতি কী? বলবার সুযোগ তো হবে।
শোনে তাতে ক্ষতি কী? বলবার সুযোগ তো হবে।

"বাবা, তুই এসেছিস একটা কাজে। আমাকে মেয়েটার বিয়েটা অবিশ্যি দেখাস। এই কুঠরীর মধ্যেই পড়ে থাকি। দিনের বেলা আমাকে পিঁড়িতে বসিয়ে ছাদনাতলায় নিয়ে যাস। কি জানি আরো কদ্দিন বেঁচে থাকতে হবে। মরার আগে গাঁয়ের মুখ তো দেখতে পাবো।"

এই বলে জম্মুওয়ালী বেবে চুপ করেছিল। এর চেয়ে বেশী কিইবা সে বলতে পারে? তারপর তার খেয়াল হল নিজের অসুখের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা যাক। কেউ কি এখনো পক্ষাঘাতের চিকিৎসা বের করতে পারেনি? কোলকাতাতেও কি এর ওষুধ পাওয়া যায় না? ওষুধ খেয়ে কি আবার সে গ্রামের সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না? কোনো রকমে কি তার কায়াকম্প হতে পারে না যাতে করে আগের মত সুস্থ সমর্থ হয়ে সে তার ঝুরঝুরে পরিবারটা বা ইতস্তত ছিটকে পড়া গ্রামটাকে আবার নিজের মুঠোর মধ্যে বাঁধতে পারে? তার রোগের ওষুধ নিশ্চয়ই কোথাও আছে। ঠিকেদার সন্তরামের কাছে নিশ্চয়ই এমন কোনো জিনিস পাওয়া যেতে পারে যাতে করে সে আবার আগেকার মত সুস্থ হয়ে উঠতে পারতো। সন্তরাম গাঁয়ের অর্ধেক লোককে উদ্ধার করেছে; সে কি একটা বুড়ীর মিনতি শুনবে না? বেবে চায় যে, মিস্ত্রী সন্তরাম ও নসীব, দু'জনে মিলে ঈশ্বরকে ঘাড় ধরে বেবের কাছে নিয়ে আসুক, বেবের পায়ে কাছে মাথা নিচু ক'রে নিজের দেওয়া অসুখ ফেরৎ নিয়ে যাক। বেবের চোখে সন্তরাম সেই ওঝা যে, সাপে কামড়ানো লোকের চিকিৎসার জন্য সেই সাপকেই বেঁধে

আনবে যে সাপ তাকে কামড়েছে। আর ওঝার হুকুমে সাপ নিজের বিষ চুষে বের ক'রে ফেলবে।

প্রথমে বিয়েতে যাবার কথায় তারপর এই ব্যাপারে রাজী হয়ে যাওয়ায় বেবের মুখের উপর একটি উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। নসীবের মনে হয় বেবে তার অর্ধেক শরীর নিয়েই উঠে হাঁটতে শুরু করবে। নসীব তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, আজকের জগতে কোনো রোগ ব্যাধিই অসাধ্য নয়। ডাক্তারদের কাছে প্রত্যেক অসুখের চিকিৎসার বিধান আছে এবং এজন্য বেবের এত হতাশ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু শুনে বেবের মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন একটু কমে এলো। যেন সে সম্পূর্ণ সুস্থও হয়ে উঠতে চায় না। ছয়মাসে তার কল্পনা অনুসারে পৃথিবীটা এত বদলে গেছে যে, বেবে তাকে আর আয়ত্তে আনতে পারবে না। তার ছেলে, বেটার বউ, আত্মীয়-স্বজন—সবাই বদলে গেছে। (সে তাদের কেমন ক'রে বাধ্য করবে।) বেবেকে আগের মতই শ্রদ্ধা ভক্তি করতে। গাঁয়ের আরজিনবীশ বলতো যে, সে যদি চারদিন কাজে না যেত তাহলে মহকুমার সমস্ত দুনিয়াটাই বদলে যেত। তার পুরোনো মক্কেলও অন্য কোনো আরজিনবীশকে দিয়ে কাজ করাতে আরম্ভ করতো। তারপর বেবে আজ ছ-মাস ধরে অসুস্থ। কে জানে তার দুনিয়াটা এখন কার অধিকারে। বেবে সেই জগৎটাকে ভয় পায় যার উপর সে ভালো হয়ে ওঠার পর আর প্রভুত্ব করতে পারবে না। এখন তাকে আর কে চেনে? বিষণ্ণ হয়ে যায় সে। কোনো বিয়ের সঙ্গে তার আর কি সম্বন্ধ? কারো আনন্দ-উল্লাসে তার কি আকর্ষণ থাকতে পারে যখন তার নিজের অবস্থা মৃত পরিত্যক্ত মানুষের চেয়েও খারাপ?

নসীব চুপ ক'রে জম্মুওয়ালী বেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কপালে তার মনের চিন্তাগুলো ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে। তার চোখ দু'টি দূর শূন্যে। সে নিজের অন্তরের চোখ দিয়ে অষ্টগ্রহে ভীত লোকদের পালাতে দেখতে পায়। সে দেখছিল, অনেক লোক নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের

আস্তানা উঁচু উচুঁ টিলার উপর গেড়েছে। তার মনে হচ্ছিল তার সমস্ত পরিবার তাকে খড়ের কুঠরীতে ছেড়ে মাতাবানীর টিলার উপর গিয়ে বাস করছে। সে দেখতে পায়, তার পরিবারের একটি সদস্যেরও তার প্রতি কোনো টান নেই।

পরমাত্মার লীলা অশেষ, যিনি ভাখড়ার ঝিলে অফুরন্ত জল এনে তাকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন। বেবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ঝিলের জল পৃথিবীতে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে—যেন ভিতর থেকেই জল পাক খেয়ে উঠছে। সে জানতো এই ধরণের গুজব কখনো মিথ্যে হয়না। সে নিজের যৌবনে কোয়েটার ভূমিকম্পের অনেক খবর শুনেছে। তখন তা শুনে তার খুব দুঃখ হয়েছিল কিন্তু ভাখড়ার বাঁধ ভাঙা তার মনে হচ্ছিল একটা দৈব ঘটনা, যা এক ধাক্কায় সমস্ত পাঞ্জাবকে মুক্ত ক'রে দেবে। যে ইঞ্জিনিয়ার এত জল আটকে রেখেছে তার সঙ্গে দেখা করতে বেবের ইচ্ছে ক'রে। কোনো শুভলগ্নে যখন বেবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে যাবে তখন এই বিরাট বাঁধটা পলকা মাচার মত হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে বেবের বিশ্বাস এই ইঞ্জিনিয়ার সেকথা নিশ্চয় জানতো।

বেবে শূন্য থেকে চোখ সরিয়ে কাছে দাঁড়ানো নসীবের দিকে তাকায়, বলে, "হ্যাঁরে, এই ভাখড়া বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার কথা জানিস নিশ্চয়ই? কদ্দিন আর বাকি আছে বলতো? এই অলক্ষুণে বাঁধ আরো কিছুদিন টিঁকবে কিনা?" নিজের বুকে অনেকখানি ভার নিয়ে সে এই অন্তিম শব্দগুলো মুখ থেকে বের করে যাতে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নসীব না বুঝতে পারে, ভাখড়া বাঁধ ভাঙার ব্যাপারে বেবে সুখী। নসীব বেবের মনের মধ্যে টগবগ করে ওঠা ভাখড়া সম্পর্কিত কথাগুলো আঁচ করতে পারেনি। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। সে জানতো যে সুদূর ভবিষ্যতেও এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। "কি হয়েছে তোমার বেবে? মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো। বাঁধ-টাঁধ কিছুই ভাঙবেনা। এ গুলো কি যে-সে লোকে বানিয়েছে? এতে বড় বড় কারিগরের হাত আছে। যে লোকগুলো ইতর তারাই এই

সব গুজব রটায়। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও—শান্তিতে।" বেবেকে সে ভরসা দেয়।

নসীব দেখতে পায় বেবের মুখ তুলোর মত শাদা হয়ে গেছে। তার শরীরের একদিকের নাড়ী তীব্র গতিতে চলতে শুরু করে। "এঁ্যা? বেবের বুক ধুকধুক করে ওঠে ও সে এমনভাবে কথা বলে যেন কেউ তাকে দারুণ ঠকান্ ঠকিয়েছে। সে নিস্পন্দ হয়ে চারপাইয়ের উপর এলিয়ে পড়ে যেন তার শরীরের জীবিত অংশটুকুও প্রাণহীন হয়ে গেছে।

মরণ ঋতু

মাঝরাতে রচনা স্বপ্ন দেখল তার পায়ে সাঁপ কামড়েছে।

চমকে জেগে ওঠে সে।

উঠে বসে।

লাইট জ্বালায়। পায়ে হাত দিয়ে দেখে। বিছানা ঝাড়ে। কিন্তু এতো শুধুই স্বপ্ন।

বোধহয় কালকের কথাটা তার মনে বিঁধে ছিল। সিনেমা যাওয়ার সময় একটা ফুল ছিঁড়ে সে যখন চুলে লাগাচ্ছে মা বলেছিলেন, "অন্ধকারে গাছপালায় হাত দিতে নেই। শ্রাবণ মাস। গাছপালা থেকে সাপ-খোপ বেরোতে পারে।"

"মেঘের মাস শ্রাবণ। বৃষ্টি হয়। ফুল ফোটে। জল পেয়ে সমস্ত গাছপালা সতেজ হয়ে ওঠে। দোলনা টাঙানো হয়। পিঠে তৈরী হয়। তীজ* উপলক্ষে ভাইয়েরা এসে বোনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে যায় আর, আর...এই মাসেই অনেক সাপ বেরোয়", রচনা ভাবতে থাকে।

দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে।

ডানা ঝাপটে একটা অচেনা কালো পাখী রাতের অন্ধকারে তার বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

"এ রকম স্বপ্ন কেন দেখলাম? সাপে কামড়ালে মানুষ মরেও যায়। কিন্তু আমি তো মরতে চাইনে। এখনো আমার মরবার সময় আসেনি।"

"মরণের কোনো ঋতু হয় কী?" রচনা নিজেকেই জিজ্ঞেস করে।

কল থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে টপ-টপ।

মন আবার স্বপ্নের দিকে বাঁধ নিলো।

"হ্যাঁ, সময় শুধু বাইরের নয়। মনেও এ ঋতু আসে, তার মধ্যে

*তীজ = ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া

এমন লগ্ন আছে যেখানে দাঁড়িয়ে এপার-ওপার কিছুই দেখা যায় না। যে ঋতু বন্ধ্যা, যে ঋতুতে তীব্র হাওয়া ঝাপটা দেয়, ভূত-পেত্নী নেচে বেড়ায়। সেই হলো মরণ-ঋতু।" রচনা তার শ্বাস-প্রশ্বাসে অন্ধকারের চাপ অনুভব করতে করতে ভাবে।

"কিন্তু আমি তো এ সময় মরতে চাইনে। এপারে আমার সঙ্গে রয়েছে অরবিন্দ। ওপারে আমার ভবিষ্যৎ। পথ ফুলে ঢাকা। একটি ফুল অরবিন্দ আমার চুলে গুজে দিয়েছে।"

একটি জোনাকী তার লণ্ঠন নিয়ে উড়লো, এখানেই ঘুরছিল, তারপর কোথায় চলে গেল।

রচনার আবার মনে পড়ে গেল স্বপ্নে দেখা সাপ। "সারা পৃথিবীতে এক আমাকেই কেন কামড়াতে যাবে? আমার কি দোষ? এ তো ওর স্বভাব...অরবিন্দের স্বভাব কত ভালো—যেন শীতল জলের ঝরণা। নদীতে বন্যাও আসে। লোক ডুবে মরে... না, আমি ডুবে মরতে চাইনা।"

অন্ধকারে বসে থাকা কালো বেড়ালের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

"আজ আমি কি সব ছাইপাঁশ ভাবছি।" রচনা ভাবে, পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু....আজ, এখন কেন জানিনা এত মনে পড়ছে অরবিন্দকে। অরবিন্দের বাগদত্তা সে। এখন সে দশ মাইল দূরে অন্য এক শহরে। ঘুমোচ্ছে।

"কি জানি, হয় তো আমাকেই স্বপ্ন দেখছে" এই ভেবে মনটা তার প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

আকাশে হেঁটে হেঁটে চাঁদ এখন ঠিক তার বাড়ির উপরে এসে পৌছেছে।

"কিন্তু এত সাত তাড়াতাড়ি চাঁদটা যাচ্ছে কোথায়? অরবিন্দের শহরের দিকে?" ভেবে রচনা আবার একটু হাসলো।

অরবিন্দ তাকে এই বলেই খেপায়। তার সামনে এলেই রচনা হেসে ফেলে। সে মুখটা গম্ভীর করে ফেলে কিন্তু না হেসে পারে না।

ঘুম আসছে না। সে উঠে বসে। হাওয়ায় হেনার সুঘ্রাণ। লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে সমস্ত গন্ধটা ভিতরে টেনে নেয়।

"কিন্তু বলা হয় হাসনুহেনার গন্ধে গাছতলায় সাপ আসে—হ্যাঁ সাপ।"

রচনা উঠে আলো জ্বালে। কুঁজো থেকে গেলাসে জল ঢেলে খায়। তারপর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে বসে পড়ে।

পাঠ করায় মন বসেনা। কি জানি কি যেন তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে।

স্টেশনে গাড়ীর তীক্ষ্ণ চিৎকার।

এ চিৎকার আজ তার বড়ই অচেনা ও ভয়াবহ মনে হয়।

"মা, চায়ের জল চাপিয়ে দি? সে তার মাকে জিজ্ঞেস করে। মা জেগে গেছেন।

"আজ এত তাড়াতাড়ি কেমন করে উঠলি? যা পড়তে বোস। চা আমি তৈরী করছি," বলে মা উঠে বসলেন।

রচনা চান করতে স্নানঘরে ঢোকে! চান করে তৈরী হয়ে নেয়। চা খায়। খবরের কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়।

ঠাকুমাকে রামায়ণের এক অধ্যায় পড়ে শোনায়। কিন্তু এখনো কলেজে যাওয়ার সময় হয়নি।

দিনের গতিটা বড় শ্লথ আজ।

কলেজের দিকে রওনা হয়। বাসের আড্ডার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় অরবিন্দের কথা মনে পড়ে।

অরবিন্দের শহরে যাওয়ার বাস হর্ণ দিচ্ছে। যেন রচনাকে ডাকছে সে।

রচনা তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ে।

"অরবিন্দকে কি বলব, কেন এসেছি?" এ ভেবে সে নিজের উপর রেগে ওঠে।

"বলব, খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম—সে ঠাট্টা করতে শুরু করবে।"

এখনো তার ঘুম নিশ্চয়ই ভাঙেনি। দশটায় আপিস। এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে অরবিন্দের শহর এসে যায়।

টার্মিনাস থেকে অল্প একটু দূরেই অরবিন্দ থাকে।

বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে একটা পাখী মারা গেছে। তারেই ঝুলছে।

অরবিন্দের বাড়ি এসে গেছে।

রচনা ধীরে ধীরে দরজায় ঘা দেয়।

"কে ?" অরবিন্দ ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করে।

রচনা কিছু না বলে আবার কড়া নাড়ে।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর আবার সে কড়া নাড়ে। এবার বেশ জোরের সঙ্গেই অরবিন্দ দরজা খোলে।

রচনা হাসে।

অরবিন্দ কেমন ঘাবড়ে যায়।

রচনা তাকে একধারে সরিয়ে ভিতরে ঢোকে।

ভিতরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়ায়।

"রচনা...এ হলো সুষমা—আমাদের আপিসের স্টেনো...রাত্রে ....রাত্রে দেরী হয়ে গিয়েছিল...আমি বললাম...বললাম...আপিসের দরকারী কাজ ছিল করার..." অরবিন্দ বিমূঢ় অবস্থায় কি জানি কি বকে চলেছে।

রচনা একবার সুষমার দিকে চেয়ে দেখে তারপর ঘাড় সোজা করে বলে, "আমি রচনা। অরবিন্দের বাগদত্তা।"

তারপর গভীর দৃষ্টিতে সে অরবিন্দের দিকে তাকায়।

অরবিন্দ যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

"ক্ষমা করো, খবর না দিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি," বলে সে না দাঁড়িয়েই ফিরে এলো।

অরবিন্দ তাকে ডাকছিল। কিন্তু সে অনুভব করছিল, "আমি

রচনা নই। ও অরবিন্দ নয়। কোথায় এসেছি আমি? এরা কারা? এ কোন ঋতু? এপার ওপার কিছুই যে দেখা যায়না।"

তার মনে হয় তার মাথায় একটা ঝড় বইছে। তাতে ভূত-পেত্নীরা নাচছে।

শহরে ফিরে যাবার বাসে উঠে সে বসে পড়ে। নিজের পায়ের দিকে তাকায়, যেখানে রাতে স্বপ্নে সাপ কামড়েছিল। সে অনুভব করে সাপে কামড়ানোর বিষ এখন তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে।

সধরাঁ মাঙ্গী

পৌষের কনকনে শীতের রাত সধরাঁ মাঙ্গীয়ের শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। তার মুখের মধ্যে অবশিষ্ট দু'তিনটে দাঁত ঠকঠকিয়ে বাজতে থাকে। হাত-পা অসাড় হয়ে রয়েছে। এই ঘোর শীতে তার নাক আর মুখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। থেকে থেকে পথ দেখার জন্য সে চোখ মোছে কিন্তু চোখের জল আটকাতে পারে না। যতই শীত তার বেশী ক'রে লাগে ততই জুতো ঘসটাতে ঘসটাতে জোরে চলার চেষ্টা করে সে। চটের টুকরো শরীরে জড়িয়ে, হাতে লোহার পাত ও ছোট্ট চটের থলে নিয়ে চারিদিকে চোখ রেখে ইয়ার্ডে গিয়ে ঢোকে।

সারা ইয়ার্ডে কবরখানার নিস্তব্ধতা। কোথাও শব্দ নেই। শাঁ শাঁ করা ইয়ার্ডে আজ ঢের বেশী ভয়ানক ও খালি খালি লাগে। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীগুলোর ছায়ায় চলতে চলতে সে ভাবে, "সকাল হব হব অথচ ইয়ার্ডে একটাও লোক দেখা যাচ্ছেনা—ইঞ্জিনের শান্টিং-এর আওয়াজও শোনা যাচ্ছেনা। শীত আজ সবাইকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছে। ভয়ের চোটে কেউ বাইরে মুখও বাড়াচ্ছে না। যারা ডিউটি দেয় তারাও এমনি রাতে পাহারায় গাফলতি করে। সরকারী এই চৌকিদারগুলো গায়ে ব্রাণ্ডী (ওভারকোট) চড়িয়ে গদীআলা গাড়ীগুলোতে উঠে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকায়। কার দরকার পড়েছে এই কনকনে শীতে বাইরে হাতটাও বের করবে? এ দারুণ শীতে কে কাকে জিজ্ঞেস করে! সবাই নিজের নিজের প্রাণটি বাঁচিয়ে চলতে চায়। এক আমিই এমন হতভাগী দিনে রাতে যার এটুকু সোয়াস্তি নেই, গত জন্মের খারাপ কাজগুলোই যেন সামনে জেগে ওঠে। সারা জীবনে একদিনও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিইনি। সব মরে-হেজে আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। এক একটা কয়লার টুকরোর পিছনে দৌড়ে নিজের যৌবন ক্ষয় করেছি।" এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সধরাঁ মাঙ্গী রেল

লাইনগুলো পেরিয়ে যায়। বিদ্যুতের আলোতে চকচকে লাইন-গুলো হাঁ করা কিলবিলে সাপের মত মনে হয়। এই কিলবিলে সাপগুলোই বহুবার তাকে এগোতে দেয়না এবং সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয় নিজেকে।

ইয়ার্ড থেকে কয়লা কুড়োতে কুড়োতে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে সধরাঁর। দিল্লী স্টেশনের কয় মাইল লম্বা ইয়ার্ডের প্রত্যেকটি জায়গা তার চেনা-জানা। সে এও জানে, কোথায় আছে লাইনের ক্রসিং, কোথায় আছে বড় কাঁটা কোথায় আছে ছোট কাঁটা, কোন জায়গায় চৌবাচ্চা আছে আর কোনখানে ময়লা জলের পিট। সে এও জানতো কয়লা ওঠাবার সময় যদি তার পিছনে কোনো চৌকিদার তাড়া করে তাহলে কয়লা কোথায় লুকিয়ে ফেলতে হবে, নিজে পালিয়ে কোনখানে লুকোনো উচিত, ধরা পড়লে চৌকিদারের সঙ্গে কেমন ক'রে কথা বলা উচিত, হাবিলদারের মুখোমুখি এসে পড়লে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত, ক্লীনারকে কেমন করে বকতে হয়, ফিটারের সঙ্গে কেমন হেসে-হেসে কথা বলতে হয়। বহুবার নিজেকে বিপন্ন করেও সে কয়লা বাঁচিয়েছে। কয়লা তুলে সে শান্টিং করা ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, পিছুলাগা লোকদের কাছে ধরা পড়েনি। প্রায়ই সে ভাবতো, "এই পয়সা নেওয়া লোকগুলো কত ভালো, এক আনা দু'আনা ছুঁড়ে দাও ও ঝুড়ি ভরে কয়লা নিয়ে যাও। ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানকে দু'আনি দেখিয়ে দিলে সে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে কোত্থেকে না-জ্বলা কয়লার স্তূপ জড়ো করে দেয়। কিন্তু এই সৎ লোকগুলোই খারাপ, এদের পেট কিছুতেই ভরেনা। এরা বলে যা কিছু তোমার কাছে আছে সব দিয়ে যাও। যদি কিছুই না থাকে তাহলে এসো খালি গাড়ীতে আমাদের কথা শুনে যাও। কুকুর, নীচ, এদের না মা আছে, না মেয়ে, এই আটকুড়োদের শুধু মাংস চাই, বুড়িই হোক্ আর ছুঁড়িই হোক্। মাংসখেকোর আবার কি? সে নিজের খিদে মেটায়.... জানে শুধু সে, যার হাড় মড়মড়িয়ে ওঠে...কিন্তু এখন তার দিকে

কেউ ফিরেও তাকায় না, সবাই বকুনি দিতে দড়ো, ধাক্কা দেয়, নোংরা নোংরা কথা বলে....।" এই সব ভাবতে ভাবতে সধরাঁ মাঈ আবার নিজের চোখ থেকে গড়িয়ে আসা জল মোছে। তার মনে হয় যে, তার মুখের বলিরেখাগুলো শীতে আরো শক্ত হয়ে গেছে। সে আবার ভাবতে শুরু করে—এমন দিনও ছিল যখন সে নিজের যৌবন লুকিয়ে বেড়াত ও ঈশ্বরের কাছে বার্ধক্য কামনা করতো। "এই যৌবনের মুখে আগুন যে আমাকে কোথাও দাঁড়াতে দেয়না...." কিন্তু বার্ধক্য তার চেয়েও খারাপ। "এখন সবাই আমাকে দূর দূর করে...লোকে বলে, জরা অভিশাপ...পয়সা ও যৌবন দু'ইই নির্লজ্জ...এখন আমার পয়সাও নেই, যৌবনও চলে গেছে, কোন মুরোদে কথা বলি? পয়সা সব বুদনের অসুখে খরচ হয়ে গেছে। যে বিপদগুলো থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম তারা আবার আমার কাঁধে ভর করেছে...কত ধান্দা করে স্বামীর মরার পর সে গতর খাটিয়ে বুদনকে বড় করেছে, নিজের শরীর বিক্রী ক'রে তাকে চাকরীতে লাগিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে...ঈশ্বর তাকে বাচ্চাও দিল। ...মনে হয়েছিল দুঃখের দিন বুঝি এবার শেষ হলো। কিন্তু গত জন্মের খারাপ কাজগুলো আমাকে সোয়াস্তিতে থাকতে দেবে কেন? . . .বিয়ে যেন যমের রূপ নিয়ে এলো . . . ছেলেটা শুকিয়ে হাড়-পাঁজর সার হয়ে গেছে।"

এরপর সঁধরার মনে পড়ে গেল তার নিজের বিয়ের কথা—সে ভাবতে থাকে, "বিয়ে বিয়েই—যেদিন প্রথম বুদনের বাপের সঙ্গে সে এসেছিল তার মনে কত সাধ-আহ্লাদ ছিল, সে বেচারা রাত-দিন সধরাঁ সধরাঁ ক'রে ঘুরে বেড়াত। যখন তার শেষরাতের ডিউটি পড়তো সে আমাকে একা ছেড়ে ডিউটিতে যেতনা, অসুখের ভান ক'রে কয়েকদিন বাইরে বের হতনা, বলতো, "সধরাঁ, তুই ভাবিসনে৷ আমার কাছে বসে থাক শুধু। খাবার টাবার আমি বাজার থেকে আনিয়ে নেব . . . অনেক মাইনে আমার, মা বাবাও নেই আমার যাদের কিছু পাঠাতে হবে . . ."

. . . "হ্যাঁ, তাইতো পাড়ার মেয়েরা আমাকে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতো, "না শাশুড়ি, না ননদ, বউ নিজেই বাড়ির গিন্নী।" ওরে দিনভোর ওকে হাঁটুর সামনে বসিয়ে রাখিস, কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে বাইরের দুনিয়াটা তো দেখেনে কোথায় কি আছে . . ."

"সধরাঁ, তুই সুখে থাক। লোকেদের কথায় কান দিসনা। লোকেরা মানুষের সুখ সহ্য করতে পারেনা।" . . . এই সব কথা ভেবে সধরাঁর মুখ দিয়ে ফোঁপানির আওয়াজ বেরোল। বাতাসের তীব্র ঝাপটা তার স্মৃতির পারম্পর্য ভেঙ্গে দেয়।

বিজলী বাতি তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তার পা আপনিই লাইন ও তারগুলো পেরিয়ে যায়। কপালে একটা হাত রেখে-ইতো ঘসটাতে ঘসটাতে সে এগিয়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে চোরের মত সবদিকে তাকায়, কখনো গাড়ীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখে কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা।

এতক্ষণে সধরাঁ কাঁচা কয়লার স্তূপ দেখতে পেয়েছে। ইলেক-ট্রিকের আলোয় এই উচুঁ উচুঁ ঢিপিগুলো সোনা রূপোর স্তূপের মত মনে হয় যার থেকে দু'টো বড় চাংড়া চুরি করে সে বুদনের জন্য ওষুধ, খোকনের জন্য চাল, শাশুড়ি বউয়ের পেট ভরার জন্য মকা-ইয়ের আটা আনবে। সে ভাবছিল, আজ কি সুন্দর সুযোগ। যদিও শীতে সারা শরীর জমে হিম হয়ে যাচ্ছে তবুও বিনা বাধা-বিপত্তিতে সে দু'চক্কর দিতে পারে। যদি আজ সে দু'চক্কর ঘুরে নিতে পারে তাহলে শীতের এই দু'দিন তার সহজেই কেটে যাবে। এরই মধ্যে দুপুরবেলা সে সিণ্ডার* কুড়োতে পারবে। ছাইয়ের স্তূপ থেকে সিণ্ডার বেছে নিতে তাকে কে মানা করবে? ভাবতেই তার মনে হল যেন বুদন ছাইয়ের গাদায় প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে, তার ছেলেও সেই ছাইয়ের গাদার মধ্যে বড় হয়ে উঠছে।

কাঁচা কয়লা কুড়োতে দু'টো চক্কর ঘোরা . . . বাড়ির সমস্ত-লোকের দু'দিনের খোরাক। আজই সুযোগ। এমন হিমেল রাতে

* আধজলা কয়লা।

কেউ বাইরে বেরোতে পারেনা। আজ দু'তিন বার ঘোরা যায়... এই হিন্দুগুলো থেকে মুসলমানগুলোই ছিল ভালো...মুখে আগুন এই হিন্দুস্তান পাকিস্তানের—গরীবদের কষ্ট বেড়েই চলে। আগে হিন্দু-মুসলমানে কি রকম মিল ছিল। একে অন্যের জন্য জান দিত। এখন তো কুকুরই কুকুরের শত্রু। ...আজ যদি কুরবান আলী শাহ এখানে থাকতো তাহলে কি আমার এই দুর্দশা হতে পারতো? সে তো আমাকে মাথার মণি করে রাখতো, কখনো পয়সার অভাব টের পেতে দেয়নি আমাকে। নথাসিং ড্রাইভারও তার সঙ্গেই থাকতো কিন্তু তার সাধ্যি কি যে শাহের সামনে তাকে ছোঁয় বরঞ্চ বৌদি বৌদি ক'রে হেদিয়ে পড়তো। নথাসিং কয়েকবার বলেছে, "বৌদি, আমার কথা শোন্ কুরবান আলীর সঙ্গে নিকে ক'রে নে, এখনো সময় আছে। এই রূপ-যৌবন চিরদিন থাকবেনা। ...তোর বুদনও মানুষ হবে আর তুইও বেগম হয়ে যাবি...এখন আর বাকিটা কি আছে—নিজের বামনীপনা ছাড়..."

"ওরে নথাসিং তোর কি লজ্জাপিত্তি নেই, মুসলমানের সঙ্গে শাদী ক'রে আমি কি আমার জাত ধর্ম খোয়াব?

"...বেশ বৌদি যা-তোর ইচ্ছে কর...কোন্ গঙ্গাস্নান ক'রে বেড়াচ্ছিস...নিত্যিরোজ তোকে নিয়ে গাড়ীতে ঢোকে...এই মিছে লোকলজ্জা নিয়েই তাহলে বসে থাক—কে চেনেনা তোকে। শাহের ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করেনা। নইলে তোকে আবার কে ভয় করে? মনে রাখিস বৌদি আমার কথা, একদিন তুই এই দিনগুলোর জন্য হাত কচলে কাঁদবি..."

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পুরোনো কথা ভেবে চোখ মুছতে মুছতে সধরাঁ লাইন পেরিয়ে যাচ্ছিল। ওয়াশিং লাইন পার করার সময় তার পা এক গর্তে গিয়ে পড়লো। হাড়কাঁপা শীতে জমে যাওয়া শরীর নিয়ে সধরাঁ মাঈ মুখ থুবড়ে পড়ে। হাঁটুর হাড় ভেঙ্গে যায়। লোহার পাতটা কেটে বসে হাতে—তার থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে দেখা

যায়। যন্ত্রণায় সে উঠে দাঁড়াতে পারেনা। উচুঁ গলায় কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে। সে ভাবছিল এমন জীবন থেকে মরাও ভালো। সে না থাকলে এ পৃথিবীর কতটুকু ক্ষতি। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে লাইনটা পেরিয়ে যেতেই একটা ইঞ্জিন ছুক ছুক করতে করতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে ভাবতে থাকে যদি সে এই ইঞ্জিনের তলায় শেষ হয়ে যেত তাহলেই যেন ভালো হতো। . . .

সধরাঁ উঠতে পারছে না। তার ইচ্ছে করে জ্বলন্ত কয়লার সামনে গিয়ে একটু আগুন পোয়ায়। কিন্তু কয়লার উনুনের কাছে বসা বুড়োর গলা সে খুব ভালো করে চিনে। যদি সে আগুন পোয়াতে ওখানে যায় তাহলে বুড়ো হাবড়া লোকটা পুরানো গল্পই শুরু করে দেবে ··· নাতি-নাতনী হয়ে গেছে বুড়োর, মরতে বসেছে কিন্তু এখনো কামড় যায়নি ব্যাটার ... সধরাঁ যন্ত্রণায় কাঁদতে শুরু করে। কোনোরকমে নিজের পা টেনে উঠে দাঁড়ায়। প্রথমেই সে ঠিক ক'রে নেয় কয়লা ওঠাবে। দু'বার না হলেও এক চক্কর তো হবে। একটু এগোতেই সে যেন একটি আলো দেখতে পায়। চৌকিদার পাগড়ি সামলাতে সামলাতে গাড়ীর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখেই তার সমস্ত আলো নিভে যায়, শরীরের সমস্ত ব্যথা ঝনঝনিয়ে ওঠে।

সধরাঁকে খালি হাতে আসতে দেখে তার বেটার বউ জোমাঁ তাকে নিয়ে পড়ে। "এই বুড়ি ডাইনি, না মরে, না সঙ্গ ছাড়ে। বড়ই লোকলজ্জা এর, সমস্ত পরিবারটাকে ডাইনির মত আগলে রেখেছে। না বাইরে বেরোতে দেবে না খেতে দেবে। কোন্ ভোরবেলা বেরিয়ে গিয়ে এখন খালি হাতে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকেছে। যত ভড়ং আর ভান এই মাগীর, ফুলনকুমারীর হাড় না বেঁকে যায়। কোনো উনুনের আগুনের কাছে বসে ছিল, এখন বাড়ি ফিরে এসেছে। কতবার বলেছি, যাসনে, তুই মরতে যাসনে। এখন তোকে দিয়ে কিছু হবে না, বাড়িতে বসে দু'মুঠো গেল, তা বিবির আমার নজ্জা বেশী, আমাকে বাইরে বেরোতে দেবেন না

যেন আমি বাতাসা, কেউ টপ ক'রে মুখে পুরে ফেলবে। আজ মরো সবাই না খেয়ে শুকিয়ে। বাড়িতে এক চিমটি আটা নেই। যেদিন থেকে এ বাড়িতে এসেছি খালি কান্না আর কান্নাই ...।"

সধরাঁ মাঈ কেঁদেই চলেছে কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারছে না। যদিও বা সে কিছু বলার চেষ্টা করে বেটার বউ জোমাঁ আরো জোরে চোপা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে . . . "কাল সকালে আমি নিজেই কয়লা কুড়োতে যাব . . . দেখে নিও বস্তা ভরে আনি কিনা . . . বজ্জাতী যত হারামজাদীর। রুটি গেলাই সহজ।"

এইভাবে সারাদিন কেটে গেল শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়ায়। সধরাঁ মাঈ সমস্ত রাত তার বিগত জীবনের কথা ভেবে ভেবে কাঁদে। কিছু তার আঘাতের ব্যথা কিছু জোমাঁর কথার। চট মুড়ি দিয়ে শুয়ে সে ভাবে, "কত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে জোমাঁ। সে জানেনা, ইয়ার্ড থেকে কয়লা আনা সহজ কাজ নয়। নিজের সব কিছু লুটিয়ে দিয়ে দু'চাংড়া কয়লা পাওয়া যায় . . ." এই সব কথা ভাবতে ভাবতে না জানি কখন সধরাঁ মাঈ ঘুমিয়ে পড়েছে।

যখন তার ঘুম ভাঙে, দেখে জোমাঁ কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে নেই— লোহার পাত ও খালি চটের বস্তাও নেই। বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো তার। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা ঘাম জমে ওঠে। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হয় যেন ঝড়ে তার কুঁড়ে ঘরটাকে মাটি থেকে উপড়ে দিয়েছে আর প্রত্যেকটি খড় ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে। সধরাঁ মাঈ অনেকক্ষণ পর্যন্ত দরজা ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে আসা প্রত্যেকটি মূর্তিই তার মনে হয় জোমাঁর।

সূর্য ওঠার সময় জোমাঁ কয়লায় ভর্ত্তা ছালা এনে কুঁড়ে ঘরটার সামনে আছড়ে ফেলে। শাশুড়ি বউ একে অন্যের চোখের ভিতর তাকায়। জোমাঁ জলভরা চোখ তুলতে পারছেনা। বউয়ের এলোমেলো চুল, ছলোছলো চোখ ও ছেঁড়া জামা দেখে সধরাঁ মাঈ জ্ঞান হারিয়ে বসে। তার মনে হয় তার বউ কয়লা নিয়ে আসেনি, কোনো দুর্ধর্ষ লড়াই লড়ে ফিরে এসেছে।

সীমা

বাইরের ফাটক খুলে, ফুলের কেয়ারীর পথ দিয়ে যখন আমি বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াই, দর্শীর গোলাপী চেহারা ও মিষ্টি স্মিত হাসি আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। এ সময় নিশ্চয়ই সে বাড়ির ঝাড়া-পোঁছা বা সেলাই-বোনার কাজে ব্যস্ত যেন কাজ বিনা তার জীবনের কোনো সার্থকতাই নেই।...যে কোনো কাজই করুক না আমাকে দেখা মাত্র সে সব কাজ ভুলে যায় আর মনে হয় যেন সে সকাল থেকেই আমার প্রতীক্ষা করছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে আমার উপর উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যে সময় সে তার স্নেহসিক্ত আঙুল-গুলো দিয়ে আমার শরীরকে স্পর্শ করে ও আমার কাপড়গুলো আলনায় টাঙিয়ে দেয আমার মনে হয যে শিবের রূপ নিয়ে সে আমার সারাদিনের গ্লানি ও ব্যথার বিষ নিজেই পান ক'রে নিতে চায়। সে সময় আমি এক অলৌকিক আচ্ছন্নতার বিশ্বে গিয়ে উপনীত হই, যেন আমি স্বর্গে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছি। স্বর্গে যারা বাস করে তারা কি আমার চেয়ে বেশী সুখী ?...এ এমন এক স্বর্গ যেখানে আমি ইন্দ্র আর দর্শী আমার অলকা, হাস্যোজ্জ্বল ফুল, দর্শী আমার অলকা।

কিন্তু কিছু দিন থেকে দর্শী আমার কাছ থেকে এই স্বর্গ কেড়ে নিতে চাইছে।

সন্ধ্যাবেলায় চায়ের আসর—ভাবনা-চিন্তায় কাবার হয়ে যায়। সারাদিনের ঘটনাগুলি থেকে কোনো মজার কথা আমার বলার আগেই সে নিজের কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়। একথা সেকথার ভূমিকা ফাঁদবার পর সে বলে—"ও না, ওই যে আপনার বন্ধু সবরওয়ালের ওয়াইফ কীর্তি না।"

"হ্যাঁ, তা কি হয়েছে কীর্তির ?"

"সেও স্কুলে চাকরী পেয়ে গেছে।"

"ওহ্! ভীষণ খারাপ।" আমি বিরক্ত হয়ে উঠি।

"কেন, খারাপটা কি হলো ?" সেও ঝাঁঝালো সুরে বলে ওঠে। কিন্তু আবহাওয়ার তিক্ততা কমাবার জন্য আমি নরম গলায় বলি, "ব্যস, ব্যাপারটা খারাপই ধরে নাও।" এসময় আমি অনেক কিছুই বলতে চাই কিন্তু কোনো কথাই আমার মাথায় আসেনা, তাই আমি আবোল-তাবোল বকতে থাকি—

"গ্যাখো না দর্শী। মেয়েদের চাকরী করা বড় বিপজ্জনক। আজকাল চাকুরে মেয়েদের চেয়ে বেশী দুর্দশা আর কারো নয়।"

"কি দিয়ে বুঝলে ?"

"দেখতেই পাও, বাসের মধ্যে মেয়েদের কি দুরবস্থা হয়। বৃষ্টির দিন হলে তো কেলেঙ্কারী কাণ্ড।"

"বৃষ্টি কি সারা বছর ধরে চলে ?"

"সারা বছর ধরে নয়, তবে সারা বছর ধরেই কোনো না কোনো বিপদ বৃষ্টির মত নেমে আসে....আর....আর...."

আমার এই নিরর্থক কথাগুলোর সামনে তাকে হার মানতে হয়। তার মুখ কালো হয়ে ওঠে ও চোখের কোণে লবণাক্ত জল ছলছল ক'রে ওঠে। এই সময় মনে হয় চাকরী করার ইচ্ছাটা তার মধ্যে ছটফট ক'রে মরছে। আমি কি এতই নিষ্ঠুর ?—না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলি—"লক্ষ্মীটি ! বোঝো, যদিও আমি মেয়েদের চাকরী করা পছন্দ করিনা কিন্তু তোমার চাকরীর জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছি। আমি জানি, তুমি দিনভোর বাড়িতে একা-একা বসে উত্যক্ত হয়ে ওঠ। চাকরী করলে তোমারও ব্যাক্তিত্ব ফুটে উঠবে। নয় কি ?"

আবার আমি কাগজের ফুল ফোটাই। অর্থাৎ এসময় আমি তার দিকে ভালোবাসায় বিগলিত চোখে তাকাই ও সে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

বেচারী নারী।

যেদিন থেকে সে এম্‌ব্রয়ডারী ডিজাইনিং-এ ট্রেনিং শেষ করেছে সেদিন থেকে চাকরী করার কথা ছাড়া আর কোনো ভাবনা ওর নেই। চাকরী করার ইচ্ছা যেন তার রক্তে রক্তে প্রবাহিত।

অনেকবার এমন হয়েছে যে আমরা লনে বসে আছি, ও হঠাৎ হয়তো দেখলো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কোনো বার্তালাপরত সুখী দম্পতি হেঁটে চলে যাচ্ছে—দর্শীর দৃষ্টি সেখানে আবদ্ধ হয়ে গেলো। সেই মেয়েটি তার স্বামীর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে হাঁটছে। আকৃতিতে স্বামীর চেয়ে বেঁটে হলেও মনে হয় সে তার স্বামীর মতই লম্বা। আমি কিছু বলার আগেই দর্শী বলে ওঠে—"এই মেয়েটি নিশ্চয়ই চাকরী করে।"

"কেমন করে বুঝলে?"

"যতদিন মেয়েরা চাকরী করেনা, তাদের মধ্যে আত্মসম্মানের বোধ জেগে উঠতে পারেনা...."

সে আবার দূরে অপসৃয়মান সেই দম্পতির দিকে তাকায়। আমি কল্পনা করি ওই দূরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া স্বামী-স্ত্রী আমি ও দর্শী। তারপর আমি অনুমান করতে শুরু করি যে, যদি দর্শী চাকরী পেয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে কতখানি আত্মসম্মানের বোধ জেগে উঠবে। তার পদক্ষেপ কতখানি দৃঢ় হয়ে উঠবে? কে জানে তার ব্যক্তিত্ব আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দেয় এবং আমি তাতে চাপা পড়ে যাই...? এই বিন্দুতে এসে আমার ভাবনাগুলো সব এলোমেলো হয়ে যায়। দর্শীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হয় আমাকে যেন অনেক ছোট দেখাচ্ছে। আমি শুকনো পাতার মত শিউরে উঠি যেন আমি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছি। এ স্বপ্ন কি সত্যি হয়ে দাঁড়াবে?

এখনও দর্শী দূরে অপসৃয়মান সেই সুন্দর দম্পতির ছায়ার দিকে তাকিয়ে। নোয়ানো ঘাড়, অনিমেষ দৃষ্টি ও মুখের উপর আত্মবিশ্বাসের কম্পিত শিখা। দর্শী যেন অভাবের প্রতিমূর্তি। নিস্পন্দ, অনিমেষ......

এই মুডে তাকে আমার ভালো লাগে। এই দৃশ্য আমার পক্ষে কতখানি সান্ত্বনাদায়ক। খুশি না হয়ে পারলুম না। আমার হাসি পেল, আমার ঠোঁটে হাসির একটি ক্ষীণ রেখা কেঁপে উঠল।

আমার এই রহস্যময় অবস্থা দেখে দর্শীর আচ্ছন্নতা ভেঙে গেল, ছটফটিয়ে সে বলে উঠল, "কি হল আপনার?" তার স্বরে একটি কম্পন। আমি খুশী হয়ে মিছিমিছি বলি "ভাবছি যদি তুমিও চাকরী পেয়ে যাও তাহলে আমাদের জীবনও ওই সুন্দর দম্পতির মত হয়ে উঠবে...আর..আর..তুমিও..তুমিও.."

আর কিছু বলতে পারিনা আমি। যেন মিথ্যে কথা বলা আমার পক্ষে কঠিন—সাংঘাতিক বিষের মত। কিন্তু আনন্দের চোটে দর্শীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। সে খুশী হয়ে আমার জন্য কফি তৈরী করতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বহুবার খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমার দৃষ্টি কোনো অকিঞ্চিৎকর খবরে পৌঁছে আটকে যেত এবং আমি অনেকক্ষণ ধরে সেই খবরটা পড়তাম। এ খবর এমন একটি মেয়ের বিষয়ে যে, চাকরী করতে করতে নিজেরই আপিসের কোনো এ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে প্রেমে পড়ে অন্য কোনো শহরে পালিয়ে গেছে—যখন আমি হাপুস—হুপুস ক'রে খবরটা দর্শীকে পড়ে শোনাই তার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, হাতটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, ও খবরের কাগজের সেই লাইনগুলোর উপর দ্রুত নজর বুলিয়ে যায়। যতই তার মুখের রং ফ্যাকাশে হয় ততই আমি মেতে উঠি। মনে হয় দর্শী যেন অস্বস্তির শূলে বিদ্ধ। তাকে আরো বিচলিত করার জন্য আমি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গভরা স্বরে বলি—

"মানছি যে বিজ্ঞান প্রগতি করেছে। আজ চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছোনোর জন্য স্পুৎনিক তৈরী, মেয়েরাও সমানতার অধিকার পেয়ে গেছে। কিন্তু কী লাভ এতে? যতদিন মেয়েদের জীবনে আচরণের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা আসবেনা ততদিন সমস্ত মানব-প্রগতিই ব্যর্থ।"

এ কথা শুনে দর্শী আশাহত মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত তার মুখে ঝরাপাতার আভাস দেখি। বাগানের ফুলগুলো অর্থহীন মনে হয় এবং বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আমাদের জীবনে কোনো রোমান্সের উদয় হয়না।

কিছুদিন পূর্বে দর্শীর জীবনকে চাপা দিয়ে রাখার জন্য বড় ঘৃণ্য একটা কাজ ক'রে ফেলেছি, এবং আমার বিবেক একটা আহত পাখীর মত ছটফট ক'রে মরছে।

হঠাৎ একদিন দর্শী একটা খবরের কাগজ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মুখে গম্ভীর শান্তি যেন এই সমুদ্রেই কোনো তোলপাড় জেগে উঠবে।—সে আমাকে সে দিনের খবরের কাগজের অন্তিম অধ্যায়টা পড়তে বলে। পড়ার পর জানতে পারি যে, সেদিন আপিস থেকে এ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটি কোনো গেরস্ত ঘরের মেয়ে নয়। সে ছিল কোনো পরিত্যক্তা নারী যে, চাইছিল নিজের কলংকিত জীবনকে কোনোরকমে সার্থক ক'রে তুলতে।

...হকচকিয়ে আমি একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠি এবং দর্শীর মুখের দিকে না তাকিয়ে ফুলের দিকে তাকিয়ে বলি, "দর্শী! এ ফুলগুলো আমার বাগানেই ভালো লাগে—এদের সুরভি এখানেই ছড়াক···দর্শী, আমার লক্ষ্মীটি! ছাখোনা!..."

কিন্তু এর পর আমি আর কিছু বলতে পারিনা—কিছুই না।

দর্শী এখানো আমার সামনে দাঁড়িয়ে এবং আমার সমস্ত যুক্তি তর্কের অস্ত্রগুলোকে ভোঁতা করে দিতে চায়। আমি মনে মনে ভাবি—এই নারী স্বাধীন হওয়ার পর একদিন আমার মুখোমুখি নিশ্চয় উঠে দাঁড়াবে এবং নিজেকে আমার চেয়ে শ্রেয়তর ভাবতে শুরু করবে।

আমি প্রত্যেকবার আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাই কিন্তু প্রত্যেক বারই সে আমার দৃষ্টিকে কাবু ক'রে ফেলে।

"কাল আমি এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্‌স্‌চেঞ্জে গিয়েছিলাম..."

"তুমি?" আমি কেঁপে উঠি।

"হ্যাঁ" তার গলা চড়তে চড়তে কড়িতে পৌঁছয়—"ডিলিং ক্লার্ক বললে, দিদি গত সপ্তাহে আপনাকে ইন্টারভিউ কার্ড পাঠানো হয়েছিল—শুধুমাত্র একজন কাণ্ডিডেট ছিল—পেয়েছিলেন আপনি ইন্টারভিউ কার্ড?"

"হ্যাঁ পেয়েছিলাম...কিন্তু..আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি...আসলে আমি..আমি..আমি..."

আর তারপর তাকে আমি সব কিছুই স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দি। কেন আমি চাইনা সে চাকরী করুক স্পষ্ট ক'রে বোঝাই।

"ছুশো টাকার চাকরী পেয়ে আমি এই বাড়িটাকে আরো সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তুলতে পারি।"

"কিন্তু, কিন্তু এখন আর কি হতে পারে, চাকরীর কথা ভুলে যাও...। চাকরী জীবনের এমন কিছু অপরিহার্য ব্যাপার নয়।"

আমি মনে মনে খুশি। আমার ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। কিন্তু আমার কথা না শুনে সে দৃঢ়ভাবে বলতে থাকে—

"কার্ড ছিঁড়ে ফেলার সময় হয়তো আপনি ইন্টারভিউএর তারিখটা দেখেননি। অন্য একটা ইন্টারভিউ কার্ড আমি পেয়েছিলাম। আজ ইন্টারভিউ দিয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসেছি।"

আমাকে টেগোর করে দাও মা...!

চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে—যেন কোনো গরীবের ব্যথা-নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস।

ভাটির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একলা শিশুগাছের তলায় শুয়ে সে সারাক্ষণ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়েছিল। এবার ফিরে নিজের ধূলো-ভরা পা ছাখে, তারপর সারাগায়ে চোখ বুলোয়। ভাবতে গিয়ে অবাক লাগে, ছেলেবেলায় তার শরীর কত নাতুস-নুতুস গোলগালই না ছিল। সুন্দর, ফুটফুটে।

অথচ এখন কেবল হাড়ের খাঁচাটা রয়ে গেছে।

ক্ষণেকের জন্য মনে হয় সে নিজেই এক চিমনি, বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ইঁট পোড়াবার ভাটির অকেজো চিমনি, যার সব ধোঁয়া বেরিয়ে গেছে। নিজের উপর বিরক্তি ধরে। তার চেয়েও বিরক্ত লাগে নিজের এই অবস্থায়। সবচেয়ে বেশী রাগ ধরে ভাটির মুনশীর উপর যে 'এখুনি আসছি' বলে সেই যে গেছে, আর ফেরেনি। শিশুগাছের তলায় শুয়ে সে অপেক্ষা করছে। যাওয়ার আগে মুনশী যদি চিরকুটটা দিয়ে যেত তাহলে এতক্ষণে সে অর্ধেক রাস্তা চলে যেত। "শালা আগুনের চুল্লী যেন। আগুনের চুলো . . .।" সে আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে।

আবার সে তার গাধাগুলোর দিকে তাকায়। ইঁটে-ভরা বোঝা পিঠে নিয়ে তারা পরমানন্দে ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে—যেন কিছুই হয়নি। ঘাসে চরে বেড়ানোতে তারা এতই মশগুল যে পিঠের বোঝার ভার বুঝতেই পারেনা। মোট তো বইতেই হবে। তার আবার কম বেশী। গাধার কি? মুনশী আরো ঘণ্টাখানেক না এলেই বা কি?

"শালা গাধা ছাড়া তো কিছুই ন'স তোরা।"

তাদের এমনি নির্বিকার ভাবে চরে বেড়াতে দেখে সে হেসে ফেলে। মানুষ আর গাধায় এইটুকুই যা তফাৎ। মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় কিন্তু গাধা . . .? গাধা গাধাই।

নিজের অধীনে যারা কাজ করে তাদেরও মানুষ গাধাই ভাবে। তারা প্রতিবাদ করলেই বা কি? যা শুনেও কেউ তাতে কান দেয়না সেই প্রতিবাদেরই বা কি লাভ। তার থেকে গাধাই ভালো যারা মাথা নিচু ক'রে রাতদিন কাজ ক'রে যায়—'ফলে'র কথা ভাবেনা।

তার গাধাগুলো এখনো নিশ্চিন্তভাবে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

সে তাদের দেখে আবার হাসে।

সাধারণত মানুষ যেমন হাসে এবার আর ততটা সে প্রাণ খুলে হাসতে পারেনা। বরঞ্চ বুকে কাঁটা বেঁধার মত একটা ব্যথা টনটন ক'রে ওঠে। তার মধ্যে যেন একটা হীনতাভাব জেগে ওঠে। শিশুগাছের তলায় শুয়ে শুয়ে সে যেন কুঁকড়ে একটা বোচকার মত হয়ে গেছে। আরো ছোটো। গাধার চেয়েও হীন।

"শালা এখনো এলোনা, গাধা কোথাকার!" সে আবার উতলা হয়ে ওঠে।

হাজার হোক্ মানুষ যে।

বেলাবেলি সকালেই সে তিন চক্কর দিয়েছে। এই চতুর্থবারের পর সে ছুটি চেয়েছিল। চেয়েছিল তার নেতার কথা সে শুনতে চায়। তার গাঁয়ের স্কুলে প্রস্তর ফলক স্থাপিত করতে তিনি আসছেন। কিন্তু এই মুনশী 'এখুনি আসছি' বলে কোথায় যে গা ঢাকা দিল কে জানে।

গাধারা এখনো নির্বিকার চরে বেড়াচ্ছে। আকাশে ছোট ছোট মেঘ জড়ো হচ্ছে। বাতাসের দু'একটা ঠাণ্ডা ঝাপটা তার চোখ দু'টোকে শীতল করে দিচ্ছে। নিমেষের জন্য যেন একটি পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল। তার মন দুলে ওঠে। দোলা লাগতেই সে গুন গুন করে ওঠে:

"আঁচল দিয়ে নিবিয়ে গেলে দীপ
চোখে চোখে বলে গেলে কথা।"

সে আবার খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

তার মনে পড়ে গেল দাড়ীআলা বৃদ্ধ সেই কবির কথা যে লোক-গীত সংগ্রহ করতে করতে তার কবি মাষ্টারের কাছে এসেছিল। কথায় কথায় সেই এলোচুল কবি বলেছিল যে, এই পদ যখন সে টেগোরকে শুনিয়েছিল তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

সে সেই বৃদ্ধ কবিকে না জানি কত পদ শুনিয়েছিল। এই পদগুলোর যেন শেষ নেই। বড় খুশী হয়েছিল বৃদ্ধ। তাকে খুব আদর করেছিল।

তারপর মাষ্টার কবি ও সেই বৃদ্ধ নিজেদের কবিতা শুনিয়েছিল।

সে পাশে বসে অবাক হয়ে শুনেছিল। সেদিন জীবনে প্রথম জানতে পারলো কবি ও চোর অন্য মানুষদের মতই হয়। সাধারণ লোকেদের মতই হাত-পা আছে তাদের। সাধারণ লোকেদের মতই তাদের স্বভাব।

সেইজন্যেই ওই বৃদ্ধ কবি হাসির কথায় হেসে উঠছিল।

সেদিন মাষ্টারকেও তার পুরোপুরি কবিই মনে হচ্ছিল। আগে তার বিশ্বাসই হতনা যে সে কবি। মাষ্টার যে কবি হতে পারে এতে তার সন্দেহ ছিল। কেন, কে জানে।

একদিন সে সংকোচে দুরু দুরু বুকে একটি কবিতা লিখে ফেলেছিল। লিখে ফেলেনি,—লেখা হয়েছে।

মাষ্টার কবি খুশী হয়েছিল তার উপর। "একেবারে টেগোরের মতন, আছোঁয়া কল্পনা। বাপধন তুই টেগোর হবি। সাহস হারাস নি।" সেদিন সে প্রায় বিশ্বাস ক'রেই ফেলেছিল সে টেগোর হতে পারে।

গীতাঞ্জলির অনুবাদ এনে সে চারবার পড়ে ফেলেছিল। কিন্তু কিছুই প্রায় বুঝতে পারেনি। তারপর নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগলো।

কিন্তু মাষ্টার কবি তাকে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। "একদিন তুই টেগোর হবিই হবি। তোর কবিতার মতো কোন কবিতা ওই বুড়ো কবিরও ছিলনা।" তার ইঙ্গিত সেই বৃদ্ধ কবিকে লক্ষ্য

করে। এখন যে কোনো বিষয়ে ভালো-ভালো কবিতা সে লিখতে পারে।

কিন্তু যে কবি এই কবির চেয়ে বড় সে এগুলোকে কবিতা বলে মানতেই চায়না। বদরু কুমোর ভেবে অবাক হয়।

তারপর তার মনে পড়ে সেই নেতার কথা। তিনি পাশের গাঁয়ে পুরস্কার বিতরণ করতে এসেছিলেন। পুরস্কারে বদরুর থলে উপচে উঠেছিল। কিছু পুরস্কার সে তার বন্ধুর জিম্মায় রাখতে দিয়েছিল। স্কুলে সে হয়েছিল প্রথম, দৌড়ঝাঁপে প্রথম, পদ্য-প্রতিযোগিতাতেও হয়েছিল প্রথম।

আনন্দে সেদিন সে পাগল। সেদিন কবি মাষ্টারও খুব খুশী। নেতা তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ

"আপনার মধ্যে থেকেই মহান নেতা গড়ে উঠবে। আপনাদের মধ্যেই কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধী ও মহাকবি টেগোর হবে। সেই মহাকবি টেগোরের মা তাঁকে টেগোর ক'রে তুলেছিলেন।"

সে দৌড়োতে দৌড়োতে মার কাছে গিয়ে নিজের সমস্ত পুরস্কার মার আঁচলে ঢেলে দিয়েছিল।

তারপর আপনা থেকেই তার দু'টো হাত মার গলা জড়িয়ে ধরে। আবদারের সুরে বলে, "মা গো মা, আমাকে টেগোর ক'রে দাও।"

"কি ?" মা কিছুই বুঝতে পারেনা।

"আমাকে টেগোর ক'রে দাও মা...!" সে আবার মিনতি জানায়।

"মোর—ময়ুর।" মা যেন সব কিছু বুঝে ফেলেছে। বলে, "মোর···তোর শত্তুরও যেন ময়ুর না হয়।"

মার উপর বড় রাগ হয় তার।

খুণ্ডেআলা মাষ্টারের উপরেও তার খুব রাগ হয়, সে তাদের ময়ুর* বানিয়ে দিত। ঘাড়ের পিছনে ছেলেদের হাত-পা আটকে

*স্কুলে নীল ডাউনের মত শাস্তি যাতে ময়ূরের মত দাঁড়াতে হয়

দিয়ে শূন্যে বেত আছড়াতে আছড়াতে বলত, "তুম্‌হারী মাঁ কে কড়ছে মেঁ ফড়ছা মারা। ডাণ্ডা পীর হ্যায়, বিগড়োঁ তিগড়োঁ কা পুওরোঁ।"*

তারা এই রকম ময়ূরের পোজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে পুড়তো।

তারপর তার মনে পড়ে সেই দিনের কথা যেদিন হঠাৎ তার বাবার আধখানা শরীর পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল আর তাকে অষ্টম শ্রেণীর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাবার কাজকর্ম ঘাড়ে নিতে হয়েছিল।

কবি-মাষ্টার তার বাবাকে বিস্তর অনুরোধ করেছিল, বদরু অন্তত দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ফেলুক কিন্তু তার বাবার একটি কথাই তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল, "মাষ্টারমশাই যেখানে পেটের চিন্তাই আসল সেখানে লেখাপড়ার কথা ভাবাই যায়না। প্রথমে পেট, তারপর লেখাপড়া।"

মাষ্টারমশাই নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন।

সেদিন বদরু কুমোরের অন্তরে অর্ধেক টেগোরের মৃত্যু ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল।

আজ একজন নেতা গ্রামের নতুন স্কুলে শিলান্যাসের জন্য আসছেন।

সে উঠে বসে। তার গাধাগুলো এখনো মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে। এখনো চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দূর থেকে সাইকেলে মুনশীকে আসতে দেখা যায়। তার ইচ্ছে হল আসামাত্রই মুনশীকে সে সাইকেল থেকে নিচে ফেলে দেয়।

কিন্তু তার হীনমন্যতা বা ভিতরের মানুষটা তাকে কাজটা থেকে বিরত করে। উঠে দাঁড়িয়ে সে নিজের গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে। হাত-মুখ ধুয়ে, চুপচাপ চিরকুট লিখিয়ে সে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়। মাথার উপরে সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে। খালি পা দু'টোর

* একটি প্রায় নিরর্থক বাক্য-বিন্যাস। শাব্দিক অর্থ: তোর মায়ের কড়াইতে কোদাল মারি। ওরে বকাটে লোকের ব্যাটারা, এই ডাণ্ডাই তোদের আসল গুরু।

প্রতি তার করুণা হয়। হেঁটে হেঁটে সে দু'টো চাপড়ার মত চওড়া হয়ে গেছে। পায়ের শিরাগুলো ফুলে বিজলীর তারের মত জড়িয়ে রয়েছে, যেন সারা শতাব্দী ধরে সে হেঁটেই চলেছে।

"চলরে বাঘারা, চল। ওরে নীলু, রাস্তায় আবার মুখ থুবড়ে পড়ে যাসনা যেন। আমার মাথা হেঁট করাসনা যেন। বাড়ি গিয়ে তোকে পেট ভরে চারা খাওয়াবো।"

নীল গাধাটা অন্য গাধাগুলোর চেয়ে একটু রোগা, পথে এক আধ বার ইঁটে ভরা ছালা ঠিকই ফেলে দেবে ; এখন ঘাস খেয়ে লাফাতে লাফাতে সব চেয়ে আগে এগিয়ে যায়।

পাগড়ীর খুঁট থেকে গুড়ের টুকরোটা বের করে এক কামড় খেয়ে সে আবার বেঁধে রাখে।

"গাঁয়ে পৌঁছেই এটা খাবো, তারপর পেট ভরে জল খাবো। কুয়োর পাড়ে বসে নেতার কথা শুনবো," সে ভাবে।

"মা, তোর এই রাজকীয় পোশাক ও মণি-মুক্তো পরে আমি কি করব। আমাকে এই মিথ্যে বাঁধনে বাঁধিস না। আমি পৃথিবীর মেলায় তার প্রাণদায়িনী ধুলোমাটিতে খেলতে চাই।"

টেগোরের এই পংক্তিগুলি তার মনে পড়ে যায়—কবি-মাষ্টার স্কুলের দেয়ালে এটা লিখে দিয়েছিলেন।

"আমি ধূলোতেই জন্মেছি, খেলেছি, বড় হয়েছি কিন্তু টেগোর হতে পারলুম না।" উঁচু গলায় হেসে ওঠে সে।

গরম বালিতে তার পা পুড়ে যায়। চারিদিকে গুমোট। যেন কোনো দানব সমস্ত বাতাস শুষে নিয়েছে।

মার কথা মনে পড়ে যায় তার—গুমোট হলে কাঁচা বাড়ির ছাদে শুয়ে সে সাতটা পুরের নাম করতো......"মহরমপুর, অধমপুর, জৈনপুর...।" কিন্তু এসব করেও বাতাস চলেনি।

"ওরে শত্তুর একবার গা নাড়া দে ! বইতে শুরু কর।" বাতাসকে হাঁক লাগায় সে। সূর্যের পিণ্ড আগুন ছড়াচ্ছে।

"ওরে সুয্যি, ছোটলোক, আজই তোর আগুন ঢালার সময়

হলো। পা যে খালি আজকে। নিজেও জ্বলে মরে অন্যদেরও দগ্ধায়।" সূর্যের নিকট অনুযোগ জানায় সে।

"ওরে মেঘরা! বেটির নাগর, কোনখানে মুখ গুজে পড়ে আছিস।" দাঁতে দাঁত ঘসে সে বলে।

দূর থেকে ছোট্ট একটা মেঘের টুকরো আসছে দেখে সে বড় খুশী হয়ে উঠে কিন্তু তারপরই সে মেঘ কে জানে কোথায় মিলিয়ে যায়। কত গরীব অভাবের তাড়নায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু সম্পন্ন পৃথিবী তার বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। এও যেন তেমনি। মেঘের মৃত্যুতে নির্বিকার সূর্য আগের মতই জ্বলতে থাকে। গাধাদের চাল মন্থর হয়ে আসে।

"ওরে তোরা সবাই আমার শত্তুর হয়ে উঠলি?" রেগেমেগে সে গাধাগুলোকে ঠেঙাতে শুরু করে। গাধাগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে পিছনের পা দু'টো দিয়ে চাট মারতে আরম্ভ করে। তার ইচ্ছে হল লাফ মেরে সে একটা গাধার পিঠে চেপে বসে। কিন্তু তার ভারে গাধা মাটিতেই না বসে পড়ে এই ভয়ে সে হেঁটেই চলল।

সামনে এসে পড়লো বটগাছের তলার কুয়ো। পেট ভরে জল খেয়ে নেয় সে। পাগড়ির খুঁটে বাঁধা গুড়ের টুকরোটার দিকে লালায়িত চোখে তাকায়। "এটা গাঁয়ে পৌছেই খাব'খন। আর নেতার কথা শুনবো।"

বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে ভাবে।

"নেতা এসে ফিরে না গিয়ে থাকে।" এই ভেবে সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

জল ভেজা পা তার মিনিট খানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। গরম বালিতে আবার পা পুড়তে থাকে। সে লাফিয়ে ওঠে। একটা উপায় মাথায় এসেছে। সে একটি শিমুল গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। গাছের পাতা ছেঁড়ে। পাগড়ি থেকে একটু ন্যাকড়া ছিঁড়ে শিমুল পাতা পায়ের তলায় বেঁধে নেয়।

বালি অনেক কম গরম লাগছে। সে খুশী হয়ে ওঠে। বাঁ হাতটা উল্টে ঠোঁটের উপর রেখে সে ছাগলের ডাক ডাকে।

সারা অঞ্চলটা সে শব্দে ভরে ওঠে। এতেও তার মন ভরে না। সে এবার একটা পদ আওড়ায়—

ছাগল-পালক, হাঁক লাগা না ওরে
দুধ খেয়ে নে, যেতে হবে দূরে।

সামনে গ্রাম দেখা দেয়। প্রাণভরা খুশী নিয়ে সে গাঁয়ে ঢোকে। স্কুলের সামনে আম ও কলাপাতা দিয়ে তোড়ন-দ্বার বানানো হয়েছে। চারিদিকে রঙ-বে-রঙের ঝালর ঝুলছে। বেশ সরগরম। স্কুলের মাষ্টাররা ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে চারিদিকে।

সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন দেখতে থাকে।
মনে পড়ে যায় তার ছেলেবেলার কথা।

সেই বৃদ্ধ-কবির কথা মনে পড়ে যে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে লোক-গীত সংগ্রহ করে বেড়াতো। যাকে সে অজস্র লোক-গীত শুনিয়েছে। যে ফিরে আসার কথা দিয়ে আর ফিরে আসেনি।

যদি কখনো সেই বৃদ্ধের সঙ্গে তার দেখা হত। সে নিশ্চয়ই নতুন লেখা গানগুলো শোনাতো। এখন সে সব বিষয়েই সুন্দর সুন্দর কবিতা শোনাতে পারে।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ-কবি বোধ হয় তাকে সর্বদা ধূলো মেখে বেড়ানো এক ছোটলোক কুমোর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। কেননা সে যে সব সময় ধূলোয় মাখামাখি। সেই ধূলো, যাতে খেলবার জন্য টেগোর জল থেকে তোলা মাছের মতো ছটফট করেছে, তৃষিত থেকেছে। সেই ধূলোই তাকে পালন করেছে। ধূলোতে সে বেঁচে আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে কোথায় হারিয়ে যেতে চাইল। তার ঠোঁট, তার চোখ দু'টো, তার হাত-পা—সব কিছুই, সে নিজেই যেন একটি সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। একটি সঙ্গীতের রেশ কাঁপছে—কারো ঠোঁট আজও যাকে ছোঁয়নি।

তারপরই সে কেঁপে উঠল।

গানটা ছিঁড়ে কুটে ছড়িয়ে গেল।

একটা চড়, তু'টো চড়, কিল, তারপর একটা ঘুঁসি।

"দাঁড়া শালা কুকুরের জাত, কুমোরের বাচ্চা, তোর বোন...শালা তুই এখানে রঙ তামাশা দেখছিস? তোর গাধাগুলো আমার ক্ষেতের সর্বনাশ ক'রে দিল। কুকুরের জাত···।"

মাতাল একজন জাঠ উগ্রমূর্তিতে চোখ লাল ক'রে তাকে গালাগালি দিচ্ছিল।

সে ভয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশের গরুর গাড়ী থেকে একটা কাটারী বের করে লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসে।

ভয়ে সিটিয়ে গাধাগুলোকে লাঠি দিয়ে পিটোতে পিটোতে সে ধুলোর মধ্যে একটি বিন্দুর মতই মিশে যাচ্ছিল।

পাগড়ির খুঁটে বাঁধা গুড়ের টুকরোটো নড়ছে আর তার কাঁধে লেগে ক্রমাগত ব্যথা দিচ্ছে।

গল্প লেখকদের পরিচিতি

নানক সিং

জন্ম : ১৮৯৭ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : হনঝুয়াঁ দে হার, সদ্‌ধরাঁ দে হার, মিদ্ধে হোয়ে, ফুল্ল, ঠণ্ডিয়াঁ ছাওয়াঁ, সুনহরী জিল্‌দ, সুফনিয়া দী কবর।

নানক সিং পাঞ্জাবের শীর্ষস্থানীয় কথাসাহিত্যিক। উপন্যাস-রচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। শহরবাসী মধ্যবিত্তদের দারিদ্রের করুণ চিত্র আঁকাই নানক সিং-এর বৈশিষ্ট্য। ঘটনাবলীর সুষ্ঠু বিন্যাস এঁর কথা-শিল্পের প্রধান গুণ। "তাশের নেশা" শীর্ষক গল্প মধ্যবিত্ত চরিত্রের উপর শুধু কয়েকটা উক্তির মাধ্যমে নয় বরং সমগ্র কাহিনী-বিন্যাসের মাধ্যমেই ব্যঙ্গ করে।

গুরুবখ্‌শ সিং 'প্রীতলড়ী', বি-এস-সী.সী.ই. (মিশিগন, য়ু-এস-এ)

জন্ম : ১৮৯৫ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : প্রীত কহানিয়াঁ, নাগ প্রীত দা জাদু, অনোখে তে ইকল্লে, বীণা-বিনোদ, শবনম, ভাভী ময়না তে হোর কহানিয়াঁ, আখিরী সবক তে হোর কহানিয়াঁ, প্রীতাঁ দে পহরেদার, ইশক্‌ জিনাঁ দী হড্‌ডী রচ্যা, জিন্দগীওয়ারস হ্যায়।

গুরুবখ্‌শ্‌ সিং নাগরিক সংবেদনায় শিল্পী। ইনিই সর্বপ্রথম পাঞ্জাবী ছোটগল্পকে একটি নিশ্চিত জীবন-দর্শন দেবার চেষ্টা করেছেন। অনেক গল্পে দার্শনিক চিন্তার চিত্রণ আছে এবং অনেক স্থানে এই দার্শনিক ভাবধারা গল্পকে দিয়েছে গভীরতা। 'সহজ প্রীতি'র আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে মার্কসবাদের বস্তুবাদী দর্শন পর্যন্ত এঁর গতিবিধি। সব মিলিয়ে এঁর ভাবাত্মক প্রবৃত্তি সহজ প্রীতির দিকেই। ফলে এঁর রচনাদির মত এঁর গল্পেও একাঙ্গী চিত্রণ, তাহাতে দ্বন্দ্ব বা নাটকীয় বিরোধাভাসের সুর চড়া হতে পারেনি।

'ময়না বউদি'-তে সহজ প্রীতি একটি বালকের মাধ্যমে গড়ে

উঠেছে। প্রৌঢ় বয়সের ভালোবাসাকে ছেলেবেলার সম্বন্ধ দিয়ে চিত্রিত করা গুরুবখ্‌শ্‌ সিং-এর আর্টের বিশিষ্ট টেকনিক। কয়েকটি গল্পে এই টেকনিকই প্রযুক্ত হয়েছে। এই টেকনিকে ভালোবাসা পবিত্র থাকার সুযোগ পায়।

সন্তসিং সেখোঁ এম.এ. (ইংরাজী ও অর্থনীতি)

জন্ম: ১৯০৮ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ: সমাচার, কামে তে যোদ্ধে, বারাদরী, অদীবাট, তীজা পহর।

সন্তসিং সেখোঁ পাঞ্জাবী ভাষার বহুমুখী সাহিত্যিক। ইনি সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক রীতিতেই সিদ্ধহস্ত। একটি উপন্যাস, একটি কাব্য-সংকলন, অনেক নাটক, একাঙ্কী সংকলন ও গল্প-সংকলনের ইনি প্রণেতা। সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁর আলোচনা মূলক প্রবন্ধের জন্য। পাঞ্জাবীতে সাহিত্যের সমাজ-নীতিমূলক ব্যাখ্যার ভিত্তিস্থাপন সেখোঁই করেছেন। এঁর কিছু গল্প ভাবালুতার আশ্রয় না নিয়েও আবেশের পরিবেশ সৃষ্টি করে। 'পেমীর বাচ্চা' তারই মধ্যে একটি রচনা।

গুরমুখসিং মুসাফির

জন্ম: ১৮৯৯ খ্রী.

গল্প-সংকলন: সস্তা তমাশা, সব অচ্ছা, বখরী দুনিয়াঁ, আলনে দে বোট, গুটার, কংঘা বোল পঈয়াঁ।

গুরমুখসিং মুসাফির পাঞ্জাবের রাজনৈতিক নেতাও বটে এবং সাহিত্যিকও। তিনি কবি ও নাট্যকার, দুই-ই। নিজের জীবন সম্পর্কে দু'টি কথাংশও তিনি লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্প তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত করে—যাতে রাজনৈতিক জীবনের সরল সত্য পাওয়া যায় বটে তবে জটিল সত্যগুলি অদেখাই রয়ে

যায়। কারণ? মুসাফির মূলতঃ কবি এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার অমূল্য সম্পদকে সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার করেছেন।

"খসমাঁ খানে" সাতচল্লিশ সালের বিভীষিকার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু এই গল্পের তিক্ততা সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রতি নয় বরং নিকট বর্তমানের প্রতি। পাঞ্জাবীর এটি সাহিত্যিক স্বভাব—সে বিগত দুঃখ কষ্টকে ভুলে যায় এবং ব্যাপ্ত ক্লেশের খোঁচা অনুভব করে।

সুজান সিং এম.এ. (পাঞ্জাবী)

জন্ম: ১৯০৯ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ: সুখ দুখ, দুখ সুখোঁ তো পিছ্ছো, সব রং, নরকাঁ দে দেবতে, মনুক্খ তে পশু, নওয়াঁ রং।

সুজান সিং পাঞ্জাবীর প্রগতিশীল লেখক। তার প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'সুখ-দুখ' তাঁর শিল্পী-সুলভ বৃত্তির সাক্ষী। পরে তিনি প্রগতিশীল সাহিত্যিক ধারার অনুগামী হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সমস্ত সাহিত্য-সাধনা মার্কস্‌বাদী দর্শনের অধীনে সক্রিয় থাকে। এঁর অধিকাংশ গল্পই ঘটনা-প্রধান ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। 'রাসলীলা' এঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

করতারসিং দুগ্‌গল এম. এ. (ইংরাজী), সচিব, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

জন্ম: ১৯১৭ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ: সবের সার, পিপ্‌ল পত্তিয়াঁ, কুড়ী কহানী করদী গঈ, ডঙ্গর, অগগ্‌ খানেওয়াল্লে, নওয়াঁ ঘর, নওয়াঁ আদমী, কচ্চা দুদ্ধ, ফুল্ল তোড়না মনা হ্যায়, লড়াই নহীঁ, করামাত, গোরজ, পারে মৈরে, ইক ছিট্ট চানন দী, সস্তে সাঁঝীওয়াল, সদায়ন।

করতারসিং দুগ্‌গল পাঞ্জাবীর বহুমুখী ও প্রতিভাধর সাহিত্যিক। তিনি কবিতাও লিখেছেন এবং আলোচনামূলক প্রবন্ধও। তিনি অনেক নাটক ও উপন্যাসও লিখেছেন। তার নাটক ও উপন্যাস

যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু গল্প লেখক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বেশী। তাঁর গল্প লেখার সাধনা একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মত গতিশীল। বিগত তিনটি দশকের পাঞ্জাবী ধ্যান-ধারণার ইতিহাস তাঁর গল্পে প্রতিফলিত।

'করামাত' পাঞ্জাবীর সেই ক'টি পল্লের অন্তর্ভূক্ত যা পাঞ্জাবী 'মিথ' ও ইতিহাসকে বৈদগ্ধের স্তরে উন্নীত করেছে।

দেবেন্দ্র সত্যার্থী

জন্ম : ১৯০৮ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : কুঙ্গ পোশ, সোনাগাচী, তিন বুহেয়াঁওয়ালা ঘর, প্যারিস দা আদমী।

দেবেন্দ্র সত্যার্থী বহুভাষী বহুরূপী সাহিত্যিক। ইনি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি পেয়েছেন লোকগীত সংগ্রহকারী ও তার ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে। বিগত কয়েক বছর ধরে সত্যার্থী কাব্য ও গল্পের সাধনায় অবিচ্ছিন্ন নিয়মপালনের মত নিমগ্ন। স্বীয় বিলক্ষণ শিল্পের দরুণ সত্যার্থীর সাহিত্য পাঠক থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখে। সত্যার্থীর সঙ্গে নিশ্চিত ভাবনাত্মক অংশীদার হতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষাই সত্যার্থীর সাহিত্যের সিদ্ধান্ত।

এঁর নির্বাচিত গল্পের অন্যতম হলো 'দসৌধাসিং' যাতে পৃথিবী ও ঋতু মানবিক পাত্ররূপে কাহিনীতে ফুটে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এই পাঞ্জারী গল্পে মাটি ও ঋতু পাঞ্জাবের বাইরের।

কুলবন্তসিং বির্ক এম. এ. (ইংরাজী), এল. এল. বী.

(তথ্য অধিকারী, ভারত সরকার)

জন্ম : ১৯২১ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : ছাহ-বেলা, ধরতী তে আকাশ, তূড়ী দী পণ্ড, একস কে হম বারক, দুদ্ধ য়া ছপ্পড়, নওএ লোগ।

কুলবন্তসিং বির্ক শুধু গল্পই লিখেছেন। গ্রামীণ পাঞ্জাব ও কৃষক চরিত্রের সঙ্গে গল্প লেখক বির্কের বিশেষ অনুরাগ। গল্পের শেষ দিকে একটি চমকপ্রদ উক্তি বা বিস্ময়কর ঘটনার মাধ্যমে নতুন সার্থকতাকে প্রোজ্জ্বল করা বির্কের বিশিষ্ট আঙ্গিক।

'খব্বল' (আগাছা) পাঞ্জাবী জাঠ চরিত্রের প্রামাণিক প্রতিবিম্ব। এই গল্পের নায়িকা জাঠ, এর সম্পূর্ণ পটভূমি ও মানসিক পরিবেশ জাঠ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এর মুখ্য প্রতীক—আগাছা—এও এই জীবনের সঙ্গে খাপ খায়। কষ্ট সইবার পরেও মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকার আকাঙ্খা এই গল্পের চরিত্র-বিন্দু।

অমৃতা প্রীতম

জন্ম: ১৯১৯ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ: ২৬ বরস বাদ, আখিরী খৎ, গোজর দিয়াঁ পরিয়াঁ, চানন দা হোকা, জঙ্গলী বুটী।

অমৃতা প্রীতম পাঞ্জাবের শীর্ষস্থানীয় কবিদের অন্যতম; তিনি গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। এঁর কিছু লঘু প্রবন্ধ, প্রভাবোৎপাদক সমীক্ষাত্মক নিবন্ধ ও যাত্রা-কাহিনীও ছাপা হয়েছে। মাসিক পত্রিকা 'নাগমণি'-র মাধ্যমে অমৃতা প্রীতম এক নতুন ধরণের জার্ণালিজ্‌ম সাহিত্যের সূচনা করেছেন। প্রাঞ্জল বক্তব্য ও ভাবালু অভিব্যক্তি এঁর কবিতা ও গল্পের বিশেষত্ব। যুবতী নারী পাত্রীর সংলাপের সরল অভিব্যঞ্জনা অমৃতার গল্পের বিশিষ্ট গুণ।

'একটি দীর্ঘশ্বাস' গল্পে একটি যুবতীর সমাজে নিষিদ্ধ পদক্ষেপের অকপট স্বীকৃতির পরিচয় বহন করছে।

সন্তোখসিং ধীর

জন্ম: ১৯২০ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ: মিট্রিয়াঁ দী ছাঁ, সাঁঝী কন্ধ, সবের হোন তক

সন্তোখসিং ধীর পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবদান জুগিয়েছেন। কবিতা ও গল্প দুটোতেই বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর গল্পের সংখ্যা খুব বেশী নয় কিন্তু তার মধ্যে পাঁচ-ছটি গল্প যে কোনো ভালো গল্প-সংকলনে স্থান পাবার যোগ্য। এই গল্পগুলি গ্রাম-জীবনের সুখ-দুঃখের আলেখ্য। প্রামাণিক সংলাপের মাধ্যমে সঠিক পরিবেশের সৃষ্টি করা ধীরের গল্পের অভিন্ন লক্ষণ।

'সকাল হওয়ার আগে' এমন একটি গল্প, যাতে ঘটনার চেয়ে ঘটনার সম্ভাবনার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত চরিত্রের চেয়ে পরিস্থিতির চিত্র বেশী, যা ক্লেশভরা জীবনকে হাসির মেজাজে রূপায়িত ক'রে তুলেছে।

মহিন্দরসিং সরনা বি.এ.

(ডাইরেক্টর অফ অডিট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্ট্স্, নয়া দিল্লী)

জন্ম: ১৯২৪ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ: পৎথর দে আদমী, সগনা ভরী সবের, সুপনেয়াঁ দী সীমা, বঞ্জলী তে বিলকনী, ছবিয়াঁ দী রুত, কালিঙ্গা।

মহিন্দরসিং সরনা গল্প-লেখক এবং ঔপন্যাসিক। সম্প্রতি মহাকাব্যের শৈলীতে একটি দীর্ঘ কাব্যের রচনায় ব্যাপৃত। সরনার গল্পে মনোবিজ্ঞান প্রধান উপজীব্য ও চাঁছা-ছোলা বাক্য-বিন্যাস এঁর কথা-শিল্পের মুখ্য অঙ্গ। সাতচল্লিশ সালের বিভীষিকা সরনার গল্পে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। প্রগাঢ় ভাবৈশ্বর্য কখনো কখনো ভাবলুতার সীমা ছুঁয়ে যায়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এই ভাবালুতাকে একটু শিথিল করে মাত্র। কটু ব্যঙ্গ ও মধুর মানবিকতার সুন্দর সামঞ্জস্য এঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য।

'টাঙ্গির মরশুম' দেশ-ভাগের সময়ের রক্তপাতের কাহিনী। সাম্প্রদায়িক নেতাদের নিষ্ঠুরতা এবং পুরাতন জীবন-বোধ স্বীকার ক'রে চলা লোকেদের সরল কোমলতা এবং এই দুটোর মাঝখানে

আটকা পড়ে যাওয়া নিজের ইচ্ছাশক্তি থেকে বঞ্চিত লোকেদের অসহায়তার ছবি এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

নবতেজ সিং এম. এ. (মনোবিজ্ঞান) (সম্পাদক, প্রীতলড়ী)
জন্ম : ১৯২৫ খ্রী.
গল্প-সংগ্রহ : দেশওয়াপিসী, নওয়াঁ রুত, বাসমতী দী মহক, চানন দে বীজ।

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র নবতেজ সিংএর প্রাথমিক আস্থা মার্কসবাদে। রাজনৈতিক সাংবাদিকতা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম কাব্য–কল্পনার প্রতি মোহ।

নবতেজ সিং-এর গল্পে গ্রাম-সমস্যাগুলিকে নাগরিক সূক্ষ্মতায় পেশ করা হয়। দৈনিক জীবনের কঠোর যথার্থকে কোমল কল্পনা-চিত্র ও প্রতীকের মাধ্যমে রূপায়িত করায় নবতেজের বিশেষ রুচি। ফলে এঁর গল্পের প্রভাব কোনো বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রিত না থেকে গল্পের সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে।

"ভাগ্যের সুতো" গ্রাম্য অমূলক ভয়ের নাগরিক ব্যাখ্যা। এই অমূলক ভয়-ভাবনাগুলি বাস্তব জীবনের মানসিক ফসল। এর একটি দিক দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলিতে বাঁধা এবং অন্য দিক মানুষের অবচেতনে নিবিষ্ট মানসিক যুক্তির সঙ্গে যুক্ত। বাস্তব ও মানসিক দিকের সামঞ্জস্য নবতেজের গল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

মহিন্দরসিং জোশী এম.এ. (পাঞ্জাবী), এল. এল. বি
(মেম্বার, অফিশিয়ল ল্যাংগোয়েজ লেজিস্লেটিভ কমিশন)
জন্ম : ১৯১৯ খ্রী.
গল্প-সংগ্রহ : প্রীতাঁ দে পরছাওয়েঁ, তোটা তে তৃপ্তীয়াঁ, দিল তো দূর, কিরনা দী রাখ, সৌ ম্যাঁয়নু আপনী।

সাতচল্লিশ সালের পরে পাঞ্জাবের মালবা প্রদেশ নিজের স্বর মুখরিত করার সুযোগ পেয়েছে যে জন্য পাঞ্জাবী সাহিত্যিক ভাষার বিন্যাস ও ভাবমুদ্রায় অভিবৃদ্ধি হয়েছে এবং তা সহজেই চেনা যায়। এঁর অধিকাংশ গল্পই এই প্রান্ত-সম্পর্কিত। অতীতোন্মুখী চেতনা

প্রবাহ ও সঘন বাক্য-বিন্যাস জোশীর গল্পের বিশেষ গুণ। এই কারণেই তাঁর গল্পের ভঙ্গিমা বিশিষ্ট মনে হয় এবং তাঁর রচনাগুলিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়।

'মোতি' সাতচল্লিশ সালের বিভীষিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গল্প যাতে তিনটি চেতনা-প্রবাহ সম্মিলিত হয়ে একটি ভাবুক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

লোচন বখশী বি.এ.
(প্রোগ্রাম অধিকারী, আকাশবাণী)
জন্ম : ১৯২৩ খ্রী.
গল্প-সংগ্রহ : পাপ-পুন্ন তো পরে, বর তে স্রাপ, ভরে মেলে বিচ, মেরী খুশী মোড় দে।

লোচন বখশী বহুদিন ধরে কিন্তু খুব কম গল্প লিখে চলেছেন। পোঠোহারের রমণীয় ভূমির প্রতি এঁর বিশেষ মোহ এবং বিষয়বস্তু প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করায় তাঁর বিশেষ রুচি। ফলে গল্পের প্রভাব বিস্তার করে প্রচ্ছন্নরূপে। গল্প-রসের সহিত কাব্য-রসও সহজভাবে মিশে যায় এবং বাস্তবের উপর রোমান্টিক রংএর প্রলেপ পড়ে। তার বড় গল্পগুলোর জন্যই লোচন বখশীর খ্যাতি বেশী।

'বাজারের শোকসভা' লোচন বখশীর প্রতীকধর্মী গল্প। জীবনকে বাজারের অর্ধমানবীর মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়েছে। এর মুখ্য পাত্র, বাজার মূল্য।

গুরদয়াল সিং এম.এ. (পাঞ্জাবী)
গল্প-সংগ্রহ : বকলম খুদ, সগ্‌গী ফুল্ল, ওপরা ঘর।

গুরদয়াল সিং মালবা অঞ্চলের গল্প ও উপন্যাসিক এঁর খ্যাতি প্রধানতঃ এঁর উপন্যাস 'মঢ়ী কা দীবা'-র জন্য যাতে মালবা অঞ্চলের ভৌগোলিক লক্ষ্যকে ভাবাত্মক অভিব্যক্তি দেওয়া হয়েছে। এঁর প্রায় অধিকাংশ রচনা মালবার ভূমিহীন শ্রেণীর সম্পর্কে। ভূমিহীন

কৃষকের চিরসঙ্গী দুঃখের অকপট অভিব্যক্তিই গুরদয়াল সিং-এর বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের ভূমিহীনদের জন্য গুরদয়াল সিং নাম প্রস্তাবিত করেছেন-'অনহোত্র'। অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তিত্ব পর্যন্তর অসফল যাত্রাকে গল্পে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে গুরদয়াল সিংই অগ্রগণ্য। মালবী বুলির ব্যবহারের জন্য ইনি পাঞ্জাবের একমাত্র আঞ্চলিক কথাকার হবার দাবী রাখেন। ভাবুক না হয়েও লোকেদের ভাবধারাকে নাড়া দিতে গুরদয়াল সিং সমর্থ।

'করীলের ডাল' ও 'অনহোত্রে' (হয়নি যে) অস্তিত্বের গল্প।

অজীত কাউর এম.এ. (অর্থনীতি)

জন্ম : ১৯৩৪ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : গুলবানো, মহক দী মৌত, বুতশিকন।

অজীত কাউর শহরের মেয়েদের মানসিক বেদনা নিজের গল্পে রূপায়িত করেন। আর্থিক, সামাজিক বা মানসিক কষ্ট সমস্ত জনসাধারণই ভোগ করে কিন্তু এমন কতকগুলি কষ্ট আছে যা শুধু মেয়েরাই ভোগ করে। আর্থিক দৃষ্টিতে স্বাধীন, মহানগরে বাস করার দরুণ সামাজিক বিধি-নিষেধ থেকেও প্রায় মুক্ত, প্রবল অহং-এর জন্য নিজের ক্ষুধা স্বেচ্ছায় মেটাতে সমর্থ শহরবাসী মেয়েদের এমন বেদনাও আছে যা আর্থিক সম্পন্নতা, সামাজিক স্বাধীনতা বা তার প্রবল অহংভাব মেটাতে পারে। অজীত কাউর এই রকম বেদনাকেই ফোটান। এই গল্পগুলি পড়ে শহুরে মেয়েদের প্রতি সহানুভূতি না জাগলেও তাদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জানতে পারি।

'শূলবিদ্ধ মুহূর্তগুলি' সম্পন্ন, স্বাধীন ও অহংচেতা শহুরে নারীর বেদনার কাহিনী।

গুলজারসিং সন্ধু এম.এ. (ইংরাজী)

(সম্পাদক, কৃষি মন্ত্রালয়, ভারত সরকার)

জন্ম : ১৯৩৪খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : হুস্ন দে হানী, ইক সাঁঝ পুরানী, সোনে দী হট্ট।

নতুন যুগের গল্পলেখকদের সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও গুলজারসিং সন্ধু ভাবধারা ও আঙ্গিকে সেখোঁ প্রবর্তিত গল্পধারারই অনুগামী। জীবনের অধিকাংশ শহরে কাটানো সত্ত্বেও তাঁর ভাবাত্মক অনুরক্তি পাঞ্জাবের গ্রাম-জীবনে। গ্রাম-জীবনের সমস্যার চেয়ে বেশী তিনি গ্রামীন-সংবেদনার কাহিনীকার। পাঞ্জাবের গ্রামগুলি তাদের প্রায় সমস্ত সমস্যারই সমাধান করে নিয়েছে কিন্তু গেঁয়ো লোককে ব্যক্তিরূপে অধ্যয়ন করা এখনো আমাদের গল্প-লেখকরা শুরুই করেনি। আমাদের অধিকাংশ গ্রাম্য-গল্পগুলি গ্রাম্য অবচেতন মনের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। 'প্রবঞ্চনা' সেই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম, যা' নব নির্মায়মান পাঞ্জাবের স্বরকে মুখরিত করে। নতুন ভাখড়া বাঁধের সঙ্গে পুরাতন ভাবধারাকে যুক্ত করা হয়েছে। হতাশ বুড়ি বেবের সমস্ত স্থিতি কোনো ঘটনা বা সমস্যার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে একটি নিশ্চিত ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। এই ভাবধারা ব্যক্তিগত নয়, বরঞ্চ পাঞ্জাবের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের ভাবধারার প্রতীক।

দলীপ কাউর টিবানা এম.এ. (পাঞ্জাবী) পি.এচ্.ডি.

(লেকচারার, পাঞ্জাবী য়ুনিভার্সিটি, পাতিয়ালা)

জন্ম : ১৯৩৪ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : ত্রাটঁা, কিসে দী ধী, বিগানে নৈণ, বেদনা, যাত্রা, তূঁ ভরী হুংগারা।

অনেক গল্প লিখেছেন দলীপ কাউর টিবানা। দু'টো উপন্যাসও। তাঁর খ্যাতির প্রধান আধার তাঁর উপন্যাস 'অয় হমারা জীবন'। পাঞ্জাবের অন্য দু'জন প্রমুখ গল্প লেখিকার (অমৃতা প্রীতম ও অজীত কাউর) মতো দলীপ কাউরের গল্পগুলিও যুবতী স্ত্রীর প্রেম-অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত। প্রেম-সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম-কানুন থেকে একটু আলাদা ধরণের লেখা এই তিনটি গল্প-লেখিকারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অমৃতা ও অজীতের গল্প যেখানে দুঃসাহসিক ভাবে শেষ হয়, দলীপ কাউরের গল্পের পরিণতি হয় সংযত।

'মরণ-ঋতু'ও যৌবনের প্রেম-অনুভূতির গল্প। প্রেম ও কামের মিলন বিন্দু এক না হলে টেন্‌শনের সৃষ্টি হয় কিন্তু এই বিন্দুর অভাব থাকলেই টেনশনকে কাবুতে আনা যায়।

বুটা সিং এম.এ. (পাঞ্জাবী)

(ট্রেন এগজামিনর, রেলওয়ে ষ্টেশন, দিল্লী)

জন্ম ঃ ১৯১৯ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ ঃ লো চুবারে দী।

মাত্র একটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে বূটা সিং-এর, কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে এঁর গল্প ক্রমাগত পাঞ্জাবী পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এঁর অধিকাংশ গল্পই শহুরে মধ্যবিত্তদের বিষয়ে। কোনো বিলক্ষণ জীবন-উপাখ্যানকে নিজের গল্পের বিষয়বস্তু করায় এঁর বিশেষ আগ্রহ। নিষিদ্ধ কামুকতা কোনো না কোনো রূপে এঁর গল্পে অনুপ্রবেশ করে।

'সধরাঁ মাঈ' এঁর প্রারম্ভিক গল্পগুলির একটি। গোড়ায় এই গল্পের জন্যই বুটা সিং সুনাম অর্জন করেছেন। রেলওয়ে শান্টিং লাইনের সঙ্গে নিজে যুক্ত থাকার দরুণ এই জীবনের অভিজ্ঞতা এই গল্পে পেয়েছে প্রামাণিক অভিব্যক্তি।

জসবন্তসিং বিরদী এম. এ. (হিন্দী)

(সম্পাদক, হিন্দী শিক্ষা বিভাগ পাঞ্জাব সরকার)

জন্ম ঃ ১৯৩৪ খ্রী.

গল্প সংগ্রহ ঃ পীড় পড়াঈ, অপনী অপনী সীমা।

জসবন্তসিং বিরদী নতুন যুগের বিশিষ্ট গল্পলেখক। নিজের অনুভূতির বাস্তববাদী অভিব্যক্তির প্রতি সচেতন। তিনি ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমর্থক। তাঁর খ্যাতির মূলে তাঁর প্রতীক-ধর্মী

গল্প 'তারে তোড়না।' ধীরে ধীরে বিরদী তাঁর গল্পকে ঘটনা ও চরিত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। বিরদীর রচনায় ঘটনা বা চরিত্র আলাদা আর্টবস্তু নয়, বরঞ্চ সমগ্র জীবনকে বস্তু-উন্মুখ ও ভাবালুতা শূন্য দৃষ্টিতে প্রণীত করা হয়েছে এবং এইটেই বিরদীর গল্পের আঙ্গিকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

'সীমা' গল্পে যুগান্তরকালীন জীবনের সহজ বস্তু-উন্মুখ চিত্র পেশ করা হয়েছে। শুধু নারী কিংবা পুরুষ কাহিনীও এ নয়। সমস্যাটিকে না পুরোপুরি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে, না শুধু পুরুষের। দুটো দৃষ্টিতে সমঝোতা করানোর কোন চেষ্টাও নেই এতে। এটা শুধু আধুনিক ভাববোধকে তুলে ধরেছে, যেখানে ব্যক্তি-সত্ত্বা নিজের নিজের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

মোহন ভণ্ডারী বি.এ.,এল-এল-বি

(শিক্ষা বিভাগ, পাঞ্জাব)

জন্ম : ১৯৩৭ খ্রী.

গল্প-সংগ্রহ : তিলচৌলী, মনুজ দী পৈড়।

মোহন ভণ্ডারী নতুন যুগের বিশিষ্ট লেখক। তাঁর রচনা-শিল্প নতুন ও পুরোনোর সীমারেখার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত। মালবা অঞ্চলের ভূমিহীন গ্রাম্য জনসাধারণ এঁর গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। এই জনতার বেদনা-ভরা জীবনকে তিনি ব্যঙ্গ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তোলেন। প্রাঞ্জল ভাষা তাঁর কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

'আমাকে টেগোর করে দে মা!' গল্পে একজন গ্রাম্য কুমোরের সাধারণ অবস্থা এবং তার ব্যক্তি-চরিত্রকে সুসমঞ্জসরূপে রূপায়িত করা হয়েছে, যার দরুণ গল্পের অন্তিম প্রভাব পুরোনো হলেও নবীন ভাববোধের প্রতি আগ্রহশীল।

এই পুস্তক-মালার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষার উৎকৃষ্ট ও লোকপ্রিয় পুস্তকগুলির অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। যে প্রদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হবে তার থেকে অন্যান্য প্রদেশের পাঠকরা ঐ প্রদেশের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখনকার সমসাময়িক সাহিত্যগুলি থেকে বইগুলি বাছাই করা হচ্ছে।

আমাদের ভাষা রকমারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক চিন্তাধারার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই বললেই চলে; আমাদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিও নেই। য়ুরোপেও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষা রয়েছে, কিন্তু তারা সাহিত্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আদান প্রদান ক'রে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

আশা করা যায় এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমাদের বি
ভাষাভাষি মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি আসবার সুযো
একে অপরকে ভালো করে বুঝতে পারবেন, ফলে ভারতী
সুযোগ হবে।